চিকিৎসা শাস্ত্র যুগে যুগে

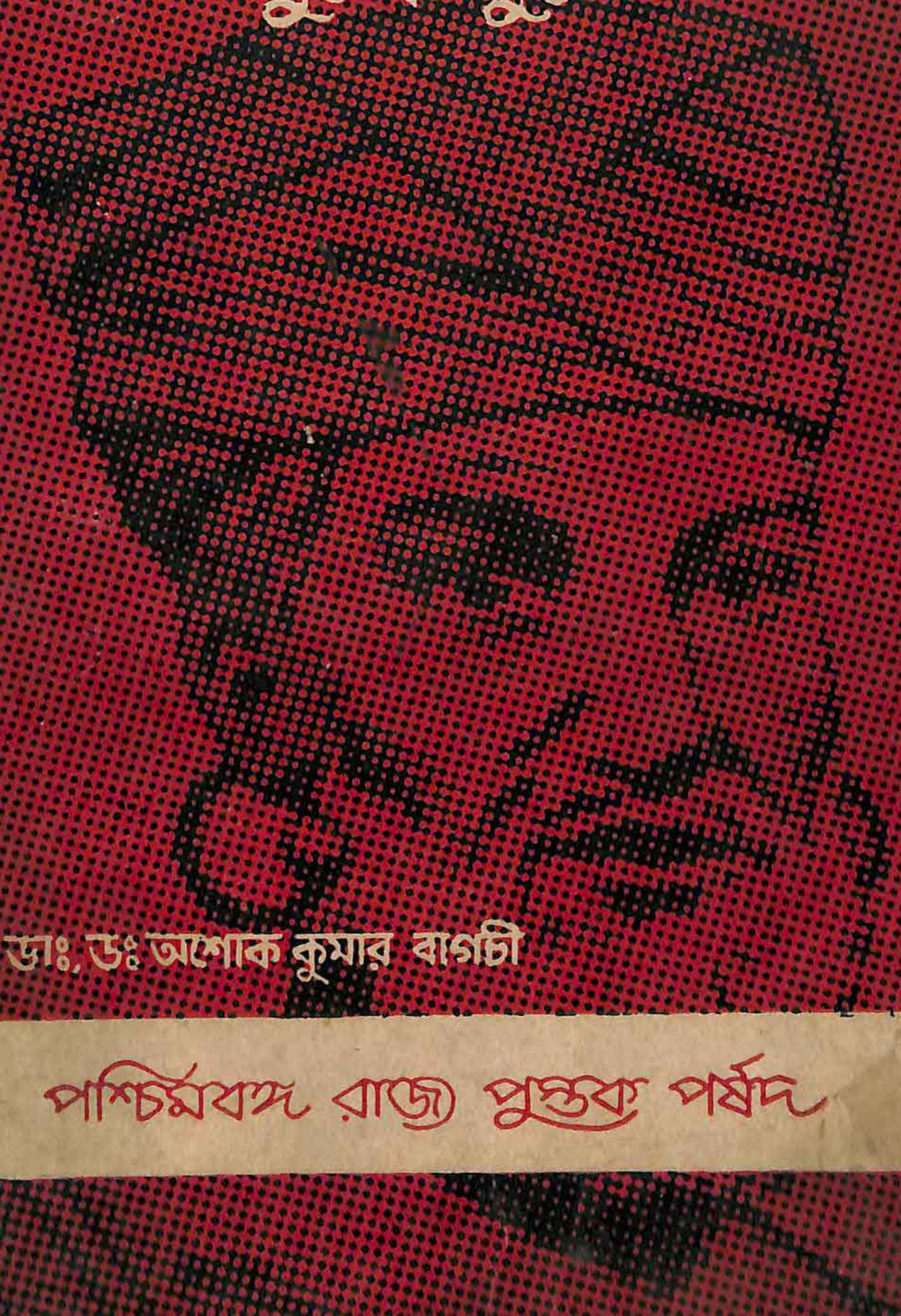

ডাঃ, ডঃ অশোক কুমার বাগচী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

চিকিৎসাশাস্ত্র যুগে যুগে

ডাঃ ডঃ অশোক কুমার বাগচী

এম্.বি. বি. এস্., এম্. এস্. এন্. এস্., এফ্. এন্. এস্., এফ্. এ. সি. এস্.,
এফ্. আই. সি. এস্. ; ডি. লিট্., এফ্. আই. এম্. এস্. এ.,
পি. এইচ্. ডি।

অধ্যাপক স্নায়ুশল্য চিকিৎসক ও স্নায়ুতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা ; ভারতীয় স্নায়ুতত্ত্ব সংস্থার অবৈতনিক ঐতিহাসিক ; ভারতীয় স্নায়ুতত্ত্ব পত্রিকার সম্পাদক ও জার্মাণ স্নায়ুশল্যশাস্ত্র পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ; ভারতীয় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও স্নায়ুবিজ্ঞান সংস্থার উপদেষ্টা ও ভারতীয় সেনা-বাহিনীর পরামর্শদাতা স্নায়ুশল্য চিকিৎসক।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

CHIKITSHA SHASTRA YUGE YUGE
(Medical Science through the ages)
Dr. Asoke Kumar Bagchi

© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

610.9
BAG

প্রকাশকাল : মার্চ, ১৯৮৪

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

S.C.E.R.T. West Bengal
Date 16-4-87
Acc. No. 3944

মুদ্রক :
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : শ্রীদুর্গা রায়

মূল্য : আঠারো টাকা

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

"বাল্মিকী নাদশ্চ সসর্জ পদ্যং
জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।
চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ
পশ্চাৎ তদ্ আত্রেয় মুনির্জগাদ ॥"

(অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত)
১ম সর্গ

অর্থাৎ

মহর্ষি বাল্মিকীর একটি উদ্ধৃতি থেকে কবিতার সৃষ্টি,
যে কবিতা মহামুনি চ্যবন লিখতে অসমর্থ হয়েছিলেন।
যে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করতে অত্রি অসফল হয়েছিলেন
আত্রেয় সেই কার্যে সফলতা লাভ করেছিলেন।

সদ্য প্রয়াত পিতা পরম শ্রদ্ধেয়
ডাঃ দ্বিজদাস বাগচী
মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
উৎসর্গীকৃত।

২০. ৬. ১৯৮৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার স্ত্রী শ্রীমতী সাধনা বাগচী, আমার সহকর্মিনী পাপিয়া পাল, প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন, ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ সুরজিৎ সিন্‌হা, সংস্কৃতজ্ঞা ডঃ শান্তি চক্রবর্তী, আরবী ও পারসিক ভাষার সুপণ্ডিত ডঃ মহম্মদ সাবির খান্‌, ও নিরিক্ষক ডাঃ সমর রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-এর পরিচালক শ্রীদিব্যেন্দু হোতা, ও শ্রীঅশোক বিশ্বাস এবং আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীভানু চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুখবন্ধ

ছোটবেলা থেকেই আমার ইতিহাস ও ভূগোল পড়ার নেশা ছিল। ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্য দিয়ে আমার কিশোর মন চলে যেত অতীতে বা দূর হ'তে দূরান্তে।

এক চিকিৎসক বংশে আমার জন্ম। পিতামহ বৃটিশ সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ছিলেন। পিতা ৺ডাঃ দ্বিজদাস বাগ্‌চী কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্নাতক হ'ন। তিনি আমাদের আদিনিবাস উত্তরবঙ্গের পাবনা শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার বাবা অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের লাইব্রেরী থেকে বহু সচিত্র পত্রিকা আমাকে এনে দিতেন। তার মধ্যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন আমাকে নেশার মত আকৃষ্ট করত। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারতাম না, কিন্তু আমার মন ঐ পত্রিকার মধ্য দিয়ে চলে যেত বহু দূর দেশের নগরে প্রান্তরে। সেই সমস্ত দেশের বিচিত্র মানুষ, পশুপক্ষী ও নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমি মোহিত হতাম। পত্রিকাটির অনুপ্রেরণাতেই আরম্ভ হয়েছিল আমার ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের নেশা।

আমাকেও বংশানুক্রমিক ভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ী হ'তে হ'ল। যখন আমি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন পরমশ্রদ্ধেয় ৺ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক বিশ্ববিশ্রুত চিকিৎসাবিদ্যার ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনিই আমার চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস পাঠের পথ প্রদর্শক। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ থেকে কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়ে গিয়েছেন। সেই পুস্তকগুলি আজ পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য।

স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের জন্য আমি বেছে নিয়েছিলাম মধ্য ইউরোপের ভিয়েনা শহরটিকে। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ভিয়েনার চিকিৎসা বিদ্যালয় পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বহু বিখ্যাত চিকিৎসা জগতের দিক্‌পালগণ ভিয়েনা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আজ প্রতি পদে পদে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রকে তাঁদের নাম স্মরণ করতে হয়। তাঁদের উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি, নিদান পদ্ধতি এবং রোগ নিরূপণ পদ্ধতি আজও প্রচলিত। পৃথিবীর বহুদেশেই এইরূপ আরও

বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারা লিখে রেখে গিয়েছেন। ভিয়েনায় আমার পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ৺ডক্টর লিওপোল্ড স্যোন্‌বাউয়ের একাধারে স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসেরও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমার চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠের উপর আগ্রহ দেখে পরম যত্ন সহকারে আমাকে আরও বহু তথ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সেইজন্য আমি তাঁর কাছেও আজীবন ঋণী। অধ্যাপক স্যোন্‌বাউয়ের এর আদেশমত আমি জার্মান, ল্যাটিন ও গ্রীক্‌ভাষা শিক্ষা করি। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষা আমার ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব পাঠের পরম সহায়ক হয়েছে। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় স্নায়ুতত্ত্ব শাস্ত্রীয় সংস্থার সভ্যরা আমাকে সংস্থার চিকিৎসাবিদ্যার ঐতিহাসিক পদাভিষিক্ত করে আরও ইতিহাস চর্চার প্রেরণা দিয়েছেন।

বর্তমান লেখাটি আমার ১৯৬৩ সালে অধুনালুপ্ত অমৃত পত্রিকায় 'যুগ হ'তে যুগান্তরে' নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখার অবলম্বনে পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত। ১৯৬৩ সাল এবং ১৯৮৩ সাল এই দুই দশকের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের শরীরে অন্য মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র, বৃক্ক এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি সংযোজন ও সংস্থাপন সম্ভব হয়েছে। রোগনিরূপণ শাস্ত্রেরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পদে পদে চিকিৎসাশাস্ত্র পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যান্য নব নব আবিষ্কার সমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। আজ চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন এক অধ্যায় সূচিত হয়েছে যার নাম বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং বা 'জীব প্রযুক্তিকলা'। কালক্রমে চিকিৎসাবিদ্যা আরও কতদূর যে অগ্রসর হয়ে যাবে সে কথা আমার উত্তরসূরীরাই হয় তো ভবিষ্যতের পাঠকদের জানাতে পারবেন। ইচ্ছাকৃত ভাবেই পুস্তটির আকার সীমাবদ্ধ রাখা হ'য়েছে কেননা কৌতুহলী পাঠকবর্গের মনে ভীতি উদ্রেককারী বৃহদাকৃতি পুস্তক প্রণয়নে আমার একান্ত অনীহা।

আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা যদি ভবিষ্যতের চিকিৎসাশাস্ত্র বিদ্যার ছাত্রদের মনে সামান্য কৌতূহল উদ্রেক করতেও সমর্থ হয় তাহলেই আমার এই লেখার সার্থকতা প্রমাণিত হ'বে।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৯০ — অশোক কুমার বাগচী
কলিকাতা

বিষয় পরিচিতি

বিষয়			পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	…	…	চ
ভূমিকা	…	…	১
প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহ্য	…	…	৪
প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	১২
জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	১৩
প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	১৫
সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	১৫
প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	১৬
গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	১৭
আলেক্‌জান্দ্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	২৪
রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	২৪
প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	২৬
প্রাচীন আরবী চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	২৭
আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী	…	…	২৮
চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান	…	…	৩১
কায়চিকিৎসা	…	…	৩২
আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয় প্রভাব	…	…	৩৩
প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	৩৬
য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	৩৭
মধ্যযুগের য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	৪৩
রেনেসাঁস যুগের চিকিৎসা	…	…	৪৮
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	৫১
বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	…	…	৫৫
উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	…	…	৫৯
সংক্রামক রোগ সমস্যা	…	…	৬০
উনবিংশ শতকের নিদানতত্ত্ব	…	…	৬২
উপদংশ রোগের সূত্র-সন্ধান	…	…	৬২

বিষয়			পৃষ্ঠা
ডিফ্‌থেরিয়া রোগ	...		৬৩
শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী	...	...	৬৪
চেতনা-নাশকের সন্ধানে	...	...	৬৫
উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান	...	...	৬৬
গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ সমস্যার সমাধান	...	...	৬৭
শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব		...	৬৯
চিকিৎসাশাস্ত্রে পদার্থবিদ্যার অবদান	...	...	৭২
বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	৭৩
বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা	...	...	৭৪
চিকিৎসাশাস্ত্রে বিংশ শতকের অবদান	...	...	৭৫
বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা	...	...	৭৮
ভারতে য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন	...	...	৮০
পরিশিষ্ট	...	...	৮৬
তথ্যের সূত্র	...	...	৯৯

॥ ভূমিকা ॥

কোটি কোটি বৎসর আগেকার কথা। পৃথিবীর কোন এক আদিম জলাভূমির কাদায় একটি এককোষী এ্যামিবার জন্ম হয়েছিল। এককোষীর পর এলো বহুকোষী জলচর প্রাণী। তারপর উভচর, খেচর এবং সর্বশেষে পৃথিবীর বুকে আসে বানররূপী প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মানুষ। কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধানে সেই মানুষই আজ পরিণত হয়েছে চন্দ্রে অবতরণকারী নভচর মানুষে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে কালক্রমে বর্তমান সুসভ্য মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রথমে বিকট দর্শন এবং হিংস্র প্রাগ্‌ঐতিহাসিক প্রাণীর আক্রমণ হ'তে তারা আত্মরক্ষা করতে শিখেছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টির অগোচরে বহু অদৃশ্য রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করার ব্যাপকভাবে তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হত। তারা অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির আধিপত্যকে মৃত্যুর কারণ বলে মনে করত। রোগ চিকিৎসার কোন উপায়ই তারা জানত না। কিন্তু স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাবলে তারা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন রোগ দেখা দিয়েছে এবং সেই রোগানলেও আত্মাহুতি দিয়েছে বহু মানুষ, কিন্তু যারা বেঁচেছে তাদের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের মানুষকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে। তাই আমার মনে হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্তমান সকল মানুষেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য।

পৃথিবীর আদিতম রোগগ্রস্ত এক ডিনোসাউর-এর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল মার্কিন দেশের ওয়াইওমিং প্রদেশের একস্থানে। পুরা-নিদানতত্ত্বের (প্যালিওপ্যাথলজি) পণ্ডিতগণের মতে ওই ডিনোসাউরের পুচ্ছের একটি অস্থি ক্ষয়রোগগ্রস্ত ছিল। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সিনোসাউর পৃথিবীপৃষ্ঠ হ'য়ে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার জীবাশ্মটি রোগক্লিষ্ট জীবনের এক করুণ ইতিহাসকেই আজকের সভ্য মানুষের চোখে তুলে ধরেছে। মানবদেহের

প্রাচীনতম রোগগ্রস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল যবদ্বীপে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খননকার্যের দ্বারা যবদ্বীপ মানুষের (পিথাকান্‌থ্রোপুস্ ইরেকটুস্) একটি চোয়ালের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন। অস্থিটিতে একটি অর্বুদ বা টিউমার ছিল।

চিত্র—১

অতি প্রাচীন মানুষের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র তাদের অস্থির অবশিষ্ট থেকে জানতে পারা যায়। মিশর দেশীয় সংরক্ষিত 'মমি'-এর দেহে রয়েছে অস্থি প্রদাহ, বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের পাথুরী, পিত্তাশয়ের পাথুরী, মেরুদণ্ড ও অপরাপর অস্থির ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিদর্শন। অর্বুদাক্রান্ত প্রাচীন মানুষের অস্থিও বহু পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন মিশরে দন্তরোগ ও বাতরোগের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। মিশরের ফারো, আখেনাটন-এর পিটুইটারী গ্রন্থির রোগ হয়েছিল তারও প্রমাণ সমকালীন চিত্র থেকে পাওয়া যায়। কেননা সুদর্শন সেই ফারো বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিৎ দর্শন হয়েছিলেন।

চিত্র—২

ফরাসীদেশের পিরেনিজ্ পর্বতের এক নির্জন গুহাভ্যন্তরে বন্যজন্তুর ছাল পরিহিত এক যাদুকর চিকিৎসকের চিত্র অঙ্কিত আছে। পণ্ডিতগণের মতে উক্ত চিত্রের শিল্পী অরিগনাসিয়ান যুগের এক আদিম চিত্রকর। ঐরূপ বিচিত্রবেশধারী চিকিৎসক কিভাবে প্রাচীন মানুষের রোগযন্ত্রণা লাঘব করতেন তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তার বিচিত্র বেশবাস দেখে আজও মনে হয় যে তিনি রোগীর মনে ভীতির ভাব উদ্রেক করে কার্য সিদ্ধ করতেন।

চিত্র—৩

জীবাশ্মীভূত অস্থিরঅবশিষ্ট একথা আরও প্রমাণিত করে যে প্রাচীন মানব শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, জার্মানী ও স্পেনের গুহাভ্যন্তরে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের "মাছু পিছু" নামক ইঙ্কানগরীতে বহু সচ্ছিদ্র করোটি পাওয়া গিয়াছে। কিভাবে প্রাচীন মানুষ করোটির ন্যায় কঠিন অস্থি ছিদ্র করত তা ভাবলে আজ আশ্চর্য হ'তে হয়। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়াতে প্রস্তরফলাকাবিদ্ধ একটি মানুষের বক্ষাস্থি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং স্বতঃই অনুমেয় যে ধাতু আবিষ্কারের বহু পুর্বেই প্রাচীন ও নবপলীয় যুগের মানুষেরা যে সমস্ত প্রস্তরের

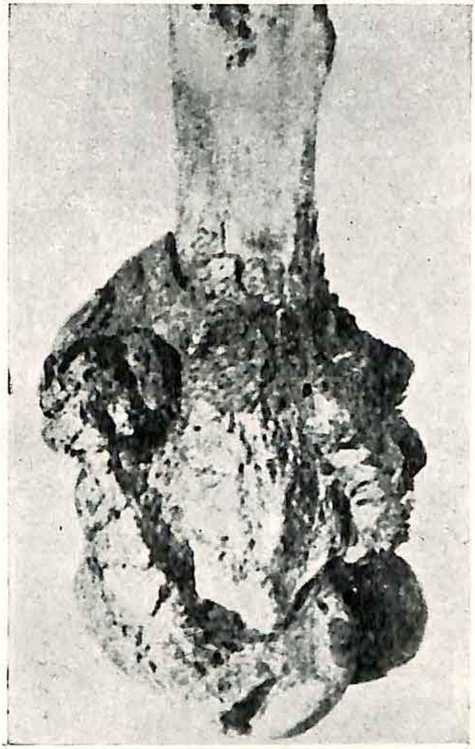

চিত্র ১—প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক যুগের এক বন্য বৃষের
উরুর অস্থি ভঙ্গ (প্লেইষ্টোসিন যুগ)।

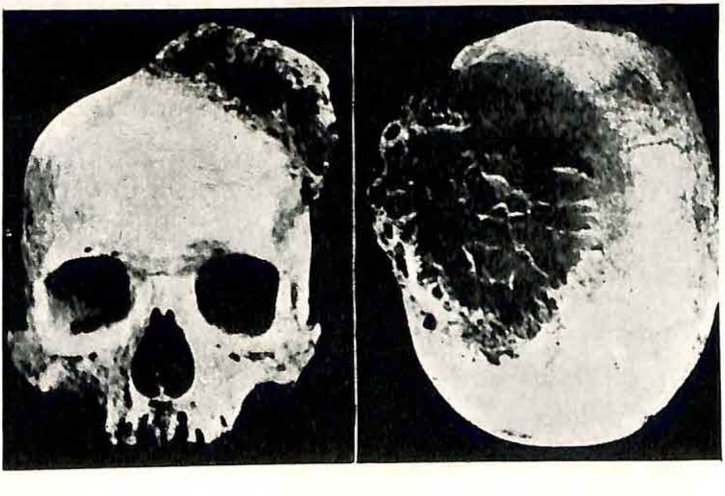

চিত্র ২—প্রাগ্‌-ঐতিহাসিক মানুষের করোটিতে অর্বুদ (পেরু দেশে প্রাপ্ত)।

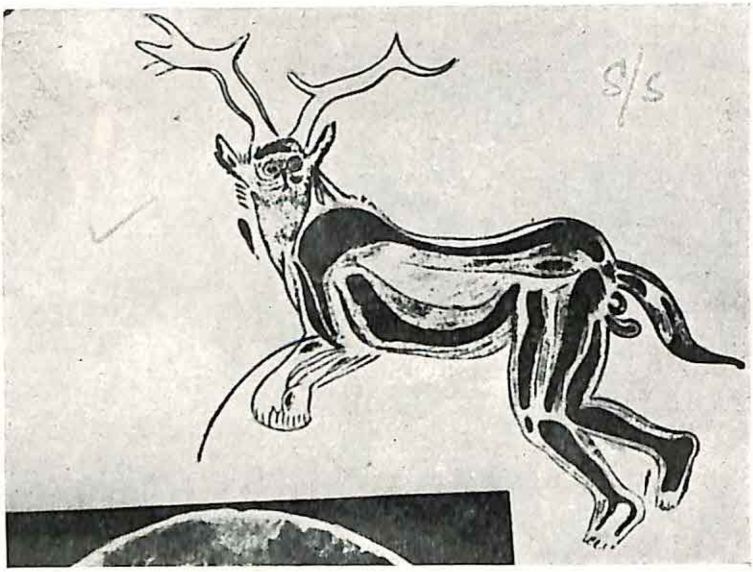

চিত্র ৩—অরিগনাসিয়ান যুগের এক যাদুকর চিকিৎসক
(পিরেনিস পর্বতের গুহাচিত্র)।

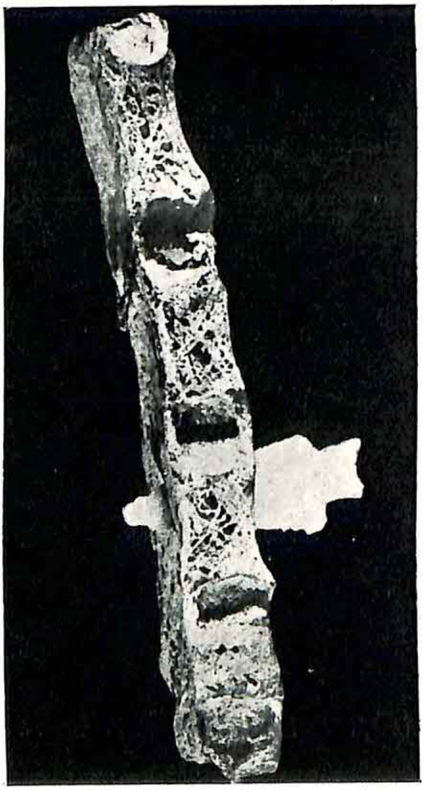

চিত্র ৪—প্রস্তর নির্মিত তীরবিদ্ধ মানুষের বক্ষাস্থি (প্যাটাগোনিয়াতে প্রাপ্ত)

অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেন সেগুলো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্থিবিদ্ধ করতে সক্ষম হ'ত।

চিত্র—৪

নৃতত্ত্ববিদগণের মতে প্রাচীন শল্য চিকিৎসকদের অস্ত্র প্রথমতঃ প্রস্তর, আগ্নেয় শিলা, আগ্নেয় স্ফটিক এবং কালক্রমে তাম্র ও লৌহের দ্বারা নির্মিত হয়।

করোটি ছিদ্রকরণ দ্বারা হয়তো প্রাচীন মানুষ করোটির অভ্যন্তর হ'তে শিরঃপীড়া, মৃগীরোগ বা মানসিক রোগের কাল্পনিক অপদেবতা বিতাড়ন করতেন। সিন্ধুনদের অববাহিকায় আবাসকারী প্রাক্ আর্য ভারতীয়গণও করোটি ছিদ্রকরণে পারদর্শী ছিলেন। সর্বসাকুল্যে তাদের কৃত দুটি ছিদ্রিত করোটি সিন্ধুনদের অববাহিকায় পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে একটি ছিল উত্তর কাশ্মীরের বুর্জাহোম নামক স্থানে। যেটি পুরাতন পলীয় যুগের (আনুমানিক ২৩৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দের)। দ্বিতীয়টি নবপলীয় যুগের, সেটি পাওয়া গিয়েছে হরপ্পা নগরীর সন্নিকটে এক কবরে (আনুমানিক ২৩০০ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের)।

চিত্র—৫ ও ৬

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকগণ নানাবিধ অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা মুখ্যতঃ ছিলেন পুরোহিত কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ের দ্বারা বিকল্পে অর্থোপার্জন করতেন। এবেরস্ ও এডউইন স্মিথ্ নামক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মিশরীয় ভূর্জপত্রলিখন থেকে বহু প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাবিধি ও ভেষজাদির তালিকা আবিষ্কার করেছেন।

চিত্র—৭

কবে পৃথিবীতে প্রথম মানব সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল তার সঠিক কাল এখনও নিরূপণ করা যায়নি। অতিকথায় আট্লান্টিস্ নামে এক বিশাল সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশের উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশটি আতলান্তিক মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। কথিত আছে যে, ঐ ধ্বংসের প্রাক্কালে কতিপয় আটলান্টিসবাসী আফ্রিকা ও ইউরোপের উপকূলে উপস্থিত হয় এবং কালক্রমে মিশর, সুমেরীয়া ও প্রাক্ আর্য ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। প্রাচীন ভারত, সুমেরিয়া এবং মিশরে সভ্য মানুষের প্রাচীনতম চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহ্য

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উন্মেষকালে বর্তমান সুসভ্য আখ্যাধারী য়ুরোপীয়গণ ছিল সভ্যতার অস্তিত্বহীন অন্ধকারে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও তক্ষশীলা প্রভৃতি প্রাচীন শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, খৃষ্টজন্মের অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হাজার বৎসর আগে থেকে মানুষ সেখানে বাস করত। উক্ত প্রাচীন শহরগুলির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আছে সুনির্মিত বাসগৃহ, স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সমৃদ্ধির অসংখ্য নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও প্রতীচ্যের বহু ঐতিহাসিক গ্রীক সভ্যতাকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পুরাতন প্রমাণ করতে সচেষ্ট, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড-বাসী বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পোকক্ তাঁর "ইণ্ডিয়া ইন্ গ্রীস্" নামক পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন যে সুসভ্য ভারতীয়রাই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার জনক! আমাদের প্রাক্তন ইংরাজ শাসকেরা ভারতীয় উৎকর্ষের বিষয় সব সময় স্বীকার করত না, কিন্তু ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, দিনেমার, স্কাণ্ডিনেভীয় ও রুশিয় বহু পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা ইংরাজদের মত ভারত বিদ্বেষী মতবাদ পোষণ করতেন না। কৃষ্ণমাচারী তাঁর "এসেজ অফ এন্সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে প্রাচীন পারসিক, গ্রীক, রোমক, স্কাণ্ডিনেভীয়, ফিনীসিয় ও ইংল্যাণ্ডের ড্রুইডগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ এক প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী কোন মহাদেশ থেকে এসেছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত অ্যাজটেক নৃপতি মন্টিজুমাও মনে করতেন যে তাঁর পূর্বপুরুষগণ প্রাচ্য থেকে পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

বর্তমানে প্রচলিত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্ম যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী, খৃষ্ট, ইসলাম, জোরস্তারীয়, কন্ফুসীয়, সিণ্টো প্রভৃতির উৎপত্তিস্থান এশীয় মহাদেশের কোনও না কোনও স্থানে। উক্ত ধর্মসমূহ যাঁরা প্রণয়ন করেছিলেন তাঁরা কি সুসভ্য মানুষ ছিলেন না? সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে প্রতীচ্যের কোথাও কোন ধর্মের উন্মেষ হয় নি। উপরিউক্ত উদাহরণ দিয়ে কি প্রমাণিত হয় না যে প্রাচ্যের সভ্যতা প্রতীচ্যের সভ্যতার অগ্রগামী?

আজ পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও শাখা নেই যা হিন্দু পণ্ডিতগণের অগোচরে ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ

অবিসম্বাদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়গণ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিলেন।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং একদা বলেছিলেন "প্রাচ্য প্রাচ্যই ও প্রতীচ্য প্রতীচ্যই, এই দুইএর কখনও মিলন হবে না।" কিন্তু আজ নভোচারণের যুগে উক্তিটি অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটেছে এবং প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। এই মিলনের ফলে আমরা আজ বুঝতে পেরেছি যে আমরা একই মানবগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, আমাদের কৃষ্টির উৎস এক, আমাদের আশা, নিরাশা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এক। মার্কিন মণীষী ওয়েন্‌ডেল্ উইল্‌কি হয়তো "এক মানুষ এক পৃথিবীর" অনুরূপ কল্পনাই করেছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র মানবজাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে এসেছিল। আদিম মানুষ এবং জন্তু জানোয়ার সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সমকালীন রোগ ও আঘাতের চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করেছিল। কালক্রমে আদিম মানুষের চিন্তা যত পরিণত হতে লাগল, চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে ধর্মভীরুতা ও অলৌকিকতা প্রবেশ করল। প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস হল যে রোগের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভূত, প্রেত, দৈত্য ও ডাইনীরা। মানুষের মনে ভগবতভাবের উদ্রেক হল এবং তারা সৃষ্টি করল অসংখ্য দেবতা-গোষ্ঠী। পরাক্রমশালী ব্যক্তিবিশেষকেও তারা দেবজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই দেবতারা আদিম মানুষের ভগবতগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেই চলল। বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা তখন মানুষের আয়ত্তে ছিল না।

পরবর্তীকালের হিন্দুগণের বিশ্লেষণশীল ও সৃজনকারী দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি আছেন সেই তথ্যকে বিশ্বাস করেন না। কেননা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত নিদর্শন প্রথমতঃ ছিল না। শিক্ষাগুরুর মুখনিসৃত বাণী অনুসরণ করতেন শিষ্য এবং শিষ্য থেকে শিষ্যান্তরে সেই বাণী প্রচারিত হত। আমাদের পূর্বপুরুষদের আরও একটি অসুবিধা ছিল তাঁরা চিত্রের মাধ্যমেও বিশেষ কিছু ভবিষ্যতের জন্যে রেখে যান নি। ভারতের প্রাচীনতম গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে মধ্য প্রদেশের শ্যামলা পর্বতের ধর্মগিরিতে; চিত্রটি তাম্রযুগের মানুষের আঁকা। চিত্রটিতে দেখা যায় যে তাম্রযুগের কতিপয় শিকারী একটি বন্য মহিষের

হৃদযন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপরত। সুতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে তাঁরা হৃদযন্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। আমরা উক্ত চিত্র থেকে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সেই তাম্রযুগের মানুষ মানব হৃদয়ের অবস্থান ও কার্যকারিতাও জানতেন।

চিত্র—৮

আর্যগণের ভারতে আগমণের বহু শতাব্দী পূর্বে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো, চান্‌হুদারো, হরপ্পা, রোপার এবং গুজরাটের লোথাল নামক স্থানে এক সুসভ্য জাতি বাস করত। সেই জাতীয় লোকেরা তিগরীস্ ও অয়ফ্রাতিস্ নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী সভ্য এলামাইট, সুমেরীয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপবাসী মিনোয়ানগণের সমসাময়িক ছিলেন। সিন্ধুনদের অববাহিকার সেই সভ্য মানুষেরা খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বে যে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসরণ করতেন সে সম্বন্ধে কোন লিখিত বা চিত্রিত প্রমাণ নেই। অবশ্য সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত বহু পাথরের মোহরের উপরে যে সমস্ত চিত্র ও লেখন খচিত আছে সেগুলি আজও সভ্য মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। সিন্ধুনদের মানুষেরা বোধহয় ভৌতিক, ধর্মীয় ও কাল্পনিক প্রক্রিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করতেন। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাদের যে অতি আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারণা ছিল সেটা বোঝা যায় তাদের তৈরী গৃহ, পথ, স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর গঠন বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তি শৈলী দেখে।

চিত্র—৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

যখন আর্যরা সিন্ধু অববাহিকায় প্রবেশ করলেন তারা নিয়ে এলেন তাঁদের দেবতাসমষ্টি, সামাজিক নিয়মাবলী এবং প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধি ও প্রথা। ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন কৃষ্টির অনুগামী হলেও সিন্ধু সভ্যতা তাদের উপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্যদের কৃষ্টি ও চিকিৎসাশাস্ত্রে মূল সূত্র পাওয়া যায় তাদের রচিত ৪টি বেদের মধ্যে। প্রচলিত আছে যে, মানবজাতির সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা খৃষ্টজন্মের ৬০০০ বৎসর আগে তৎকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের বেদশিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষা মৌখিকভাবে ভবিষ্যতে প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন যে ঋগ্‌বেদ খৃষ্টজন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। ঋগ্‌বেদের মধ্যেই নিহিত আছে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসার প্রাথমিক চিন্তাধারা। সামবেদও যজুর্বেদ ও ঋগ্‌বেদের সমধর্মী। পরবর্তীকালে রচিত অথর্ববেদের মধ্যে রোগের

চিকিৎসার বহু নিয়মাবলী আছে। বেদের সংকলিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সংহিতা নামক বহু মহাকোষ রচিত হয়েছিল।

বর্তমানে বহু প্রচলিত আয়ুর্বেদ কথাটির অর্থ আয়ু অর্থাৎ জীবন এবং বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, অর্থাৎ জীবনরক্ষার জ্ঞান। সরল ভাষায় আয়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদে প্রচলিত চিকিৎসার বিধি কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তরোত্তর উন্নত হয়েছিল ও শিক্ষক থেকে শিষ্য এবং শিষ্য থেকে শিষ্যান্তরে প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক চিকিৎসাবিধিও বেদোক্ত চিকিৎসাবিধির মত ভৌতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ৬০০ বৎসর পূর্বে প্রচলিত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মা এক লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন যার মধ্যে কায়চিকিৎসা (মেডিসন) ও শল্যতন্ত্র (সার্জারী) দুটি প্রধান উপখণ্ড ছিল। ব্রহ্মা প্রথমে দক্ষ প্রজাপতিকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সুযোগ্য ছাত্র সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমার নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের ভিষক্ ছিলেন কিন্তু বেদে তার কোনও উল্লেখ নেই। সূর্য্যের প্রবল তেজ সহ্য করতে না পেরে সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা তাঁর ছায়া মূর্তিকে রেখে অশ্বীরূপ ধারণ করে উত্তর মেরুতে পলায়ন করেছিলেন। সূর্য সংজ্ঞার প্রবঞ্চনা ধরতে পেরে তাঁর সহিত মিলিত হলেন। ফলে সংজ্ঞার অশ্বিনীকুমার নামক যমজপুত্র হল। কাহিনীটি প্রাগ্ বৈদিক বা বৈদিক নয়। ঐতিহাসিকগণের মতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিবরণী সম্ভবতঃ পৌরাণিক কল্পনা। তাঁরা যে রোগ নিরাময়কারী দেবতা তা আরও পরবর্তীকালের কল্পনা।

ঋগ্বেদে তাঁদের "অশ্বিদ্বয়" বা "অশ্বিনৌ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে ওঁদের আরও দুইটি নাম পাওয়া গিয়াছে যথা "দস্র" ও "নাসত্য"। ঋগ্বেদের দশ মণ্ডলের একশ উনত্রিশ সূক্তকে "নাসদীয় সূক্ত" বলা হয় কারণ এই খণ্ডের দ্রষ্টা নাসত্য বা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আচার্য আগ্রায়ন বলেন যে, অসত্য ভাষণ রহিত বলিয়া অশ্বিদ্বয়ের নাম নাসত্য। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি ও সোমদেবতার স্তুতির পরেই অশ্বিদ্বয়ের স্থান। কথিত আছে যে, অশ্বিদ্বয়ের একজন জ্যোতির দ্বারা ও অপরজন রসের দ্বারা সর্বজগতকে পরিব্যাপ্ত করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্ডোনেল মনে করেন যে, অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্ভবতঃ

প্রাক্ বৈদিক যুগে, পরবর্তীকালে তাঁরা বৈদিক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। গোল্ডষ্ট্যুকের ও হপ্‌কিন্স্ মনে করেন উষার পূর্বে আলোক-অন্ধকার অবস্থা যে সময় আলোককে অন্ধকার হতে বা অন্ধকারকে আলো হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না সেই যুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাই অশ্বিদ্বয়। লুড্‌হিবগ্ মনে করেন যে অশ্বিদয় চন্দ্র ও সূর্য। ম্যাকসমূল্যের বলেন যে, অশ্বিদ্বয় উভয় প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল। হিবস্তেরনিৎস্ বলেন যে, অশ্বিদ্বয় অপরাপর বৈদিক দেবতাগণের ন্যায় নৈসর্গিক ঘটনা হতে উদ্ভূত। তাঁর মতে গ্রীক পুরাণে বর্ণিত জিউস্ ও এরিনিস্ কর্তৃক অশ্ব ও অশ্বী রূপ ধারণ করে এরিয়ন ও দেশপিয়ান্ নামক দুই সন্তানের জন্মদান বৈদিক রূপক থেকে গ্রীসের পুরাণে এসেছে।

অশ্বিদ্বয় যে রোগ নিরাময়কারী তার কিছু অস্পষ্ট ইঙ্গিত বৈদিক শব্দতত্ত্বে আছে। মুনিগণের মতে অশ্বিদ্বয় সর্বজন পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন এবং একজন জ্যোতির দ্বারা ও অপরজন রসের দ্বারা পরোপকার করেন। ওল্ডেনবুর্গ বলেছেন যে, পরহিতকর কার্যের জন্যই অশ্বিদ্বয়কে দেবতাদের ভিষকরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

চিত্র—১৪

কিথ্ ও ম্যাক্‌ডোনেল্ নামক পণ্ডিতদ্বয় বলেছেন যে অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় রোগগ্রস্ত অঙ্গছেদন এবং রোগগ্রস্ত অক্ষিগোলক উৎপাটন করতে পারতেন। হুগো ভিঙ্কলের নামক প্রখ্যাত জার্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ এশিয়া মাইনরের কাপ্পাদোচিয়া প্রদেশের বোঘাজ্‌কিও নামক স্থানে খনন কার্য করে মৃত্তিকা ফলকের উপর বানমুখী লিপিতে লিখিত বহু পুস্তকে বেদে উল্লিখিত ভগবানগণের নাম পেয়েছেন এবং ইহা ব্যতীত বহু ভারতীয় চিকিৎসা চিন্তাধারাও উক্ত পুস্তকসমূহে লিখিত আছে।

সুতরাং খৃষ্টজন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্বে বোঘাজ্‌কিওতে বসবাসকারী মিতান্নী-গণও বেদের ভগবান ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঈশ্বরকূলের প্রধান ইন্দ্রকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অনুমান করা হয় ইন্দ্রের নিকট হতে সর্বপ্রথম ভরদ্বাজ নামক ব্যক্তি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি আত্রেয়কে

চিত্র—১৫

শিক্ষা দেন এবং অপরাপর মুনিগণকেও ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

যাঁদের মধ্যে অগ্নিবেশ আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। বিখ্যাত প্রচীন ভারতীয় ভেষজ চিকিৎসক চরক তাঁর "চরক সংহিতায়" বলেছেন যে তিনি তাঁর গুরু আত্রেয়কে সদাই অনুসরণ করেছেন।

চরক কায়চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি মৌলিক উপাদান দ্বারা (ত্রিদোষ) দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া পরিচালিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণও উক্ত মতের অনুসারী ছিলেন। চরক অরণ্যচারী পশুপালকদের নিকট হতে বিভিন্ন ঔষধিগুণবিশিষ্ট লতাগুল্ম সংগ্রহ করে চিকিৎসাবিদ্যায় প্রয়োগ করতেন।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, প্রথমতঃ শিক্ষা আরম্ভ করবার পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু নির্বাচন। শিক্ষার্থীকে হতে হবে ধীরচিত্ত। সুরা, নারী, পরকুৎসা, মৃগয়া, নৃত্য ও গীত প্রভৃতিতে আসক্তি থাকলে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাঘাত হবে।

চিত্র—১৬

অপর এক কিংবদন্তীতে বলা হয় যে, ইন্দ্র ধন্বন্তরী নামক ব্যক্তিকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। যিনি কাশীরাজ দীবদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সুশ্রুতের শিক্ষাগুরু। অতি পরিতাপের বিষয় যে মূল আয়ুর্বেদের কোন পুস্তক আজ আর বর্তমান নেই। কিন্তু চরক ও সুশ্রুত সংহিতার মধ্য দিয়েই আমরা তার কিছু অংশের পরিচয় পাই। আনুমানিক খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর আগে ঐ সংহিতা দুটি রচিত হয়েছিল।

সুশ্রুত সংহিতা শল্যচিকিৎসাধর্মী এবং চরক সংহিতা কায় চিকিৎসাধর্মী। উভয় পুস্তকই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তাসমৃদ্ধ। উভয় পুস্তকেরই মূল প্রণেতাগণ কুসংস্কারাবদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে চিকিৎসাবিদ্যাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন। সুশ্রুত সংহিতা বর্তমানেও প্রাচীন ভারতীয় শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সমাদৃত। পরবর্তীকালে নাগার্জুন নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু চিকিৎসক সুশ্রুত সংহিতার আমূল সংস্করণ ও সম্পাদনা করেন। বর্তমানে প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতা উক্ত সংস্করণেরই প্রতিলিপি। সুশ্রুত সংহিতার সর্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষগরত্ন ভাদুড়ী মহাশয়। গ্রন্থটি এখনও সমগ্র পৃথিবীর চিকিৎসা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সমাদৃত।

প্রাচীন ভারতীয়গণ ছিলেন শল্যচিকিৎসা, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান ও ভেষজশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। বিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত শল্যচিকিৎসার দ্বারা খণ্ডিত নাসিকার পুনর্গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণেরই অবদান। আজও উক্ত পদ্ধতি "ভারতীয় নাসিকা গঠন শল্যতন্ত্র" (ইণ্ডিয়ান রাইনোপ্লাষ্টি) নামে পরিচিত।

চিত্র—১৭

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই সর্বপ্রথম মানুষের শরীরের এক স্থান হতে অন্য স্থানে চর্ম স্থানান্তরণ ও সংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সুশ্রুত তাঁর রচিত "সুশ্রুত সংহিতা" নামক পুস্তকে শল্যচিকিৎসা, ভেষজবিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান, ধাত্রীবিদ্যা, জীববিদ্যা, চক্ষুরোগবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ মতবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি স্বয়ং শতাধিক শল্যচিকিৎসাযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে বহু যন্ত্র আধুনিকযুগের শল্য যন্ত্র নির্মাণের পথ প্রদর্শক।

চিত্র—১৮

সুশ্রুত-এর কালে মানব শরীরের শারীরস্থান পাঠের জন্য এক অভিনব শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ছুরিকার দ্বারা শবব্যবচ্ছেদ না করে মৃতদেহ কুশাচ্ছাদিত করে নদীর অগভীর জলে নিমজ্জিত রাখা হত। ধীরে ধীরে শবের পচন আরম্ভ হলে অতি সহজেই চর্ম হতে স্তরে স্তরে দেহাবরণ উন্মোচন করে ছাত্ররা শারীরস্থান বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করত। সুশ্রুতই উপরিউক্ত অভিনব শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতির উদ্ভাবক্।

সুশ্রুত শল্যতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করেছিলেন যথা:—(১) ছেদন (এ্যাম্পুটেশন্), (২) ভেদন (একশিসন্), (৩) লেখন (স্ক্রেপিং), (৪) এস্তন (প্রোবিং), (৫) আহরণ (একস্ট্রাক্শন্), (৬) বিশ্রবণ (ড্রেনেজ) এবং (৭) সীবন (স্যুচারিং)।

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁর শিষ্যরা রোগগ্রস্ত হলে পরিচর্যা করতেন। তাঁর স্বকীয় চিকিৎসক জীবক শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং মস্তিষ্কের শল্য চিকিৎসাও করতেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎজিং

চিত্র—১৯

বলেছেন যে, বুদ্ধদেব নিজেও চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধযুগের

চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুর্বেদ এর অনুসারী ছিল। সে যুগের চিকিৎসকেরাও আয়ুর্বেদোক্ত "ত্রিদোষ" মতবাদের ভিত্তিতে চিকিৎসা করতেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বাউয়ার মধ্য এশিয়ার কাসগড়ের এক বৌদ্ধ স্তূপে একটি গুপ্তযুগের লিপিতে লিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই লিপিতে বুদ্ধদেবকে "ভেষজগুরু" নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভগবান বলে উল্লিখিত করা হয়েছে। প্রাচীন চীন দেশে তিনি "ভূ-গুরু" এবং বর্তমান জাপানেও তিনি "ইয়াকুশু নিওরাই" বা গুরুদেব নামে পরিচিত।

ইৎজিং লিখে গিয়েছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারসমূহে আয়ুর্বেদের মতবাদ অনুসারে রোগের চিকিৎসা করা হত।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র রাহুল ও তাঁর বিখ্যাত শিষ্য সম্রাট অশোক বহু আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদও সেই সমস্ত দেশে প্রচারিত হয়েছিল। দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে হিন্দু কৃষ্টি ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় লিখিত এক চিকিৎসা পুস্তকে ঔষধকে বলা হয়েছে "উষদ" এবং "ত্রিদোষ" "ত্রিনাড়ী" নামে অভিহিত। চৈনিক আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত তিব্বতে আয়ুর্বেদানুগ চিকিৎসা করা হত। লাসার "চাকপোরি" চিকিৎসা বিদ্যালয়ে তিব্বতী ভাষায় অনুদিত বহু সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে। তন্মধ্যে "ঋগিউদ্‌বিজ" অর্থাৎ "চতুর্তন্ত্র" উল্লেখযোগ্য। পুস্তকটির আদি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির আর কোনও অস্তিত্ব নেই। তিব্বত থেকে আয়ুর্বেদ মঙ্গোলিয়া ও উত্তর পশ্চিম সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। চীন দেশের সিংকিয়াংএর "কুম্‌বুম্‌" বৌদ্ধবিহারে হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতি ভিত্তিক অনেক প্রাচীর চিত্র আছে। মঙ্গোলিয়ায় ইয়ুং হোকুং বিহারেও বহু অনুরূপ চিত্র আছে। উক্ত বিহারে প্রাচীনকালে ছাত্রগণ চীনের বেইজিং, মঙ্গোলিয়ার উগ্রা, কি আখতা ও কোবোদো, বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী সংস্কৃত ভাষাভাষী বুরিয়াৎ দেশ, ভল্গা তীরবর্তী কালমুক্‌-দেশ, মাঞ্চুদেশের ৎসিৎসিখার, কোকোনর এবং লাসা থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার মানসে আসতেন।

লেনিনগ্রাদ-এর বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক বামায়েভ উপরিউক্ত মঙ্গোলীয় বিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত

রোগীদের মধ্যে ছিলেন বুখারিণ, রাইকোভ, আলেক্সি টলষ্টয় এমন কি যোশেফ্ স্তালিনও।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সেই সময় বৃদ্ধ ভাগভট্ট চরক ও সুশ্রুত সংহিতার সমন্বয়ে "অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ" নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ ভাগভট্ট "অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা" নামক আরও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ সংগ্রহকে একত্রে "বৃদ্ধত্রয়ী" নামে অভিহিত করা হত।

অষ্টম খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য "নিদান" নামে সর্বপ্রথম ভারতীয় নিদানশাস্ত্র (প্যাথলজী) বিষয় পুস্তক লেখেন। চরম উৎকর্ষতার জন্য উক্ত গ্রন্থটিও

চিত্র—২০

পরম সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমানের আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে মাধব নিদানশাস্ত্রে, ভাগভট বিধান-এ, সুশ্রুত শল্যতন্ত্রে এবং চরক কায়চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক এক দিক্‌পাল। ইন্দুকার এর পুত্র মাধব, মাধবকার বা মাধবাচার্য রোগ নিদানশাস্ত্রকে ৭৯টি অধ্যায়ভুক্ত করেছিলেন। "মসুরিকা" বা বসন্ত রোগের উপর তাঁর জ্ঞানপ্রকাশ ছিল অনবদ্য। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র "ভাবপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে "নিদান" গ্রন্থটির পুনর্সম্পাদনা করেছিলেন। উক্ত সম্পাদিত সংস্করণটি আরবীগণ "নিদান", "বদন্" ও "ইয়েদান" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অনুবাদ করেছিল। ভাবমিশ্র বারাণসী নগরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁর খ্যাতি দিকে দিকে এত ব্যাপ্ত হয়েছিল যে তাঁকে তৎকালীন চিকিৎসা জগতের মধ্যমণি বলা হত।

চিত্র—২১ ও ২২

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন চৈনিকগণ খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব হতেই চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। সেনন্থ্যং (৩০০০ খৃঃ পূঃ) নামক চৈনিক নৃপতি অবসর বিনোদনের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রাভ্যাস করতেন। "পেন্ সাউ" নামক বৃহৎ গ্রন্থে তিনি বহু ঔষধের ব্যবহারবিধি লিখে গিয়েছেন। খৃঃ পূঃ ২৬৫০ অব্দে হোয়াংতি নামক অপর এক চৈনিক নৃপতি "নাইচিং" নামক একখানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। উইলিয়াম হার্ভের জন্মের বহু পূর্বেই হোয়াংতি লিখে

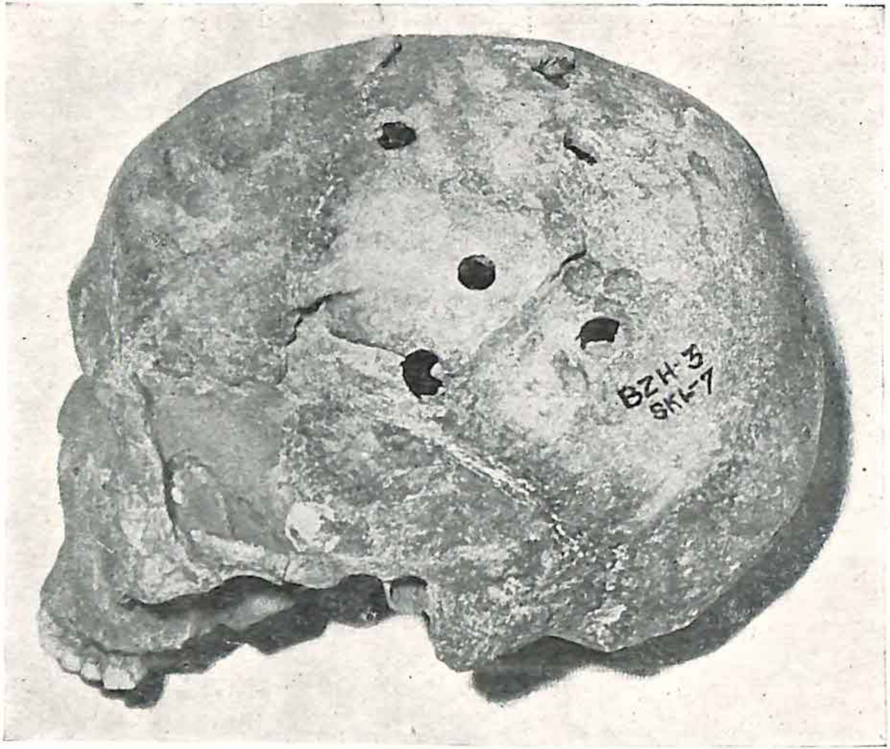

চিত্র ৫— ভারতের বুর্জাহোম-এ প্রাপ্ত সছিদ্র করোটি (আনুমানিক ২৩৭৫ খৃঃ পূঃ—ভারতীয় নৃতত্ত্ব সংস্থার সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

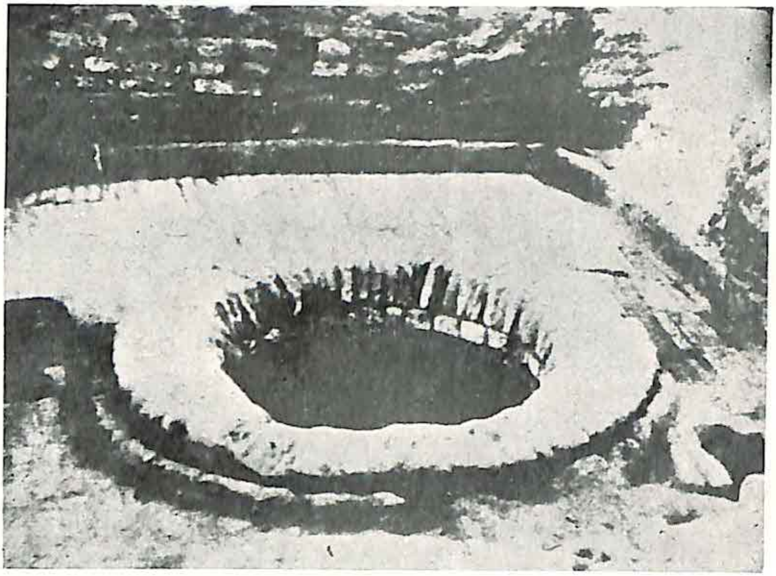

চিত্র ৯—মহেঞ্জোদারো-এর কূপ।

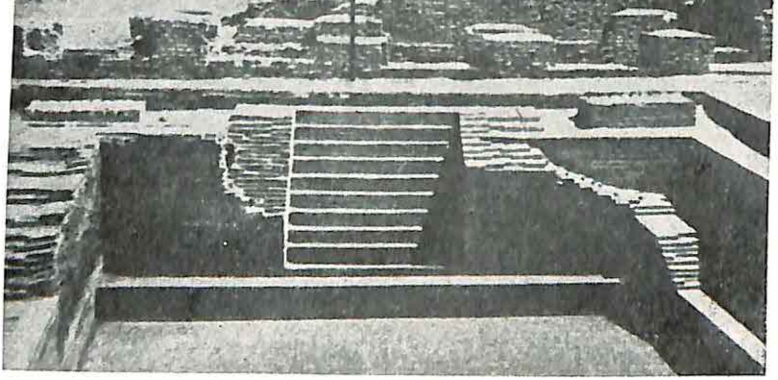

চিত্র ১০—মহেঞ্জোদারো-এর জনসাধারণের স্নানাগার।

গিয়েছেন যে, শরীরের সমস্ত রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র দ্বারা চক্রাকারে সঞ্চালিত হয়। কিন্‌ল্যুং নামক অপর এক নৃপতি ৪০ খণ্ডে বিভক্ত এক অতি বৃহৎ চিকিৎসা সংকলন রচনা করেছিলেন। আয়ুর্বেদের পঞ্চভূতের ন্যায় তিনি বলতেন যে, মানবশরীর মৃত্তিকা, অগ্নি, জল, কাষ্ঠ ও ধাতু এই পাঁচটি উপাদান দ্বারা গঠিত।

একথা অবিসংবাদিত যে, বৌদ্ধযুগে প্রচলিত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রভাবান্বিত করেছিল। বৌদ্ধ তীর্থঙ্কর বা ধর্ম প্রচারকেরা ধর্ম প্রচারের মানসে দুর্গম হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম পরিক্রমা করে তিব্বতে যান ও তিব্বতের সংলগ্ন চীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র চীন, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া দেশে প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে উহা জাপানেও প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে অপরাপর ভারতীয় শাস্ত্রসমূহও উক্ত দেশসমূহে প্রবর্তিত হয়। চৈনিক প্রাচীন ধারার চিকিৎসা-শাস্ত্রে সেইজন্য এখনও আয়ুর্বেদের লক্ষণ বিদ্যমান।

বর্তমান জগতের চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুল প্রচলিত সূচিকাবিদ্ধকরণ (এ্যাকুপাংচার, সংস্কৃত: অকুশ, অঙ্কুশ=সূচিকা; লাতিন: অ্যাকুশ= সূচিকা) প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অতি বিশিষ্ট অবদান। সূচিকাবিদ্ধ-করণ দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবসাদ ঘটানো যায় এবং সেই সকল স্থানে বেদনা নিরোধিত হয়। সূচিকাবিদ্ধকরণ দ্বারা বিনা বেদনায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। সূচিকাবিদ্ধকরণ করলে কেন অবসাদ হয় সে সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর মেল্‌জাক্‌ ও ওয়াল্‌ নামক দুই শারীরবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত সূচিকাবিদ্ধণের ফলে সাময়িকভাবে মেরুমজ্জার মধ্যে অবস্থিত স্নায়ু সংযোগস্থলে কপাটিকা বন্ধ হওয়ার মত এক ঘটনা ঘটে (গেট কণ্ট্রোল)। উক্ত ঘটনার ফলে বেদনার অনুভূতি স্নায়ুরজ্জুর মধ্য দিয়ে মেরুমজ্জার মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে না এবং রোগীর বেদনার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়।

জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র থেকেই প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু জাপানীগণের বহুকাল ধরে অজ্ঞাতবাসের ফলে প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। ১৮ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ জাপানী শল্যচিকিৎসকের নাম সেইসু হানাওকা (১৭৬০—১৮৩৫)।

তিনি হিরায়ামা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা তথাকথিত এক প্রতীচ্য শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে সেইস্থ কিয়োতো শহরে

চিত্র—২৩

চৈনিক চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন ও তৎপর প্রকৃত প্রতীচ্য শল্যবিদ্যাভ্যাস করেন। সেইস্থর জীবৎকালে ওলন্দাজ ছাড়া কোনও য়ুরোপীয়কে জাপানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। প্রতীচ্য শিক্ষা ওলন্দাজদের মাধ্যমে নাগাসাকি বন্দরের পথে জাপানে প্রবেশ করেছিল। ওলন্দাজগণ কর্তৃক প্রবর্তিত চিকিৎসা-শাস্ত্রকে "রাঙ্গাকু" নামে অভিহিত করা হত।

সমসাময়িক কালের "রাঙ্গাকু" পদ্ধতিতে শিক্ষিত অপর দুই পণ্ডিতের নাম ছিল যথাক্রমে গেনপাকু স্থগিতা ও রিয়োতাকু মাইনো। রাঙ্গাকু চিকিৎসাবিদ্যা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও মৌলিক চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রই জাপানে পরম সমাদৃত ছিল। প্রতীচ্য চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত বহু জাপানী চিকিৎসকও চৈনিক চিকিৎসাবিধি অনুসরণ করতেন। সেইস্থর ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি সর্বপ্রথম চৈনিক শল্যশাস্ত্রজ্ঞ হুয়া তো-এর ঘনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং স্বীয় উদ্ভাবিত এক প্রকার অবচেতক ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীর দেহে দুরূহ অস্ত্রোপচার করতেন। সেই বিখ্যাত ও ফলদায়ী অবচেতক ঔষধের নাম"ৎসুসেন্‌সান্"। ঔষধটি **দাতুরা, এ্যাকোনাইট, আংগেলিকা দাহুরিয়া, আংগেলিকা দেকুরসিভা, লিগুইসটিকুম্ ওয়াল্লিচি** ও **আরিসেইমা জাপানিকুম্** প্রভৃতি ভেষজের এক সংমিশ্রণ। বর্তমানে উক্ত সমস্ত ভেষজের গুণাবলী ভেষজ বিজ্ঞানে সুপরিজ্ঞাত।

চৈনিক সূচিকা চিকিৎসার অনুকরণে প্রাচীন জাপানে "মোক্সা" নামক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। উক্ত চিকিৎসায় সূচিকাবিদ্ধনের পরিবর্তে বেদনা উপশমের জন্য শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অগ্নিদ্বারা ফোস্কা সৃষ্টি করা হত। ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও প্রচলিত "গুল" দেওয়া বা ফোস্কা চিকিৎসা প্রচলিত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের মতে উক্ত চিকিৎসা "কাউণ্টার ইরিটেশান্ থেরাপি" ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বর্তমানকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জাপানীদের উৎকর্ষ দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। এ্যাডমিরাল পেরী নামক মার্কিণ নাবিক পৃথিবীর কাছে জাপানকে উন্মুক্ত করেন এবং জাপানীগণ উত্তরোত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব পারদর্শিতা অর্জন করেন। আজকের

পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষে জাপান আমেরিকা, জার্মাণী ও অপরাপর উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতিশীল এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন জটিল যন্ত্র নির্মাণে জাপানের কুশলতা আশ্চর্যজনক। আজকের জাপান পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনেও পৃথিবীতে অগ্রগণ্য।

প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

বর্তমান থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সিমেঁ দ্য লা লুব্রে নামক ফরাসী রাজদূতের লিখন থেকে জানা যায়। তিনি তৎকালীন থাই রাজধানী 'আয়ুথায়া' বা অযোধ্যা নগরীতে বসবাস করতেন। তিনি লিখেছেন যে, প্রাচীনতম শ্যামদেশীয় চিকিৎসা পুস্তক সপ্তদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মত প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা গুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী থেকে শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত হত। কালক্রমে উক্ত বিদ্যাধারার কিয়দংশ খমের ও পালি ভাষায় তালপত্রে লিখিত হয়। পরবর্তীকালে ঐগুলি মূল থাই ভাষাতেও অনুদিত হয়। য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত লাতিন ভাষার ন্যায় থাইদেশে পালি ও সংস্কৃত ভাষা পরম সমাদৃত ছিল। থাইভাষার চিকিৎসা পুস্তকে ভগবানবুদ্ধের চিকিৎসক জীবক "জীবক কোমারবচ্চ" নামে পরিচিত। প্রাচীন থাই চিকিৎসাবিদ্যাও ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অনুকরণ মাত্র।

বর্তমান থাইল্যাণ্ডে প্রতীচ্য চিকিৎশাস্ত্রের প্রবর্তন করেন সম্রাট চুলালঙ্করণ। তিনি অতি প্রগতিপন্থী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রতীচ্যের এবং মার্কিন দেশের বহু চিকিৎসককে তিনি থাইল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করে আনেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। রাজকোষপুষ্ট আধুনিক থাই চিকিৎসাবিধি অতি উচ্চমানের।

সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

সুমেরীয়গণের রাজধানী ছিল অয়ফ্রাতিস্ নদীর তীরবর্তী উর নামক নগরে। খৃষ্টজন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে সুমেরীয় সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। সুমেরীয় সভ্যতা আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন। উর নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় বহু বানমুখী লিপিতে লিখিত মৃত্তিকাফলক

চিত্র—২৪

আবিষ্কৃত হয়। উক্ত ফলকসমূহের কিয়দংশে সুমেরীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশদ বিবরণ আছে। বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় নৃপতি হাম্মুরাবী (১৯৪৮-১৯০৫ খৃঃ পূঃ) তাঁর শাসনকালে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি ও সামাজিক নিয়মাবলী প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। উক্ত নিয়মাবলী পরবর্তীকালে "হাম্মুরাবীর নির্দেশ" নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। একটি লিপিতে তিনি ধনাঢ্য রোগীর চিকিৎসার ব্যয় এবং দরিদ্রের চিকিৎসার ব্যয়ের পরিমাণও স্থির করে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চিকিৎসকের অসাবধানতায় রোগীর শারীরিক ক্ষতি হলে অভিযুক্ত চিকিৎসকের হস্তচ্ছেদন করা হত। হেরোডোটুস্ বলেছেন যে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয়গণ চিকিৎসা-ব্যবসা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসুক ও সচেতন ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা অজ্ঞাত বা অসহায় রোগীকে শহরের জনাকীর্ণ স্থানে এনে রাখতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, কোন পরিব্রাজক চিকিৎসক রোগীটিকে লক্ষ্য করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রাচীন ব্যাবিলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণও চিকিৎসা করতেন।

চিত্র—২৫ ও ২৬

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

মিশরের ফেরোদের রাজত্বকালে সাধারণতঃ পুরোহিতগণ চিকিৎসা-ব্যবসা করতেন। ইমহোটেপ্ নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক মিশরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন চিকিৎসক ও স্থাপত্যবিদ্যাবিদ্।

চিত্র—২৭

সাকারা-এর বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণে তিনি সহায়তা করেছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ দাবী করেন যে, গ্রীক চিকিৎসা দেবতা ইস্কুলাপিউস্ ও ইমহোটেপ্ অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রাচীন মিশরীয়গণ মনে করতেন যে, কোন এক অদৃশ্য শত্রুর প্রভাবে রোগ মানবশরীরে প্রবেশ করে। ক্রমে ক্রমে শরীরের অস্থি, মজ্জা ও মাংস ক্ষয় করে সেই রোগ রোগীকে হত্যা করে। এডুইন স্মিথ্ ও এবের্স্ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত প্রাচীন মিশরীয় ভূর্জপত্র লিখনে অহিফেন্, হেমলক্, তাম্রঘটিত লবণ ও এরণ্ড তৈলের ব্যবহারবিধি লিখিত আছে। খৃষ্টপূর্ব ৫২৫ শতকে পারসিকগণ মিশর দেশ অধিকার করেন এবং দক্ষিণ মিশরের সাইস্ নামক স্থানে একটি বৃহৎ চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। হেরোডোটুস্ উক্ত বিদ্যালয়ের

ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পারসিকদের পরবর্তীকালে মাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন করেন। তাঁর পরবর্তীকালে গ্রীক পণ্ডিতগণ প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি পঠনে সক্ষম হন। এক গ্রীক পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত প্রস্তরলিপির সাহায্যে পরবর্তীকালে মিশরীয় লিপি পঠনের সুবিধা হয়। উক্ত প্রস্তরলিপি নীলনদের মোহনার নিকটবর্তী রোজেটা নামক স্থানে এক ফরাসী সৈন্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার না হলে আজ মহেঞ্জোদারো লিপির মত মিশরীয় লিপির অর্থও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। ইসলামধর্ম

চিত্র—২৮

প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবীগণ ক্রমাগত মিশর আক্রমণ করতে থাকেন এবং সমগ্র মিশর ও উত্তর আফ্রিকা তাঁদের কুক্ষিগত হয়। কালক্রমে প্রাচীন মিশরীয় হামিট্ সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রাচীন মিশরে আরবী সভ্যতার প্রবর্তন হয়। সেই সঙ্গে তৎকালীন আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রও মিশরে প্রবর্তিত হয়।

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় চিকিৎসকগণের আহৃত জ্ঞানের সমন্বয়ে গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ। ক্রীট বা ক্যাণ্ডিয়াদ্বীপবাসী সুসভ্য মিনোয়ানগণ এবং স্মিডিয়বাসীগণের নিকট তাঁরা এই বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী প্রাক্ আর্যগণের মত মিনোয়ানগণও ছিলেন নির্মাণকুশলী। তাঁরা পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ প্রণালী এবং স্নানাগার নির্মাণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় অতি পারদর্শী ছিলেন।

খৃষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে গ্রীকগণ মিনোয়ানদের সুরম্য ট্রয় নগরী ধ্বংস করেন। পরাজিত মিনোয়ানগণের সান্নিধ্যে এসে গ্রীকগণ শিক্ষা করেন বহু নতুন নতুন চিকিৎসাবিধি। ক্ষুদ্র এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়গণের সংস্পর্শে এসে তাঁরা চিকিৎসাজ্ঞান আহরণ করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, গ্রীক বীর এ্যাপোলো ছিলেন চিকিৎসাজ্ঞানী। তিনি এক বিচক্ষণ নরাশ্ব (সেনতাউর) চিরণকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পোকক্-এর মতে এই নরাশ্বরা মানুষ ছিলেন এবং অত্যন্ত অশ্বারোহণ প্রিয় ছিলেন বলে কল্পনা করা হত যে তাঁরা নর ও অশ্বের সম্মিলিত

এক অদ্ভুত জীব। তিনি আরও বলেছেন যে উক্ত নরাশ্বদের পূর্বপুরুষেরা বর্তমান আফগানীস্থানের কান্দাহার বা প্রাচীন গান্ধার দেশ থেকে জীবিকা-নির্বাহের উদ্দেশ্যে গ্রীকদেশে গিয়েছিলেন। "সেনতাউর", শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পোকক্ আরও বলেছেন যে ঐ শব্দটি মূলতঃ 'কান্তাউর' বা "কান্দাহার" শব্দটির অপভ্রংশ।

চিরণ নামক নরাশ্ব এ্যাপোলোর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ইয়াসাং, এ্যাকিলেস ও ইস্কুলাপিউস্‌কে শল্য চিকিৎসা শিক্ষা দেন। বার্লিন মিউজিয়ামে

চিত্র ২৯ ও ৩০

রক্ষিত একটি গ্রীক চিত্রে দেখা যায় যে আকিলিস তাঁর সহযোগী পাত্রোক্লুস-এর বাম হস্তের ক্ষতের চিকিৎসা করছেন। খৃষ্টজন্মের ৪৯০ বৎসর পূর্বে

চিত্র ৩১

ইউফ্রোনিয়স নামক চিত্রকর ঐ চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন। আকিলিস-এর সহযোগী ইস্কুলাপিউসও চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দেবতা প্লুটো ঈর্ষাবশতঃ আকিলিস্‌কে হত্যা করেন। গ্রীকগণ ইস্কুলাপিউসকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে "আস্কেলেপিয়া"

চিত্র—৩২

নামক বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। গ্রীকদেশের এপিডাউরুস্ নগরে এখনও একটি আস্কেলেপিয়ার ধ্বংসাবশেষ আছে।

আস্কেলেপিয়াগুলিতে পরিমিত আহার্য, অঙ্গ সঞ্চালন ও শরীর মর্দন প্রভৃতি সরল প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হত। উপস্থিত রোগীগণ স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে ইস্কুলাপিউসের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করত এবং চিকিৎসার জন্য নাট মন্দিরে শয্যা গ্রহণ করত। চিকিৎসকগণ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দ্বারা রোগীর শরীরের অবস্থা নির্ণয় করে চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করতেন। মন্দিরে বহু বিষহীন সর্প প্রতিপালিত হত এবং সেই সর্পদ্বারা

চিত্র—৩৩ ও ৩৪

চক্ষুরোগগ্রস্তের চক্ষু লেহন করানো হত। রোগীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনও উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সিসিলির পালের্মো, ইতালীর নেপ্‌লস্, সার্দিনিয়ার ক্যাল্‌গারী ও অষ্ট্রিয়ার ষ্টিরিয়া প্রভৃতি স্থানে। মন্দিরগুলি ছিল সাধারণতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পার্বত্যস্থানে। মন্দিরে কোন অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 16-4-87
Acc. No. 3944

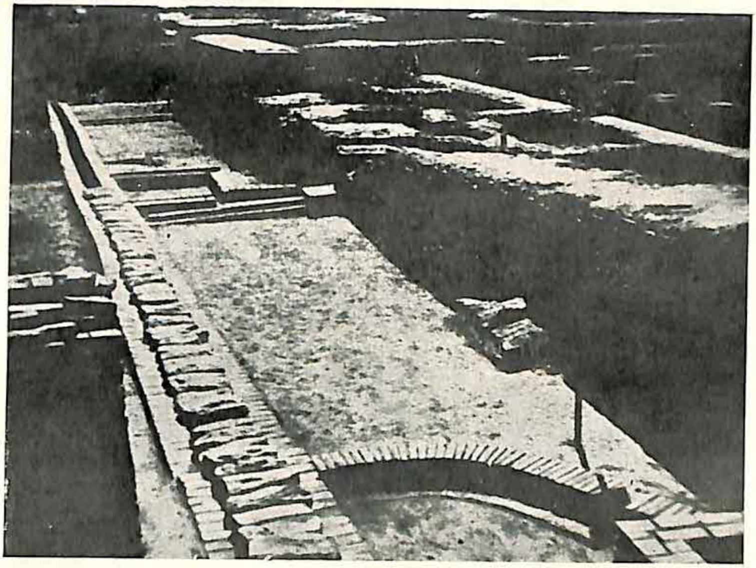

চিত্র ১১—মহেঞ্জোদারো-এর পয়ঃপ্রাণালী।

চিত্র ১২ মহেঞ্জোদারো-এর শৌচাগার।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library

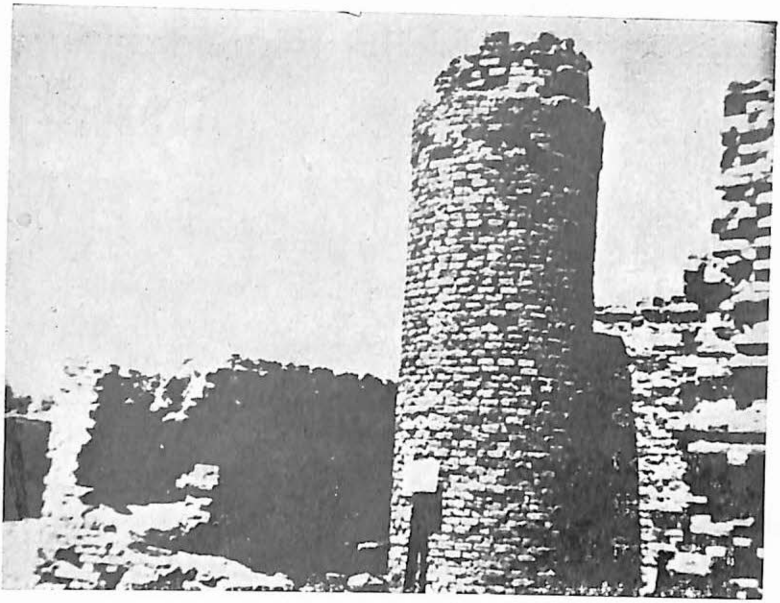

চিত্র ১৩—মহেঞ্জোদারো-এর উচ্চ জলাধার।

চিত্র ১৪—অশ্বিনী-কুমারদ্বয় (চিদাম্বরম্ ১৩শ শতক)।

চিত্র ১৫—আত্রেয় (লালগুড়ি, ১১শ শতক)

চিত্র ১৬—ধন্বন্তরি।

চিত্র ১৭—ভারতীয় নাসিকা পুর্নগঠন শৈলী

মরণাপন্ন রোগীকে স্থান দেওয়া হত না। বর্তমানকালে ভিসি, কার্লোভিভারী, বাদগাষ্টাইন ও লুর্দ প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসেও অনুরূপ বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়। তৎকালীন চিকিৎসকগণ স্বপ্ন ও মনঃসমীক্ষায় পারদর্শী ছিলেন এবং উক্ত সমীক্ষা দ্বারা মানসিক রোগীর চিকিৎসা করতেন। বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডও স্বপ্নসমীক্ষার দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করতেন।

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রে ইরোফিলোস্ বা হেরোফিলোস্-এর নাম অতি বিখ্যাত। খৃষ্টজন্মের ৩০০ বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে বিজ্ঞান, শৌর্য, ঐশ্বর্য এবং বাগ্মিতা সবই ব্যর্থ"। গ্রীক চিকিৎসকগণ রোগলক্ষণ নির্ণয় না করে কখনও রোগীর চিকিৎসা করতেন না। তাঁরা আনুমানিক সিদ্ধান্তের (থিয়োরী) উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। বর্তমানে প্রচলিত "ফিজিসিয়ান" (কায়চিকিৎসক) শব্দটি গ্রীক "ফুসিস্" অর্থাৎ নিসর্গতত্ত্ববিদ থেকে উদ্ভূত।

প্রাচীন গ্রীক চিকিসাশাস্ত্রে বহু নিদর্শন আছে যে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলবাসী এশিয়দের নিকট হতে গ্রীক চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ভারতে জাত কতকগুলি উদ্ভিদ যথা, কারদামম্ (এলাচ্) এবং সিসেম্ (তিল) গ্রীক চিকিৎসকগণ কর্তৃক সদাই ব্যবহৃত হত।

প্রাচীন য়ুরোপের সংলগ্ন এশিয় ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যালয় কাপ্পাদেচিয়ার স্নিডিয়া নামক স্থানে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্নিডিয়া শহরে ল্যাসিডেমেনিয়ানদের এক বসতি ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে স্নিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে

চিত্র—৩৫

মিতান্নীগণ প্রবর্তিত চিকিৎসা শৈলী শিক্ষা দেওয়া হত। সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপ্পোক্রাতেস মিতান্নী প্রবর্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা হিপ্পোক্রাতেস স্নিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

কোসদ্বীপের চিকিৎসা বিদ্যালয় স্নিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল পরে স্থাপিত হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতকে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

চিত্র—৩৬ ও ৩৭

কবি হোমার প্রণীত "ইলিয়াড" কাব্যের ট্রোয়ান যুদ্ধের বিবরণীতে আছে যে, ১৪৭ জন আহত সৈন্যের মধ্যে ১০৬ জন বর্শাবিদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। সে যুগের চিকিৎসকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত কারিগর শ্রেণী হতে উদ্ভুত। সাধারণতঃ পিতা বা পিতৃব্যের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে তারা বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াতেন এবং কিছুকাল বিনামূল্যে চিকিৎসা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতেন। খ্যাতিলাভ করবার পর চিকিৎসার বিনিময়ে তারা উচ্চ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। জনসাধারণ চিকিৎসকগণকে যথেষ্ট সম্মান করত কিন্তু বিদ্বান সমাজে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেকালে চিকিৎসক চুরির মত একটা উপভোগ্য ব্যাপার চলত। এক শহরের চিকিৎসক স্থনাম অর্জন করলে নিকটস্থ নগরীর বাসিন্দাগণ পারিতোষিক দ্বারা তাকে প্রলুব্ধ করে নিজ নগরীতে নিয়ে যেত। অনেক সময় রোগমুক্ত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিকিৎসকের নাম নগরের প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তর ফলকের উপর উৎকীর্ণ করে দিত।

আথেন্স শহরের বহু লজ্জাশীলা রোগাক্রান্তা গ্রীক নারী, পুরুষ চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা না করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন। আগ্নোডিস নামক এক স্ত্রীলোক তাঁদের দুঃখে বিগলিত হয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে চিকিৎসাশিক্ষা লাভ করেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ চিকিৎসকদের দৃষ্টির অগোচরে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা করতেন।

পিথাগোরাস্, এ্যালেক্‌মেয়ন ও এম্পিডোক্লেস্ দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত চিকিৎসাবিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পিথাগোরাস্ (৫৮০-৪৯৮ খৃঃ পূঃ) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসক। গ্রীসের সামোস্ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটনে বসবাস করতেন। পোকক্-এর মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল "বুদ্ধগুরু" বা মহাজ্ঞানী। কথিত আছে যে, তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারতও পরিভ্রমণ করেছিলেন। মনুষ্যেতর পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ক্রোটনের এ্যালেক্‌মেয়ন্ (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০) শিরা ও ধমনীর প্রভেদ বিচার করেছিলেন এবং চক্ষু, স্নায়ু ও কর্ণ প্রণালী বা "ইউষ্টাখিয়ান" নলও তাঁর আবিষ্কার। তিনি বলতেন যে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। এম্পিডোক্লেস একটি বদ্ধ

জলাশয়ের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে একবার মহামারী রোগ নিরোধ করেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। এম্পিডোক্লেস মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে সিসিলির এট্না আগ্নেয়গিরির গহ্বরে লম্ফন করে আত্মহত্যা করেন।

গ্রীক চিকিৎসাজগতের স্বুবর্ণযুগের প্রবর্তনকারী ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত ইপ্পোক্রাতেস ইরাক্লিদে বা ইপ্পোক্রাতেস ই কোস্ অর্থাৎ কোস দ্বীপের ইপ্পোক্রাতেস বা বহুজন পরিচিত হিপ্পোক্রাতেস। তাঁকে আজও প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক মনে করা হয়। তাঁর জন্ম হয় এক চিকিৎসক পরিবারে এবং তিনি চিকিৎসক পিতার নিকট প্রাথমিক চিকিৎসাশিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি স্নিডিয়া, থ্রেস, থেসালী, ম্যাসিডোনিয়া ও আথেন্স প্রভৃতি স্থানেও শিক্ষালাভ করেন। কোস দ্বীপে অবস্থিত আস্কেলেপিয়ার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত দ্বীপের এক প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।

চিত্র—৩৮ ও ৩৯

উক্ত বৃক্ষের অধস্তন বংশধর আজও বর্তমান। হিপ্পোক্রাতেস লিখিত পুস্তকের শতাধিক অনুলিপি এখনও পৃথিবীতে পাওয়া যায়। তিনি রোগের অলৌকিকতা অগ্রাহ্য করে চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুসংস্কারমুক্ত করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যময় এবং তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের ও খনিজ পদার্থ বহুল প্রস্রবণে স্নান করতে উপদেশ দিতেন। বর্তমানকালে নল সাহায্যে পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচ্য খাদ্য বের করে যেভাবে পরীক্ষা করা হয় তদনুরূপে হিপ্পোক্রাতেস রোগীকে বমন করিয়ে অর্ধপাচ্য খাদ্য পরীক্ষা করতেন।

হিপ্পোক্রাতেসের সমগ্র মতধারা সংকলিত হয় "করপুস্ হিপ্পোক্রাতিকুম্" নামে। সংকলনটি ৬০-৭০টি খণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন কালে লিখিত। মনে হয় ঐগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি হিপ্পোক্রাতেস কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত। হিপ্পোক্রাতেসের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাঁর কার্যকাল ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের অধিকাংশ সময়ে ব্যপ্ত ছিল। তিনিও প্রাচীনকালের চিকিৎসকগণের মত এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি থ্রেস, আব্দেরা, দেলোস্, প্রপনটিস্, লারিসা, মেলিবোইয়া এবং আথেন্স প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যপদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ৩৭৭ খৃঃ পূঃ লারিসা

শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বহু ছাত্র ছিল যার মধ্যে তাঁর দুই পুত্র থেসালুস ও ড্রেকন এবং জামাতা পলিবুসও চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন এবং তাঁরাও এক শহর থেকে অন্য শহরে চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করার জন্য পরিভ্রমণ করেন। গ্রীক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অ্যারিস্টটল্ তাঁদের সম্বন্ধে এবং এ্যাপোলোনিউস্, দেখিপ্পুস ও প্রাখাগোরাস নামক আরও তিনজন চিকিৎসকের সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন।

চিত্র—৪০ ও ৪১

হিপ্পোক্রাতেসের ছাত্রগণকে শিক্ষা সমাপনের পর নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করতে হত: "আমি এ্যাপোলো, ইস্কুলাপিউস, স্বাস্থ্য এবং ভগবানকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি যে, আমি প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

আমি গুরু ও পিতামাতাকে পালন করব ও তাঁদের ঋণ শোধ করব।

গুরুপুত্রগণকে নিজের ভ্রাতা জ্ঞানে স্নেহ করবো এবং যদি তাঁরা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহলে তাঁদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিব। আমার অভিজ্ঞতা নিজপুত্র, গুরুপুত্র ও শিষ্যগণ ব্যতীত আর কারও কাছে প্রকাশ করব না।

আমি রোগীকে যথাসাধ্য সাহায্য করব, কখনও তার ক্ষতি করব না।

আমি কাহাকেও বিষপান করতে দেব না বা পান করতে আদেশও করব না। আমি কোনও নারীর গর্ভপাত করাব না।

আমি পাথুরীর জন্য অস্ত্রোপচার করব না। যাঁরা উক্ত চিকিৎসায় পারদর্শী তাঁদের নিকট পাথুরীগ্রস্ত রোগীকে প্রেরণ করব।

আমি রোগীর-গৃহে গিয়ে তার মঙ্গলের চেষ্টা করব, কোনও অনিষ্ট চিন্তা করব না। রোগী গৃহের কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করব না।

কোন রোগীর গোপন বিষয় ও রোগের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করব না।

যদি আমি শপথ বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি, তাহলে ঈশ্বর আমার মঙ্গলসাধন করবেন, অন্যথায় আমার সর্বনাশ হউক।"

উক্ত শপথবাক্যগুলি আরবী, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় জগতেও পরম সমাদৃত ছিল এবং যে কোনও ধর্মাবলম্বী প্রাচীন চিকিৎসকগণ শপথানুগ আচরণ করতেন। কিন্তু ভারতে উক্ত শপথবাক্য কখনই পাঠ করান হয় না।

হিপ্পোক্রাতেসের উপদেশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে যে, "সিথিয়গণের ধারণা অনুযায়ী বিকলাঙ্গতা ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্তু আমি সেরূপ মনে করি না"।

হিপ্পোক্রাতেস কর্তৃক মৃতপ্রায় রোগীর মুখাবয়বের অপূর্ব বর্ণনা আজও পৃথিবীতে "হিপ্পোক্রাতিক্ ফেসিস্" নামে সুপ্রচলিত। তিনি বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "মৃতপ্রায় রোগীর নাসিকা অতি তীক্ষ্ণ, চক্ষু কোটরাগত, করোটির পার্শ্ববর্তী মাংসপেশী সঙ্কুচিত, কর্ণ অতি শীতল এবং কুঞ্চিত। ইহা ব্যতীত কপালের চর্ম শুষ্ক এবং সমগ্র মুখের বর্ণ হরিতাভ ও বিষণ্ণ"।

হিপ্পোক্রাতেসের দেহ বিজ্ঞান, নিদানতত্ত্ব এবং শারীরস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসকগণেরও উক্ত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। হিপ্পোক্রাতেস মনে করতেন যে, শরীরের সুস্থতা চারি প্রকার মৌলিক পদার্থ যথা, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও জলের মিশ্রণ সাম্যের উপর নির্ভর করে। হিপ্পোক্রাতেসের উক্ত ধারণা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের "পঞ্চভূত"-এর অনুরূপ। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাধারা "ত্রিদোষ"-এর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের শরীরের তিনটি প্রধান রস আছে যথা রক্ত, কফ এবং পিত্ত। তিনি বলতেন যে, রোগীকে সুস্থ করতে হলে উপরিউক্ত চারটি মৌলিক পদার্থ এবং ঐ "ত্রিরস"-এর সাম্য ঘটাতে হবে। এই সামান্য লিখনের মধ্যে হিপ্পোক্রাতেসের সম্পূর্ণ জ্ঞানের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

শল্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থে হিপ্পোক্রাতেস লিখেছেন যে, শল্য-চিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ঠ সংখ্যক সহকারী, শল্যযন্ত্রাদি ও উপযুক্ত আলোকের প্রয়োজন। তিনি বলতেন, রোগের চরম অবস্থায় রোগীকে অত্যধিক ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করা অনুচিত। বৃদ্ধগণ অনশন সহ্য করতে পারেন কিন্তু প্রাণোচ্ছল শিশুদের অনশনে রাখলে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। কতকগুলি রোগের প্রাদুর্ভাব ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন শীত ঋতুতে ফুসফুসের ঝিল্লিপ্রদাহ, সর্দি, গলপ্রদাহ, প্রভৃতি রোগের আধিক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই যক্ষ্মারোগ বেশী হয়। তিনি একটি জ্বরগ্রস্তা রোগিনীর রোগের দৈনিক ধারা বিবরণী রেখে গিয়েছেন। আজ হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে তা থেকে জানা যায় যে উক্ত রোগীণী ছিল আন্ত্রিক জ্বরাক্রান্তা (টাইফয়েড্)।

হিপ্পোক্রাতেসের জীবনকালেই তৎকালীন পুরোহিত চিকিৎসকগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর আরিষ্টটল-এর (৩৮৪-৩২২

খৃঃ পূঃ) মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। তিনি নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন

চিত্র—৪২

না, কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁর অসামান্য দখল ছিল এবং বহু পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান পাঠে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নরদেহের ক্রিয়া-কলাপ রক্ত, শ্লেষ্মা, পীতপিত্ত ও কৃষ্ণপিত্ত নামক চারিরসের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এবং উক্ত রসের কোনও একটি দূষিত হলে শরীরে রোগলক্ষণ দেখা দেয় বলে তিনি মনে করতেন।

আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্র

আলেকজান্দার জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৩ বৎসর। মৃত্যুর প্রায় একবৎসর আগে নীলনদের উর্বর বদ্বীপে তিনি ভবিষ্যত আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন সৈন্যাধ্যক্ষ টলেমি সোটের (৩২৩ - ২৮৫ খৃঃ পূঃ)। টলেমি ছিলেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং তিনি য়ুরোপের বহু গুণীজনকে আলেকজান্দ্রিয়ায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শারীরস্থান বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন হেরোফিলুস (ইরোফিলুস) ও এরাসিস্ত্রাতুস। হেরোফিলুস জনসমক্ষে মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। তাঁর মতে মস্তিষ্ক মানবদেহের গতি সঞ্চালন, স্পর্শচেতনা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। তিনি মস্তিষ্ককে বৃহৎ মস্তিষ্ক (সেরিব্রাম্) ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (সেরিবেলাম্) এই দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। তাঁর আবিষ্কৃত মস্তিষ্কের শিরাচক্র (টরকিউলার হেরোফিলি) আজও শারীরস্থান শাস্ত্রে সুপরিচিত। এরাসিস্ত্রাতুস ছিলেন মস্তিষ্কের গঠন ও কার্য-কারিতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু। তিনি মনে করতেন মানব মস্তিষ্কের গঠন মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন এবং মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠের আভ্যন্তরীণ "মস্তিষ্ক বারি" (সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড্) স্নায়ু-রজ্জুর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে পেশী সঙ্কুচিত করে। প্রায় দুই শতাব্দী পরে রোমানরা আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারের পর (৫০ খৃঃ পূঃ) উক্ত চিকিৎসাধারায় পরিসমাপ্তি ঘটে।

রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র

রোমানরা প্রধানতঃ গ্রীক ও মিশরীয়গণের কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ

করতেন না। রোম শহরের জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত থাকায় শহরের অধিকাংশ স্থানে ছিল সুনির্মিত পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল সরবরাহের (এ্যাকুয়াডাকট্) ব্যবস্থা এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ছিল রাজকোষে নিযুক্ত চিকিৎসক। খৃষ্টজন্মের ২৯৩ বৎসর আগে রোমে ব্যাপক মহামারী দেখা দেওয়ায় নিরুপায় রোমানরা এপিডাউরুশবাসী গ্রীক চিকিৎসকগণের শরণাপন্ন হয়। তারা গ্রীকদের কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতীক স্বরূপ একটি পবিত্র সর্প টাইবার নদীমধ্যস্থ সেন্ট বার্থোলামিউ দ্বীপে এনে রেখে দেয়। ঐ দ্বীপে ছিল একটি আরোগ্যশালা। আরোগ্যশালার সন্নিহিত গির্জার রাহেরে নামক এক সাধু লণ্ডনের প্রাচীনতম সেন্ট বার্থোলামিউ হাসপাতাল স্থাপনা করেছিলেন। রোমক সৈন্যদলের চিকিৎসকগণ দেশের বহুস্থানে আরোগ্যশালা স্থাপন করে। জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের নিকটে একটি রোমক জঙ্গী হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। নেপ্‌ল্‌স্-এর নিকটবর্তী পম্পেই শহরেও অনুরূপ হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ আছে। ডিওস্কোরিডেস নামক এক গ্রীক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রোমক ভেষজ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করেন। রোমক চিকিৎসা জগতের যুগান্ত আনয়নকারী গ্যালেন ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভব। ক্ষুদ্র এশিয়ার পেরগামুম্ শহরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের

চিত্র—৪৩

জন্য তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় যান এবং ২৮ বৎসর বয়সে এক পেশাদার মল্ল-যোদ্ধাদলের চিকিৎসক হিসাবে জীবনারম্ভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি রোম শহরে বসবাস আরম্ভ করলে সমব্যবসায়ীদের চক্রান্তে তাঁকে স্বল্পকালের জন্য রোম পরিত্যাগ করতে হয়। রোম সম্রাট মার্কুস্ আউরেলিয়ুস তাঁকে সসম্মানে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। গ্যালেন শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কার্যকালে রোম সাম্রাজ্যে মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় বার্বারী-বানর প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে শরীরের অভ্যন্তরে চাপের তারতম্য সৃষ্টি হয় এবং তার ফলেই রক্ত সঞ্চালিত হয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রাকারের মধ্য দিয়ে প্রকোষ্ঠ পরিবর্তন করে এবং শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করায় সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করে। তাঁর রচিত ৫০০টি গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ৮০ খানির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। গ্যালেনও বিশ্বাস করতেন যে,

শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চারিটি মুখ্য রস দ্বারা পরিচালিত। প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করলেও তিনি কোনও শিষ্য গ্রহণ করেন নি। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক হতে রোম সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ৫৪২ খৃঃ অব্দে মহামারী রোগে রোমক সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় জনবলহীন রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। এখনও ইংল্যাণ্ডের নর্থাম্বিয়া, কোলোনের নিকটবর্তী নোভেসিউম্ ও ভিয়েনার নিকটবর্তী কারন্‌ণ্টম্ নামক স্থানে প্রাচীন রোমক চিকিৎসালয় বা "ভ্যালেটুডিনারিয়া"র ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসাশাস্ত্র

বাইবেলের পুরাতন অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে রোগযন্ত্রণা ঈশ্বরের অভিশাপ মাত্র। প্রাচীন ইহুদি দেশে রোগীর চিকিৎসার জন্য জনসাধারণ পুরোহিতদের শরণাপন্ন হতেন। পুরোহিত চিকিৎসকগণ বলতেন যে মুসার নির্দেশ মেনে চললে মানুষ কখনই রোগগ্রস্ত হবে না। ইহুদি পুরোহিতগণ মহামারীর চিকিৎসায় সুদক্ষ ছিলেন এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় সচেতন ছিলেন। ইহুদি পুরোহিত চিকিৎসকগণের আদেশক্রমে পুরুষ শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই তার শিশ্নের চর্মছেদন করা হত। কালক্রমে উক্ত প্রথা মুসলমানগণের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের নিদানতাত্ত্বিকগণের মতে শিশ্নের চর্মচ্ছেদন করলে শিশ্নের মুণ্ডে কর্কটরোগ হয় না। সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইহুদি ও মুসলমানগণের মধ্যে শিশ্নের কর্কটরোগ অতি বিরল। লেভিটিকাস্-এর পুস্তকে দূষিত খাদ্য, অপবিত্র দ্রব্যাদি, প্রসব ব্যবস্থা, ঋতুস্রাব ও সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। শূকরের মাংস হতে অন্ত্রে ও দেহে ভয়াবহ কৃমি রোগ হয়, এজন্য উক্ত পুস্তকে ইহুদিদের পক্ষে শূকরের মাংস গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুসলমান ধর্মেও উক্ত নিয়ম আজও অনুসরণ করা হয়। ইহুদি চিকিৎসকগণ কুষ্ঠ ও অপরাপর ছোঁয়াচে রোগীকে সুস্থ জনসাধারণের নিকট হতে দূরে বাস করতে বাধ্য করতেন। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ "তালমুদ"-এ বহু চিকিৎসা ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। মধ্য যুগের খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ইহুদিগণকে হেয়জ্ঞান করলেও রোগগ্রস্ত হ'লে গোপনে তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। বহু খৃষ্টীয় ধর্ম সংস্থার অভ্যন্তরে এক বা একাধিক ইহুদি চিকিৎসক গোপনে বাস করে ধর্মযাজকদের চিকিৎসা করতেন।

মধ্য যুগের ইহুদি চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন মোসেস্

চিত্র—৪৪

বেন্ মাইমন্ বা মেমোনাইদ। তিনি ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের কর্দোভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎদেশে প্রচলিত আরবী ভাষায় তাঁর নাম ছিল আবু ইম্‌রান্ মুসা ইমন্ মাইমুন ইবন্ উবাইদ আল্লাহ্। তিনি একাধারে ছিলেন দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসক। প্রায় ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ইহুদি পরিচয় গোপন করে মুসলমান শাসিত স্পেনে বাস করেছিলেন। ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে পিতামাতাসহ তিনি মরক্কোদেশের ফেজ শহরে বসবাস আরম্ভ করেন এবং তত্রস্থ ইহুদি পুরোহিতদের কাছ থেকে গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বল্পকালের জন্য তিনি ফিলিস্তিন্‌বাসী হয়েছিলেন এবং তৎপরবর্তীকালে মিশরে যান ও মিশরে তুর্কী সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসকপদে নিযুক্ত হন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারা থেকে ইহুদি দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর পুস্তকাদি পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

প্রাচীন আরবী চিকিসাশাস্ত্র

হিপ্পোক্রাতেসের মৃত্যুর ১০০০ বৎসর পর ও গ্যালেনের মৃত্যুর ৪০০ বৎসর পর বর্তমান সুসভ্য আরব জাতির অভ্যুত্থান হয়। অনুর্বর উষর মরুভূমির যাযাবর বেদুইনদের ক্লেশসাধ্য জীবনে হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করে নতুন আশার সঞ্চার করেন। পৌত্তলিক আরবীগণ একেশ্বরবাদী হয় এবং ধীরে ধীরে আরবী উপদ্বীপের উর্বরা উত্তরাংশের দিকে প্রব্রজন করতে আরম্ভ করেন এবং গৃহনির্মাণ করে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষা তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যে বহুল প্রচলিত গ্রীক ভাষাকে স্থানচ্যুত করে। ক্রমে ক্রমে গ্রীকভাষায় লিখিত বহু চিকিৎসাপুস্তক আরবী ভাষান্তরিত হয় এবং সাধারণ মানুষের পাঠ্য হয়। ঐতিহাসিকদের মতে বর্তমান আরবী সভ্যতার সূচনা হয়েছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মূর শাসিত স্পেনের গ্রানাডা নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার উৎকর্ষ নিম্নাভিমুখী হয়। মৌলিক আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রের স্বর্ণযুগ তিন শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল।

হুনাইন ইবন্ ইসাক্ আরবী ভাষায় গ্রীক চিকিৎসাপুস্তক প্রথমে অনুবাদ

করে সেই যুগের সূচনা করেন এবং ক্রেমোনাবাসী জেরার্ডো কর্তক আরবী পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের অবসান হয়েছিল (১৮৭০ খৃঃ—১১৭০ খৃঃ)।

ইতিহাস গত বিচারে আরবী চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে এক সংযোজক বিশেষ।

আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী

হুনাইন ইবন্ ইসাক্ (৭৯২-৮৭৩ খৃঃ) সর্বসাকুল্যে ১২৮টি গ্রীক চিকিৎসা-পুস্তক আরবী ভাষান্তরিত করেছিলেন। পরবর্তী লেখকের নাম করতে গেলে

চিত্র—৪৫

আর্‌রাজী বা রাহজেস্ এর নাম উল্লেখযোগ্য (৮৪১ খৃঃ—৯৩০ খৃঃ)। তিনি পারস্য দেশের তেহরাণ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩০ খণ্ডে বিভক্ত "আল্‌হাভী" নামক চিকিৎসা মহাকোষ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতকে সেটি লাতিন ভাষায় "কন্‌টিয়েনট্‌স্" নামে অনুদিত হয় এবং য়ুরোপীয় চিকিৎসক সমাজে পরম সমাদৃত হয়। তাঁর অপর বিখ্যাত পুস্তকের নাম "আল্ জুদারী বাল্ হাস্‌বা"। পুস্তকটিতে বসন্তরোগ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। ঐ পুস্তকটি ৭ বার লাতিন ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ফরাসী (১৭৬২ খৃঃ), ইংরাজী (১৮৪১ খৃঃ), গ্রীক ও পারসিক ভাষান্তরিত হয়। এছাড়া তিনি শিশুরোগ সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে ঐটি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিশুরোগ চিকিৎসাপুস্তক।

ইবন্ আল্ জাজ্জার (৯০০-৯৬১ খৃঃ) জনসাধারণের বোধগম্য "জাদ্ আল্ মুসফির" ও "তিব্ আল্ ফাক্‌রা বাল্ মাসাকিন্" নামে দুটি পুস্তক লিখেছিলেন। পুস্তক দুটি লাতিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

আলী ইবন্ আব্বাস্ (-৯৯৪ খৃঃ) বা হালী আব্বাস সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক লেখেন। পুস্তকটির নাম ছিল "কানিল্ আল্‌সিন্‌আ আল্ তিব্বিয়া" অথবা "আল্ মালাকি"। পুস্তকটি "লিবের রেগিউস" নামে লাতিন ভাষায় দুইবার প্রকাশিত হয়েছিল।

খৃষ্টজন্মের এক সহস্র বৎসর পরে আরব কুলোদ্ভব মূর চিকিৎসক আবুল কাশিম খালাফ্ ইবন্ আব্বাস আজজারাভী (-১০১৪ খৃঃ) স্পেন দেশের

চিত্র—৪৬

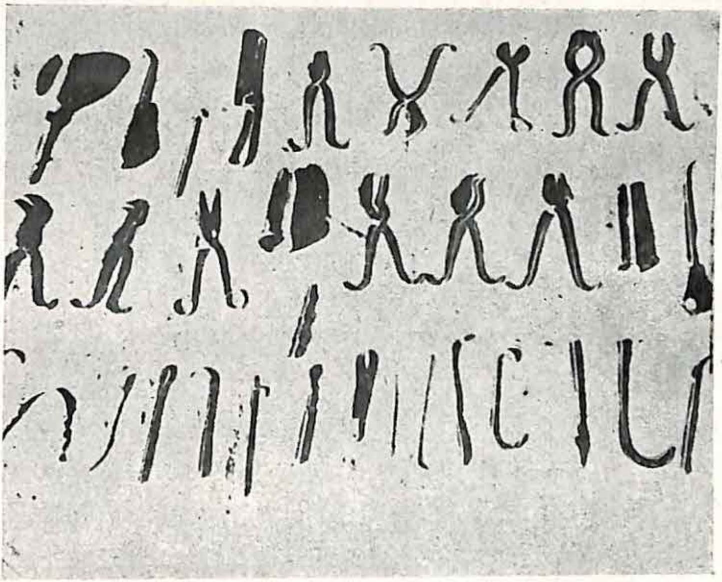

চিত্র ১৮—সুশ্রুত কর্তৃক ব্যবহৃত কতিপয় শল্য যন্ত্র।

চিত্র ১৯—বুদ্ধদেবের চিকিৎসা রত জীবক।

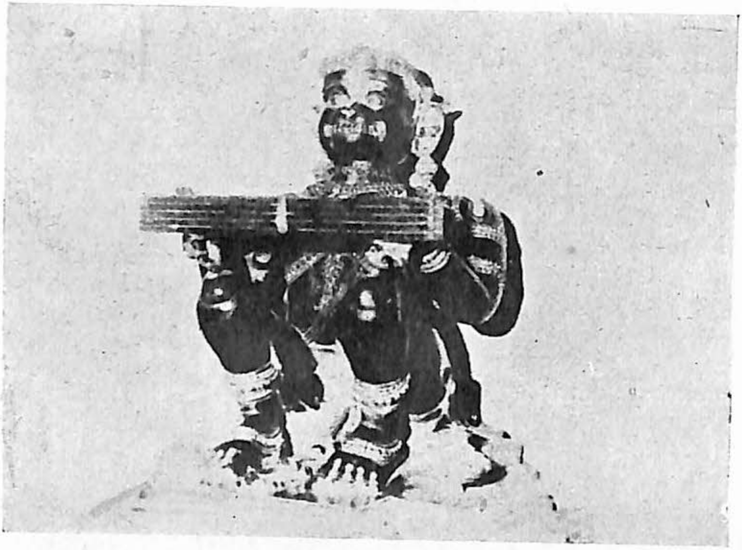

চিত্র ২০—প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণেতা মাধবাচার্য (হাম্পি)।

চিত্র ২১—প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক-প্রবর চরক।

চিত্র ২২—ভারতে সন্তান প্রসবের প্রাচীন শিলাচিত্র (হাঙ্গল, ১২ শতক)।

চিত্র ২৩—জাপানের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সেইস্থূ হানাওকা (১৭৬০-১৮৩৫)।

চিত্র ২৪—পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা
(হাম্মুরাবী, সুমেরীয়)।

চিত্র ২৫—ফুসফুসে শরবিদ্ধ সিংহের রক্তবমন (সুমেরীয়)।

কর্দোভা শহরে বাস করতেন। য়ুরোপে তিনি "আলবুকাসিস্" নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর রচিত "আলতস্রিফ্ লিমান্ আজিজা আন্ আল্ তালিফ্" নামক বিখ্যাত পুস্তকের মধ্যে তিনি জন্মগত রক্তক্ষরণ রোগ (হিমোফিলিয়া)-এর সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছিলেন। পুস্তকটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং পুস্তকটির মধ্যে দ্বিশতাধিক শল্য যন্ত্রের চিত্র ছিল এবং যন্ত্রগুলির যথাযোগ্য প্রয়োগ বিধিও চিত্রিত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পড়ে যাওয়া দাঁত পুর্নসংস্থাপিত করা সম্ভব। তিনি দন্তের পংক্তি বৈকল্য ও মেরুদণ্ডের ক্ষয়রোগজনিত পক্ষাঘাত সম্বন্ধেও লিখে গিয়েছেন। তিনি শল্যচিকিৎসায় সীবনের জন্য কার্পাসের সূতা এবং জান্তবতন্তুও ব্যবহার করতেন। প্রসঙ্গতঃ ইংরাজী "কটন্" শব্দটি আরবী "কুতুন" থেকে উদ্ভূত। তিনি মূত্রনালীর পাথ্রীর উপর অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগনালীর মধ্য দিয়ে মূত্রাশয়ের পাথ্রী অপসারণের এক উপায় উদ্ভাবন করেন।

তিনি মৃদু ও প্রাণনাশকারী অর্বুদের প্রভেদ জানতেন। স্তনের কর্কট রোগের চিকিৎসায় তিনি দাহক যন্ত্রের (কটারী) সাহায্যে রোগগ্রস্ত স্তনচ্ছেদন অনুমোদন করতেন। জরায়ুর বাহিরে গর্ভাধান এবং জরায়ুকুসুম উৎপাটন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় শ্বাসনালী

চিত্র—৪৭

ছিদ্রনের (ট্রাকিয়ষ্টমী) প্রথার তিনিই প্রবর্তক। নিম্নাঙ্গের শিরাস্ফীতি (ভেরিকোজ ভেন্) রোগের বিষয় তাঁর জ্ঞান ছিল। স্কন্ধের সন্ধিচ্যুতি নিরসনের জন্য তিনি যে পদ্ধতি প্রচলিত করেছিলেন সেটা ঠিক বর্তমানে সুপরিচিত সুইজারল্যাণ্ডবাসী ডঃ থেয়োডোর কোখের উদ্ভাবিত প্রথার অনুরূপ।

আল্বুকাসিস্এর "তসরীফ্" পুস্তকটি লাতিন, ফরাসী, স্পেনীয়, হিব্রু এবং আরও বহুভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর মূল পুস্তকের ৪২টি আরবী পাণ্ডুলিপি অকস্ফোর্ডের বেদেলিয়ান লাইব্রেরী, ভিয়েনার নাৎশিওনাল বিব্লিওথেক্, মিউনিখের জার্মান জাতীয় লাইব্রেরী, ইয়েল্ মেডিকেল লাইব্রেরী, পাটনাস্থিত খুদাবকস্ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী এবং নিউইয়র্ক এ্যাকাডেমী অব্ মেডিসিন ইত্যাদি স্থানে বিক্ষিপ্তভাগে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান য়ুরোপের শল্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করতে বাধ্য যে তাঁরা এখনও আল্বুকাসিস্ প্রবর্তিত বহু বিধি অনুসরণ করে চলেছেন।

আল্‌বুকাসিসের সমকালে পারস্যদেশে এক বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নাম আবু আলি হুসাইন ইবন্ আবদাল্লা ইবন্‌সিনা, সংক্ষেপে

চিত্র—৪৮

"ইব্‌নেসিনা" (৯৮০ – ১০৩৬ খৃঃ)। তিনি সারাবিশ্বে বর্তমানে "অভিসেন্না" নামে সমধিক পরিচিত। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বোখারার সন্নিকটস্থ আফ্‌সানা নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি জাতিস্মর ছিলেন এবং অতি শৈশবে সমগ্র কোরাণ আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি পানীয় জল শোধনের উপর জোর দিতেন। তিনি রোগের উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং রোগীর খাদ্য ও অনুপান সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মূত্রনালী এবং ভগের অভ্যন্তরে ভেষজ প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত করেন। তিনি যক্ষারোগ ও "অগ্নিব্রণ" বা "পৃষ্ঠব্রণ" (এ্যান্‌থ্রাকস্) সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ মতবাদ প্রকাশ করেছেন। মস্তিষ্কের অর্বুদরোগ, মস্তিষ্কের ঝিল্লীপ্রদাহ (মেনিনজাইটিস্) এবং প্রলাপ-বিকারী (ডিলিরিয়াম) রোগসমূহের উপর সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম মহাধমনীর কপাটিকার কর্মহীনতা জনিত হৃদ্‌রোগ নিরূপণ করেন। মস্তিষ্কের রোগগ্রস্তের মাথায় বরফের প্রয়োগ তাঁরই উদ্ভাবিত। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন যে, মনোবৈকল্য রোগীকে জ্বরগ্রস্ত করতে পারলে মানসিক রোগের উপশম হয়। তাঁর পন্থা অনুসরণ করে ভিয়েনাবাসী স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ ডঃ য়ুলিউস্ হ্বাগ্‌নার ফন্ ইয়াউরেগ্ ম্যালেরিয়া জ্বরের দ্বারা উপদংশঘটিত মানসিক রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। মধ্যযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক প্যারাসেলসুসের মত অভিসেন্নাও এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করে করে চিকিৎসা করতেন। তিনি জন্মস্থান আফ্‌সানা থেকে তারিয়ান, দাঘীস্থান, জেবাল্, রায়ি, কোয়াৎজুইন্, হামাদান ও ইস্পাহান হয়ে সর্বশেষে আবার হামাদান শহরে আসেন এবং মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তক দুটির নাম "কিতাব আল্ কানুন্" ও "আল্‌উর্‌জুজা"। প্রথমটির লাতিন অনুবাদের নাম "ক্যাননস্ অব অভিসেন্না" এবং দ্বিতীয়টি লাতিন ভাষায় "কান্‌টিকা" নামে সুপরিচিত। ঐ পুস্তকদুটি সমকালীন বিখ্যাত য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল। ফরাসী দেশের মঁপেলিয়ে এবং বেলজিয়াম দেশের লুভেঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত

পুস্তক দুটি বিশেষ সমাদৃত ছিল। অভিসেন্নার জীবনকালে পারস্য ও ভারতের মধ্যে বহু পাণ্ডিত্যের আদান-প্রদান হয়েছিল। সুতরাং স্বতঃই বোঝা যায় যে তিনিও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

ইবন্ বুতলান্ (?—১০৫৫) এবং ইবন্ জাজ্‌লা (?—১০৯৯) উভয়েই সারণী বা ট্যাবুলার ধরনের নূতন দুটি চিকিৎসাপুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। পুস্তক দুটির নাম যথাক্রমে "তাকিন্ আল্ সিহা" ও "তাকিন্ আল্ আব্‌দান্"। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে উভয় পুস্তকই লাতিন ও জার্মান ভাষায় ষ্ট্রাস্‌বুর্গ শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান

শারীরস্থান বিদ্যা (এ্যানাটমি) - আরবদেশে সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন ইউহান্না ইবন্ মাসাওয়াই। তিনি আফ্রিকার নুবিয়া দেশ থেকে

চিত্র—৪৯

আনীত বেবুন জাতীয় প্রাণীর শব ব্যবচ্ছেদ করে মানুষের শারীরস্থান বিদ্যার উপর অনেক আলোকপাত করেন।

স্পর্শলোপ (এ্যানেস্থেসিয়া)— অভিসেন্না স্পর্শলোপকারী ভেষজাদির আহার প্রবর্তন করেন। আরবীগণই সর্বপ্রথম নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে স্পর্শ-লোপকারী ঔষধি আঘ্রাণের প্রথারও প্রবর্তক। তাঁরা জলশোষক সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা স্পঞ্জ স্পর্শলোপকারী ঔষধে সিক্ত করে রোগীর নাসারন্ধ্রের কাছে ধরতেন এবং রোগীর বেদনার অনুভূতি অবলুপ্ত হত।

ইবন্ নাফিস নামক এক আরবী চিকিৎসক ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত পরিশোধনের বিষয় প্রথম অবগত হন এবং বলেন যে গ্যালেন প্রবর্তিত রক্ত সঞ্চালনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, গ্যালেন বলেছিলেন শরীরের এক পার্শ্বের রক্ত হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ প্রাকারের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অপর পার্শ্বে প্রবাহিত হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ভেসালিউস্ কর্তৃক প্রকাশিত "দে করপোরী হুমানিস্" নামক গ্রন্থে লিখিত রক্ত সঞ্চালনবিধি ইবন্ নাফিসের মতের হুবহু অনুকরণ মাত্র। শারীরস্থান বিষয়ক অপর আরবী অবদানসমূহের মধ্যে আররাজী কর্তৃক স্বরযন্ত্রের স্নায়ু আবিষ্কার, আলি আব্বাস বা হালী কর্তৃক কৈশিকা শিরা ও ধমনী আবিষ্কার এবং অভিসেন্না কর্তৃক অক্ষিগোলকের সঞ্চালক পেশীর সন্নিবেশন নিরূপণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবু মার্ভান্ মালিক্ আবিল্ আলা ইবন্ ঝুর নামক মূর চিকিৎসক অতি বিখ্যাত। তিনি ইবন্ ঝুর বা "অ্যাভেন্‌জোয়ার" নামে সমধিক পরিচিত।

চিত্র—৫০

তাঁর জন্ম হয়েছিল স্পেনের সেভিলা শহরে। তিনি সর্বপ্রথম অন্ননালী ও মলান্ত্রের মধ্যে নল প্রবেশ করিয়ে রোগীকে পথ্য দেবার বিধি প্রবর্তন করেন। তিনি বিশদভাবে হৃদঝিল্লীপ্রদাহ, বক্ষমধ্যস্থানপ্রদাহ এবং গলবিল-এর পক্ষাঘাত সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ও মানসিক রোগচিকিৎসার ভেষজাদির এক তালিকা প্রস্তুত করেন। কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে দ্রাক্ষাসারযুক্ত সুমিষ্ট "জুলেপ" বা জোলাপের প্রয়োগ করতেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তকের নাম "আত্তেইসির্"। পুস্তকটি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ভিলা নোভার বিখ্যাত চিকিৎসক আরন্‌ল্ড, লাঙ্গে ও সাইডেনহাম্‌ও পুস্তকটি অনুসরণ করতেন।

চিত্র—৫১

কায়চিকিৎসা

ইউহান্না ইবন্ মাসাওয়াই কুষ্ঠ রোগ ও যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ প্রবণতা প্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন।

চিত্র—৫২

আরবী চিকিৎসক প্রবর আরবাজী বা "রাহাজেস্" মস্তিষ্কোদক (হাইড্রোকেফালস্), জন্মগত রোগ সংক্রমণ, জটিল যকৃৎ ও বৃক্করোগ, মধ্যকর্ণপ্রদাহজনিত মস্তিষ্কের স্ফোটক, বিকাররোগ বিশ্লেষণ, মেরুমজ্জার অর্বুদ-

চিত্র—৫৩

জনিত মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত এবং মুষ্কত্বকের পচন প্রভৃতি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলেন।

চিত্র—৫৪

ভেষজবিজ্ঞান ও ফার্মাকোলজি শাস্ত্রে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সুরাসার বা "আল্ কোহল্" পরিস্রবণ। তারাই অভিষব বা কিন্ব সহযোগে শর্করা পদার্থ ও দ্রাক্ষারসের মাতন করে সুরাসার প্রস্তুত করেন। ভেষজবিজ্ঞানে অতি প্রচলিত শব্দ "জুলেপ" সুমিষ্ট পানীয়, আরবী "জুলাব" বা পারসিক "গুলাব" শব্দ থেকে উদ্ভুত। তদনুরূপ ইংরাজী "সিরাপ" কথাটিও আরবী "সরাব্" থেকে রূপান্তরিত।

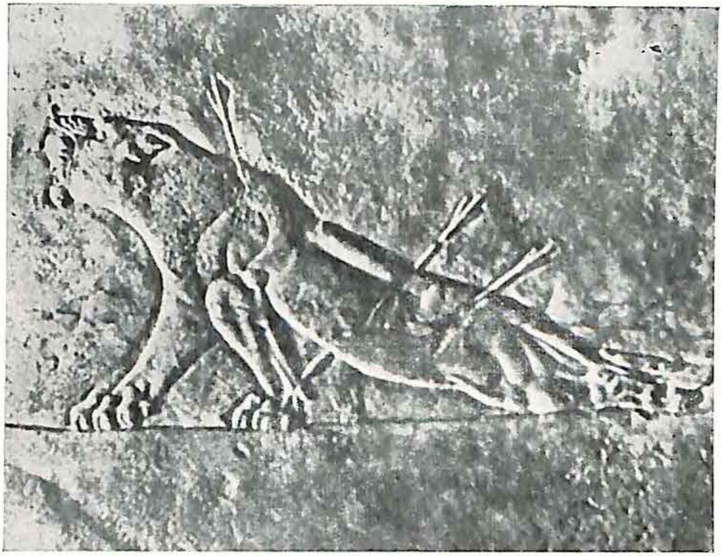

চিত্র ২৬—মেরুমজ্জায় শরবিদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্তা সিংহী (সুমেরীয়)।

চিত্র ২৭—প্রাচীন মিশরের স্থপতি ও চিকিৎসক ইমহোটেপ্।

চিত্র ২৮ -
প্রাচীনতম
পোলিওগ্রস্থ
রোগী
(প্রাচীন
মিশরীয়
শিলাচিত্র)।

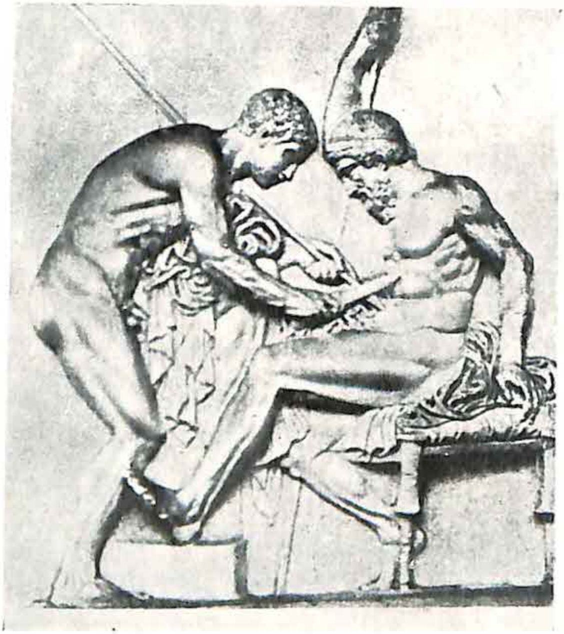

চিত্র ২৯—যুদ্ধে
আহতকে চিকিৎসা
রত আখিলিস্।

চিত্র ৩০—আখিলিশ দ্বারা প্রাত্রক্লোস-এর ক্ষত বন্ধন।

চিত্র ৩১—খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০শ শতকের একটি গ্রীক আরোগ্যশালার বহির্বিভাগ।

চিত্র ৩২—ইস্কুলাপিউস।

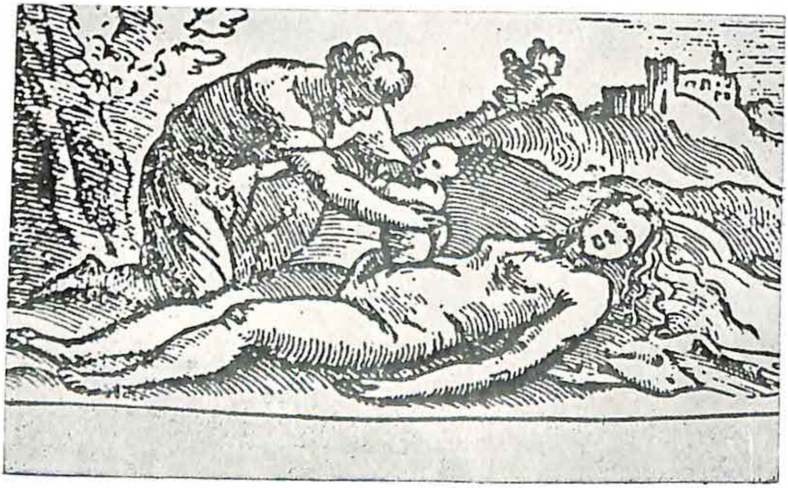

চিত্র ৩৩—মাতৃ-উদর ভেদন দ্বারা ইস্কুলাপিউস এর জন্ম।

এক কথায় বলতে গেলে প্রাচীন আরবী চিকিৎসাবিজ্ঞানশাস্ত্র যতই পাঠ করা যায় ততই বিস্মিত হতে হয়। বর্তমান বিলাসপ্রিয় ও বহুবিবাহ প্রিয় এবং অতি সমৃদ্ধ আরবীদের জীবনধারণের সঙ্গে প্রাচীন সুসভ্য আরবীগণের কোন সাদৃশ্য নেই। অতি পরিতাপের বিষয় যে অবক্ষয়মান ভারতীয়গণের মত আরবীগণকেও আজ প্রতীচ্য প্রবর্তিত চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসাপ্রথা অনুসরণকারীদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, প্রতীচ্যের ঐ চিকিৎসাশাস্ত্রের বুনিয়াদ প্রাচ্যের লব্ধজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয় প্রভাব

হজরত মহম্মদ কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্ব হতে ভারতের সঙ্গে আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আরবদেশের মধ্য দিয়ে য়ুরোপ পরিক্রমা করতেন। উত্তর পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের পর ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম প্রচারকগণ পারস্য ও আরব দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরাণের মধ্যে কয়েকটি বিকৃত সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হয় যথা: "কাফুর" (কর্পূর-সংস্কৃত) এবং "জান্‌যাবিল্" (শৃঙ্গভের অর্থাৎ আদ্রক-সংস্কৃত)। জান্‌যাবিল্ থেকেই লাতিন্ 'জিন্‌জিবেরিস্' ও ইংরাজী 'জিন্‌জারের' উৎপত্তি। আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিকট হতে লব্ধজ্ঞান অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু আরবী ব্যবসায়ী স্থল ও জলপথে ভারতে আসতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম ভারতে উপকূলবর্তী সহরসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। সর্বাধিক আরবী বসতি ছিল সিন্ধু, গুজরাট ও কেরালার উপকূলে। বহু ভারতীয়গণকে হজরত মহম্মদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও দেখা গিয়েছিল। তারা কালক্রমে সাত্-এল্-আরব নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ও অববাহিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আরবের উমাইয়াদ্ রাজ্য বিস্তৃত হয়। সিন্ধুদেশে বসবাসীকারী বহু আরবী ভারতের তৎকালীন উন্নত সমাজব্যবস্থা ও কৃষ্টির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। আব্বাসিদ রাজত্বকালে আরবীগণ ভারতীয় সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তকাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। সেই সমস্ত অনুবাদ পাঠ করে হিজিরা তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের আরবী পণ্ডিতগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্‌রা নগরবাসী সমসায়িক

পণ্ডিত আমর বিন্ বাহ্‌র আল জাহিজ্ লিখেছিলেন যে, ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যন্ত উন্নতমানের এবং ভারতীয় চিকিৎসকেরা বিষক্রিয়া এবং নানাপ্রকার ব্যথা ও বেদনার সুচিকিৎসা জানতেন। তাঁরা ভেষজজাত ধুম্রের সাহায্যে জীবাণু ধ্বংস করতেন (ফিউমিগেসান্)। নবম শতকের আরবী ঐতিহাসিক আল্ ইয়াকুবী বলেছেন, ভারতীয় চিকিৎসকদের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রক্রিয়া সমকালীন আরবী চিকিৎসকদের সার্বিক উন্নতি করেছিল।

সংস্কৃত থেকে আরবী ভাষায় অনূদিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পুস্তকগুলির বিষয় না লিখলে এই বিবরণী অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবীতে অনূদিত চরক সংহিতা "শারাক্", শুশ্রুত সংহিতা "সস্রদ্" অথবা "শুশ্রুদ" নামে পরিচিত ছিল। কনিষ্ঠ ভাগভট কর্তৃক প্রণীত অষ্টাঙ্গ হৃদয়গ্রন্থ আরবীতে অনূদিত হয়ে "অস্তঙ্কার", "অস্তাগার" এবং "অসঙ্কর" নামে প্রচলিত হয়েছিল। মাধবাচার্যের নিদান্ আরবী ভাষায় "নিদান" "বদন" এবং "ইয়েদান" প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল। সিদ্ধযোগ গ্রন্থটিও ইবন্ ধন্ আরবীভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তার আরবী নামকরণ হয়েছিল "সিন্ধাস্তাক্" বা "সিদ্ধসান্"। স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় অজ্ঞাতনামা একটি সংস্কৃত পুস্তক আরবী ভাষায় "রুশা" নামে পরিচিত ছিল।

নবম শতাব্দীর অপর বিশিষ্ট আরবী জ্ঞানবেত্তা আবু মাস্‌হর্ আল্ বালখী বলেছেন যে, ভারতীয়রা অতি উন্নত জাতি এবং তাঁদের বিচারবুদ্ধি ও শাসন ক্ষমতাও অতিশয় উন্নত।

দ্বিতীয় আব্বাসিদ্ খলিফা আল্ মন্‌সুরের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ থেকে তাঁর রাজসভায় রাজদূত পাঠানো হয়েছিল। সেই রাজদূতের সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিতও গিয়েছিলেন এবং খলিফাকে দুইখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্যোতির্বিদার পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। খলিফা হারুণ আল্ রসিদের সভায় কয়েকজন "বার্মাক" নামধারী সভাসদ্ ছিলেন। তাঁরা হলেন বহ্লীক দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী বংশধর। আরবী-ভাষায় তাদের বলা হত "বার্মাক"। বার্মাক কথাটা সংস্কৃত "প্রমুখ" অর্থাৎ প্রধান থেকে উদ্ভুত, কেননা আরবীভাষা "প" শব্দবিহীন। খালিদ্ নামক বার্মাকের পিতা চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বার্মাক বংশোদ্ভুত বহু পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করে গিয়েছেন। খলিফা হারুণ আল্ রসিদ্ একবার দুরুহ রোগাক্রান্ত হলে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক সে রোগ নিরূপণ

করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর "মান্‌কা" বা মাণিক্য নামক এক ভারতীয় সভাসদ চিকিৎসক খলিফাকে রোগমুক্ত করেন।

মান্‌কা চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও পহ্লভী ভাষার উপর তাঁর প্রচুর দখল ছিল। ভারত পরিব্রাজক অল্‌বেরুণীও সংস্কৃত এবং পহ্লভী ভাষার মাধ্যমে আরব দেশে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবন্ ধন্ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ দেখা যায়, যিনি সম্ভবতঃ ধনপতি বংশোদ্ভব ছিলেন (অথবা নামটা ধন্য, ধনিন বা ধন্বন্তরি থেকে উদ্ভূত) এবং বাগ্‌দাদে চিকিৎসা ব্যবসা করতেন। শালীহ্ বিন্ ভেল্ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিৎসকও বাগ্‌দাদ শহরে বাস করতেন। মনে হয় তাঁর প্রকৃত নাম "শালী" যা আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে শালীহ্ হয়েছিল। তিনি সম্ভবতঃ 'ভেল সংহিতা'র রচয়িতা ভেল নামক ভারতীয় চিকিৎসকের বংশোদ্ভব। তিনি অল্ রসিদের ভ্রাতা ইব্রাহিমের মৃগীরোগের চিকিৎসা করে খলিফার ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক গ্যাব্রিয়েলের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন। ইবন্ আল নাদিম্ 'বাখর' বা 'বাইহর' (ভাষ্কর) নামক এক ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ করেছেন ; তিনি নিশ্চয়ই "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" প্রণেতা ভাস্কর নন, কেননা তিনি নাদিম-এর দুই শতক পরে জন্মেছিলেন।

আরও কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক আরবীগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছিলেন। "কঙ্ক" বা কনকায়ন ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও চিকিৎসক। "সাঞ্চাল", "সান্দালিয়া" বা "শাণ্ডিল্য" অথবা "সান্যাল" নামধারী আরও একজন ছিলেন একাধারে চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদ্। "শানক" বা "শৌনক" অথবা "চাণক্য" নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসক এবং "যৌধর" বা "যশোধর" নামক এক দার্শনিক চিকিৎসকও বাগদাদে বসবাস করতেন। কঙ্ক বহু পুস্তক রচনা করেছিলেন যার মধ্যে "কিতাব উন্ ফিৎ তাউয়াহুন" পুস্তকটি মানসিক রোগ সম্বন্ধীয়। আলি ইবন্ রব্বান্ আৎ তাহরী "ফির্‌দৌস্ এল্ হিক্‌মৎ" নামে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এক সংকলন রচনা করেছিলেন। উক্ত পুস্তকে চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, নিদান স্থান এবং অষ্টাঙ্গহৃদয় পুস্তকসমূহের বিশেষ বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি ছিল। রব্বানের ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত "আর্‌রাজী বা "রাহজেস্" যাঁর সম্পূর্ণ আরবী নাম আবু বকর্ মুহম্মদ ইবন্ জাকারিয়া। তিনি আরবী চিকিৎসকগণের মধ্যে অতিশয় খ্যাত ছিলেন।

তাঁর রচিত "আল্‌হাভী" নামক পুস্তকের তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহের সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। আল্ হারীৎ ইবন্ কালদা নামক এক চিকিৎসক মক্কা শহর থেকে পারস্য দেশ পরিক্রমা করেছিলেন। তিনি বলতেন, "অতি সুদক্ষ পাচক এবং সুন্দরী কামাতুরা পত্নী বৃদ্ধদের পক্ষে পরম অনিষ্টকারী"।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে আরবী চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাবিধি অপেক্ষা গ্রীক চিকিৎসাবিধির উপর বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপ্পোক্রাতেস্‌কেও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা প্রভাবিত করেছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে কোসদ্বীপবাসী হিপ্পোক্রাতেস্ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এর স্নিদিয়া শহরের চিকিৎসা বিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। স্নিদিয়া সংলগ্ন কাপ্পাদোচীয় নগর বোগ্‌হাজকিওতে মিতান্নীদের রাজধানী ছিল। জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ হুগো হ্বিঙ্কলের বোগ্‌হাজকিওতে খনন কার্য চালিয়ে বহু সংস্কৃত চিকিৎসা পুস্তকের নিদর্শন পেয়েছেন। সুতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে উক্ত শহরের সংলগ্ন স্নিদিয়া নগরীর চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা নিজেরা প্রভাবিত হয়ে হিপ্পোক্রাতেস্‌কেও প্রভাবিত করেছিলেন।

প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎসাশাস্ত্র

ত্রয়োদশ শতকে ইসলামী দুনিয়ার বহু আরোগ্যশালা মিশর, সিরীয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঁচশত বৎসরের প্রাগ্-ঐসলামিক চিকিৎসাবিদ্যার আরবী অভিজ্ঞতা ইস্‌লামী যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। উক্ত প্রাগ্-ঐসলামিক আরবী অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষ, চীন এবং গ্রীক দেশ থেকে আহৃত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকের প্রসিদ্ধ তুর্কী যুবক সুলতান প্রথম কাইকাভুস্ ১২১৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সিভাস্ শহরে এক বৃহৎ আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালীন তুর্কী কৃষ্টিধারাকে "সেল্‌চুক্" কৃষ্টি নামে অভিহিত করা হত। সেলচুক্ যুগের শেষাংশে (অটোমান্ বা ওস্‌মানী যুগের অব্যবহিত পূর্বে) তুরস্কের আনাতোলিয়ায় আরও বহু আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। বাইজানটাইন বা বৈজয়ন্তী সাম্রাজ্যের পতনের নয় শতাব্দী পরে তুরস্কের

টোকাত্ (১২৭৫), ডীরিক্ (১২২৮), আমাসিয়া (১৩০১) প্রভৃতি স্থানে আরোগ্যশালা ছিল। ঐ গুলির প্রতিটি আজও বিদ্যমান। কোনিয়া (১২১৯-১৩৩১), কাষ্টামনু (১২৭২) এবং সান্কিরি (১২৩৫) আরোগ্য-শালাগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। সেল্চুক্ যুগের কারস্, কাইসেরী এবং সিভাসে প্রতিষ্ঠিত আরোগ্যশালাগুলিও বর্তমানে বিদ্যমান। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কাইসেরী আরোগ্যশালার ৭৫০ তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপিত হয়েছে। আরোগ্যশালাটির পুরাতন রোগীগৃহসমূহ সংস্কৃত করে একটি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়েছে। সিভাসের আরোগ্যশালাটির প্রস্তর নির্মিত তোরণের গায়ে লেখা আছে যে "৬১৪ অব্দে কেইহুস্রেভ-এর পুত্র এবুলফাত্ কাইকাভুস্ কর্তৃক আরোগ্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা একান্তই ঈশ্বরের ইচ্ছানুগ।" সিভাসের আরোগ্যশালাটি কাইসেরী আরোগ্যশালার দ্বিগুণ। উক্ত আরোগ্য-শালার প্রাঙ্গণেই কাইকাভুস্‌কে সমাহিত করা হয়েছে। আরোগ্যশালায় আরবী ভাষায় অনূদিত ভারতীয় এবং গ্রীক চিকিৎসা পুস্তকসমূহের সাহায্যে চিকিৎসা করা হত। প্রাচীন সেল্চুক্ চিকিৎসকেরা পারস্যদেশে চিকিৎসা শিক্ষালাভ করতেন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তুরস্কের তরুণ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থীরা প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহকারীরূপে কাজ করে শিক্ষালাভ করতেন। সেল্চুক যুগে লিখিত বহু চিকিৎসা পুস্তক এখনও বিদ্যমান। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পুস্তকগুলি আরবী ও পারসিক ভাষায় লিখিত হত। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তুর্কীভাষায় লিখিত পুস্তক প্রবর্তিত হয়েছিল।

তুরস্কের ভাকাফ্ (ওয়াকফ্) দপ্তরে সংরক্ষিত সুলতান কাইকাভুসের ১২২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইষ্টিপত্রে উল্লিখিত আছে যে তিনি সিভাস-এর সংস্থাটির পরিচালনার জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং পরিচালনার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন। উক্ত যুগের ওইটিই একমাত্র সংরক্ষিত দলিল। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে আরোগ্যশালাটির ৭৫০ বৎসর পূর্তির উৎসব যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপিত হয়েছে।

য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্র

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র যখন উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে (খৃঃ ১০ শতকে) তখন ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। দলে দলে আক্রমণকারীরা আফগানীস্থান ও পারস্যদেশ থেকে ভারতের ধনরাশি লুণ্ঠনের মানসে আসতে

থাকে এবং সেই সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে তাদের কৃষ্টি, জীবনধারা ও চিকিৎসাশাস্ত্র। গ্রীক ও আরবীদের সংমিশ্রিত চিকিৎসাশাস্ত্রকে ভারতে "য়ুনানী" চিকিৎসাশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। আরবী ভাষায় গ্রীক দেশকে 'য়ুনান" বলা হয়। প্রথমতঃ আয়ুর্বেদের উৎকর্ষতার জন্য এবং ভারতীয়দের সংস্কারের জন্য য়ুনানী চিকিৎসাবিধি ভারতীয়রা সহজে গ্রহণ করে নি। কিন্তু কালক্রমে য়ুনানী চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এক সমন্বয় ঘটে। সেই সম্মিলিত চিকিৎসাবিধিকে ভারতে 'য়ুনানীতিব্' বা "তিব্বি" চিকিৎসা-শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান আক্রমণের পর থেকে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে এক হতাশার ভাব দেখা যায় এবং ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে অবক্ষয়-এর সূচনা হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণ রক্ত, পুঁজ ও মৃতদেহের সংস্পর্শ বর্জন করায় শল্যচিকিৎসা ক্রমে ক্রমে অন্ত্যজগণের আওতায় আসে। ক্ষৌরকারেরা শল্যচিকিৎসার অধিকারী হয় এমন কি পশুপালকেরাও অস্থিভঙ্গের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডেও ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকেরা প্রাধান্য লাভ করেছিলেন এবং উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিরা শল্য চিকিৎসা ব্যবসা করতেন না।

হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানের "পঞ্চভূত"-এর মত য়ুনানী চিকিৎসকেরা শরীরের প্রধান উপাদানকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন, যথা: (১) আর্কান্ (২) মিজাজ্ (৩) আখ্লাত্ (৪) আজা (৫) আর্ভা (৬) কুভা এবং (৭) অফাল্। উক্ত উপাদানসমূহকে বলা হত "উম্ উর ই তাবিয়া"। তাঁরা বলতেন যে, মানুষের সুস্থতা খাদ্য, পানীয়, পেশীসঞ্চালন, বিশ্রাম, নিদ্রা, জাগরণ, মলত্যাগ, ধারণ ও কাম প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে।

জিয়া উল্ দিন্ বারাণী নামক ঐতিহাসিক ফিরোজ শাহ্ তুঘলক-এর রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮) একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থে সর্বপ্রথম য়ুনানী চিকিৎসক মৌলানা বদর্ উল্ দিন্ দিমিস্কি-এর নাম উল্লিখিত আছে। এ ছাড়া মহাচন্দ্র তাবিব্ ও জাজা নামক দুইজন হিন্দু য়ূনানী চিকিৎসকের নামও পুস্তকটিতে দেখা যায়। মুহম্মদ তুঘলক-এর রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫৫) দিল্লীতে ৭০টি আরোগ্যশালা ছিল এবং ১২০০ য়ূনানী চিকিৎসক সেইগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খাজা সামস্ উল্ দিন প্রণীত "মাজমু এ সাম্সী" নামক পুস্তকে নাগার্জুন ও যোগীশ্বর-এর কথাও উল্লেখ আছে। ফিরোজ শাহ তুঘলক্ নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং

ভগ্ন অস্থি পুনর্সংস্থাপন করতে পারতেন। চক্ষুরোগ সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম এবং তিনি চক্ষুপ্রদাহের জন্য এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারী করে ছিলেন। প্রলেপটির নাম ছিল "কুল এ ফিরোজশাহী"। তাঁর আদেশে "তিব্ এ ফিরোজশাহী" নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ ও ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর অধিকৃত এলাকার প্রতিটি শহরে একটি মসজিদ, একটি মখ্‌তব একটি মুসাফিরখানা ও একটি দাওয়াখানা স্থাপনা করতে হবে। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবেদিন-এর রাজত্বকালে (১৪২২-১৪৭২) মন্সুর নামক চিকিৎসক দুইখানি চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। উক্ত রাজসভায় শ্রীভাট্ নামক এক হিন্দু চিকিৎসকও ছিলেন।

বাহ্‌মনী সুলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন আহ্‌মদ তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যের সর্বত্র আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর পায়ের একটি দুরুহ ক্ষতের চিকিৎসা করে নৃসিংহ সরস্বতী নামক চিকিৎসক খ্যাতি লাভ করেন।

গুজরাটের সুলতান মাহমুদ শাহ্ (১৪৫৮-১৫১১) রাজসভার পণ্ডিতদের সাহায্যে ভাগভটের "অষ্টাঙ্গহৃদয়" গ্রন্থটি পারসিক ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পারসিক ভাষায় লিখিত চিকিৎসা পুস্তকসমূহের মধ্যে "তারিখ্ এ ইবন্ এ খাল্লিকান্", "মিশকাত্ শরিফ", "তিব্ এ মাহ্‌মুদী" ও "সিফা এ মাহ্‌মুদী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফিরিস্তা (১৫৭০-১৬১১) নামক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, সুলতান মাহমুদ খালজী সাহিবাবাদ (বর্তমান মধ্য প্রদেশের মাণ্ডু) শহরে একটি আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রচুর ভুসম্পত্তি দান করেছিলেন। যোড়শ শতকের প্রথমভাগে মিঁয়া ভাউয়া বা বেহ্‌ওয়া বিন্ খারাশ খান্ একটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুগ পারসী পুস্তক লিখেছিলেন।

বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল্ শাহ্-এর রাজত্বকালে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ফিরিস্তা ১৫৯০ খৃঃ অব্দে "দস্তুর উল্ আতিব্বা" অথবা "ইখ্‌তিয়ারত্ এ কালিমি" নামক এক পুস্তক রচনা করেন। বিজাপুরের সুলতানের সভা-শল্যচিকিৎসক সম্বন্ধে ইতালীয় ভারত পরিব্রাজক মানুচ্চি (১৬৫৩-১৭০৮) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উক্ত চিকিৎসক দ্বারা কর্তিত নাসিকার পুনর্গঠন সম্বন্ধীয় ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

১৪৮৭ খৃ অব্দে আহ্‌মেদনগর-এ নিজামশাহী রাজ্য স্থাপিত হয়। নবাব

বুরহান নিজামশাহ্, হাকিম ওয়ালী নামক চিকিৎসক দ্বারা "তাকিম্ উল্ আব্দান", "রিসালা এ হিপজ্ এ সিহাত্ এবং "তাকিম্ উল্ আম্রাজ" নামক তিনিটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করান। মুর্তাজা নিজাম শাহ্-এর রাজত্বকালে রুস্তম জুর্জানী "দাখিরা এ নিজাম্শাহী" নামক চিকিৎসা পুস্তক রচনা করেন।

গোলকুণ্ডার সুলতান কুলী কুতব্ শাহ্ এর রাজত্বকালে (১৫৮১-১৬১১) মীর মোমিন নামক পণ্ডিত দুটি চিকিৎসা পুস্তক রচনা করেছিলেন। উক্ত রাজ্যে দরিদ্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হত এবং শয্যাবিশিষ্ট আরোগ্যশালায় রোগীর চিকিৎসা করা হত। সেই সকল আরোগ্যশালায় ছাত্রগণ হাতে কলমে শিক্ষালাভ করত।

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৫২৬-১৫৩০) দিল্লী এবং তাঁর রাজ্যের অন্যান্য শহরে মাসিক বেতনভোগী চিকিৎসক দ্বারা আরোগ্যশালা পরিচালনা করতেন। তিনি নিজে চিকিৎসাবিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁর পুত্র হুমায়ুনের রাজত্বকালে (১৫৩০-১৫৫৬) ইউসুফ বিন্ মোহাম্মদ বিন্ ইউসুফ নামক পণ্ডিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা করেছিলেন এবং আয়ুর্বেদ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসার নিয়মাবলী, রোগের তালিকা, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে এক সংকলন প্রণয়ন করেন। উক্ত পণ্ডিতকেই গ্রীক আরবী ও ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃত সমন্বয়কারী বলে অভিহিত করা হয়। হুমায়ুনের সভাসদ মৌলানা মহম্মদ ফজল্ ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে "হুমায়ুনী" শীর্ষক একটি মহাকোষ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক একটি খণ্ড ছিল। গ্রন্থটিতে উল্লিখিত আছে যে, ১৫৪২ খৃঃ অব্দে বিচারকের ভুলক্রমে শাস্তিস্বরূপ হুসেন নামক এক ব্যক্তির কর্ণ কর্তিত করা হয় পরে সেই ভুল প্রমাণিত হওয়ায় অনুতপ্ত সম্রাট নিজ তত্ত্বাবধানে বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসকের দ্বারা কর্তিত কর্ণটি পুনঃনির্মাণ করিয়ে দেন। ভারতীয় "গাঠনিক শল্যতন্ত্র" বা প্লাষ্টিক সার্জারীর ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন (১৫৫৫-১৬০৫)। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি শিশুর মানসিক গঠনের উপর মাতৃবাক্যের প্রভাব নিয়ে এক অভিনব কিন্তু নির্মম গবেষণা করেছিলেন। কতকগুলি মাতৃহীন শিশুকে পরিচারিকার অধীনে রাখা হয় এবং পরিচারিকাগণকে শিশুদের সঙ্গে আবোলতাবোল বাক্যালাপে

বিরত করা হয় ; ফলে কিছুকালের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয় এবং যে কয়েকটি মাত্র জীবিত ছিল তারা মূক হয়ে যায়। জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় ফ্রেডেরিখ্‌ও অনুরূপ এক গবেষণা করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, জন্মের পর হতে শিশুর কর্ণে যে ভাষা প্রবিষ্ট হয়, শিশু সেই ভাষাতেই বাক্যারম্ভ করে। আকবরের "নবরত্নের" অন্যতম ছিলেন ঐতিহাসিক আবুল্‌ ফজল্‌। তিনি ২৯ জন হিন্দু ও মুসলমান চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিচন্দ্র, বিদ্যারাজা, তোডরমল্ল ও নীলকণ্ঠ। আকবর বহু আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তৎকালে বহু চিকিৎসক স্বগৃহেও চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। সেই সময় পারস্যের জিলানী নগর থেকে হাকিম্‌ আলী জিলানী নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক এসেছিলেন এবং কালক্রমে তিনি সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার জন্য তাঁকে "জালিনুস্‌ এ জামান্‌" বা সেই যুগের "গ্যালেন" নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতা ও হৃদয়ের কপাটিকার উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে ১৫৯৩ খৃঃ অব্দে লাহোরে এবং ১৬০৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা শহরে দুটি সংরক্ষিত পানীয় জলাধার খনন করা হয়েছিল। আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হাকিম হুমাম্‌ তাঁর হারেমের রমণীদের চিকিৎসা করতেন। শুষ্ক তাম্রকুটের ধূম্রপান করলে যে শ্বাসযন্ত্রের রোগ হয় এ কথা সর্বপ্রথম বলেন হাকিম জিলানী এবং তিনি তাম্রকুটধূম্র সুশীতল জলের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করে ধূম্রপানের অনুমোদন করেন। বর্তমান কালের কর্কটরোগ বিশেষজ্ঞগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১৬০৫-১৬২৭)। তিনি সম্রাট হয়েই এক বারদফা কর্মসূচী প্রচার করেন। যার মধ্যে একটি ছিল বড় বড় সহরে আরোগ্যশালা স্থাপনা ও রাজকোষপুষ্ট চিকিৎসক দ্বারা সাধারণের চিকিৎসা। তাঁর রাজত্বকালে প্রকাশিত "তুজুক্‌ এ জাহাঙ্গীরি" নামক পুস্তকে জলাতঙ্ক রোগ ও মহামারী সম্বন্ধে সুলিখিত নিবন্ধ ছিল। জাহাঙ্গীর একটি মৃত নেকড়ে বাঘ-এর শবব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর আদেশে একটি চর্মহীন মেষের শবদেহ আহমদাবাদের একস্থানে ও অপর একটি মাহমুদাবাদ শহরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সাত ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে আহমদাবাদের শবটিতে পচন

আদেশ করেন। পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার বহু যাজক চিকিৎসককে ধর্মীয় সংস্থা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। যাজক চিকিৎসকরা মুর্খ জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে পুনরায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলেন। মধ্যযুগের চিকিৎসাগ্রন্থে দেখা যায় যে যাজক চিকিৎসকগণ বলতেন, সেণ্ট ব্লেজ কণ্ঠনালীর, সেণ্ট এ্যাপোলোনিয়া দন্তের, সেণ্ট বের্নাডিন শ্বাসনালীর, সেণ্ট লরেন্স পৃষ্ঠের ও সেণ্ট এরাস্‌মুস উদরের অধিদেবতা। স্বল্প শিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর যাজকগণ উক্ত বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগের চিকিৎসায় উক্ত অধিদেবতাগণের উদ্দেশ্যে পূজা দিতেন। সেণ্ট গালেন শহরের ক্যারোলিনগিয়ান মঠে একটি উন্নত আরোগ্যশালা ছিল। দ্বাদশ শতকে কোলোনের এক গির্জার যাজকগণ প্রচার করেন যে, তাঁরা খৃষ্টজন্ম নিরীক্ষণকারী পবিত্র প্রাচ্য পুরুষত্রয়ের সংগৃহীত করোটি স্পর্শে রোগ নিরাময় করে থাকেন। সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে রোগী গির্জায় উপস্থিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়। রোগীরা মধ্যযুগে রাজানুগ্রহ লাভের জন্য রাজসমীপে যেত। রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেন ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেসর। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই প্রায় দুই তিন সহস্র রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লস ও রাণী এ্যান্‌ও অনুরূপ বিশ্বাস করতেন।

মধ্যযুগে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে যাজকগণ পথিপার্শ্বে নির্মাণ করেন "হস্‌পিতালিয়া" নামক অতিথিশালা। কালক্রমে অনাথ বালক বালিকা ও কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও উক্ত সংস্থাগুলিতে বাস করতে দেওয়া হত। পুরাকালে য়ুরোপে কুষ্ঠব্যাধি ছিল না। প্রাচ্য হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের মধ্য দিয়ে য়ুরোপে কুষ্ঠ ব্যাপ্ত হয়েছিল। য়ুরোপে কুষ্ঠরোগীদের শহরের সীমানার বাইরে বাস করতে বাধ্য করা হত। মধ্যযুগের য়ুরোপে প্রায়ই প্লেগ মহামারী দেখা দিত।

সে সময় প্লেগের নাম ছিল "কৃষ্ণ মৃত্যু"। চতুর্দশ শতকে য়ুরোপের প্রায় এক চতুর্থাংশ অধিবাসী প্লেগ রোগে প্রাণ হারান। য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডের কন্‌স্তান্তিনোপল্‌ ও গ্রীস দেশে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্লেগ দেখা যায়। অতঃপর স্পেন, উত্তর ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্লেগ বিস্তার লাভ করে। যোহানেস্ নোহ্‌ল্‌ বলেছেন যে, প্লেগ রোগ সুদূর চীন দেশ থেকে রুশিয়া, পারস্য ও তুরস্কের বাণিজ্যপথ ধরে য়ুরোপে প্রবেশ করেছিল।

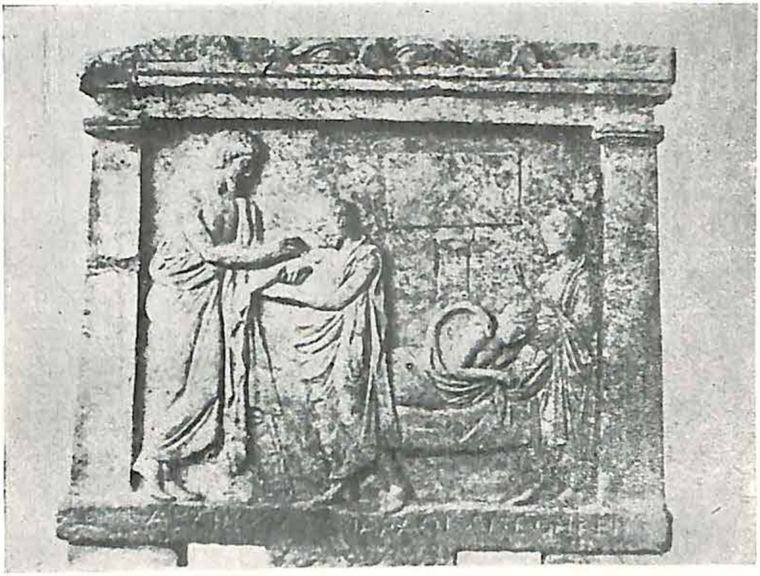

চিত্র ৩৪—ইস্কুলাপিউস কর্তৃক রোগীর চিকিৎসা।

চিত্র ৩৫—ইস্কুলাপিউস কর্তৃক ব্যবহৃত শল্যযন্ত্র।

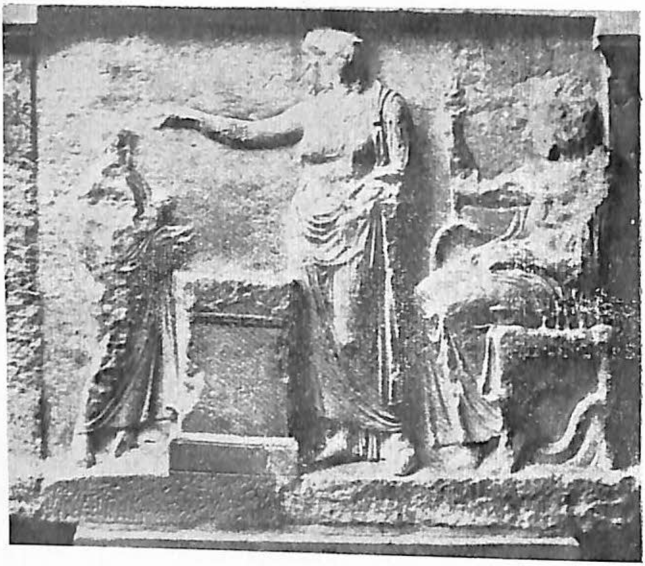

চিত্র ৩৬—ইস্কুলাপিউস, হাইজিয়া ও বিষহীন সর্প।

চিত্র ৩৭—হাইজিয়া ও বিষহীন সর্প।

চিত্র ৩৮—প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক ইয়াসন কর্তৃক এক শিশুর উদর পরীক্ষা।

চিত্র ৩৯—প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক কর্তৃক মূত্র পরীক্ষা।

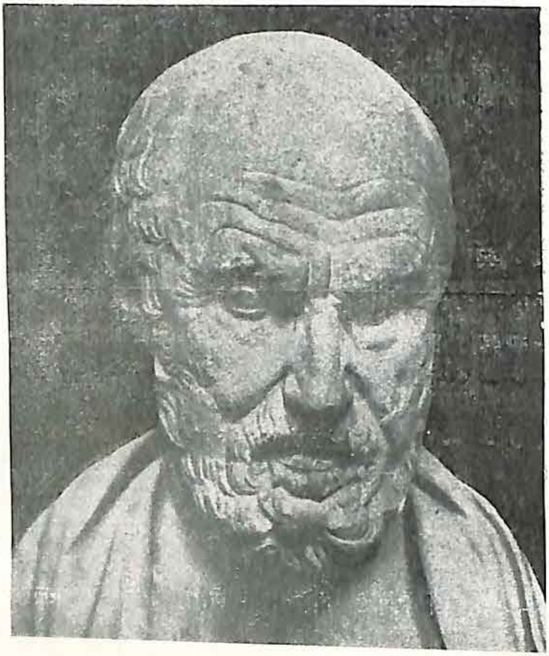

চিত্র ৪০—পাশ্চাত্যচিকিৎসা ধারার প্রবর্তক হিপ্পোক্রাতেস্ হেরাক্লিদে ।

চিত্র ৪১—এই বৃক্ষের এক পূর্বপুরুষের ছত্রছায়ে হিপ্পোক্রাতেস্ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন (ডঃ উইল্‌ডার পেন্‌ফিল্ড-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

ফ্রান্সিস্কান যাজক মিখাইল লিখেছেন যে, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বারোটি জাহাজ ভর্তি প্লেগাক্রান্ত জেনোয়াবাসী নাবিক সিসিলির মেসিনা বন্দরে অবতরণ করে সমগ্র সিসিলিতে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে দেয়। প্লেগ হতে কারও নিস্তার ছিল না। রোগের স্থচনায় রোগীর দেহে বিস্ফোটক দেখা দিত এবং রোগী প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তবমণ করতে করতে মারা যেত। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় সুস্থ মেসিনাবাসীরা শহর পরিত্যাগ করে বনে পলায়ন করে এবং কেউ কেউ ইতালীর মূল ভূখণ্ডে চলে যায়। উক্ত পলাতক মেসিনাবাসী-গণের মাধ্যমে প্লেগ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যযুগীয় চিকিৎসকগণ প্লেগ রোগের কারণ এবং চিকিৎসা উভয় বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন। গী দ্য শালিয়াক্ বলেছেন যে তাঁরা প্লেগের প্রতিষেধক হিসেবে অতিরিক্ত জলীয় খাদ্য পান, মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পান নিষিদ্ধ করতেন এবং বারনারী সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল। বায়ুর সঙ্গে প্লেগ রোগ বিস্তৃতি লাভ করে—এই ধারণায় চিকিৎসকগণ রোগীগৃহে যাওয়ার আগে মুখোস, আলখিল্লা ও দস্তানা পরিধান করতেন। দূষিত বায়ু পরিশোধনের জন্য রোগীগৃহে দুর্গন্ধ-যুক্ত ছাগ রাখা হত এবং রোগীর দেহে বহু প্রকার তাবিজ ও মাদুলী বাঁধা থাকত। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীর রেজিও শহরে প্লেগ দেখা দেয় এবং শহরের শাসক ভিস্কম্তে বেরনারো রোগীদের শহরের বাইরে বহিষ্কৃত করেন এবং শুশ্রূষাকারীগণকে সুস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন।

কিন্তু বেরনারোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইঁদুরের সাহায্যে সংক্রামিত "বাগী প্লেগ" (বিউবোনিক প্লেগ) এর কোনও উপশম হয় নি। সিসিলির রাগুসা বন্দরের নিকট একটি রোগাবাস নির্মিত করা হয়েছিল। রাগুসা বন্দরে আগমনকারী সমস্ত জাহাজযাত্রীদের ৩০ থেকে ৪০ দিন ছিল উক্ত আবাসে বাধ্যতামূলক ভাবে বসবাস করতে হত। ইতালীয় ভাষায় ঐ প্রথাকে বলা হয় "কোয়ারেন্তা জিওর্নি" অর্থাৎ 'নিরোধক দিবস"। পৃথিবীতে অধুনা সুপ্রচলিত "কোয়ারেণ্টাইন" পদ্ধতি "কোয়ারেন্তা জিওর্নি"র আধুনিক রূপান্তর মাত্র।

জার্মানরা ইতালীয় রোগনিরোধক প্রথার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাদের দেশে ঐ চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জার্মানীতে বিধিভঙ্গকারীদের নির্মম শাস্তি দেওয়া হত। ক্যোনিগস্‌বের্গের বারবারা থ্রুটিন নাম্নি এক গৃহ পরিচারিকা এক প্লেগরোগীর ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আসায় থ্রুটিন ও তার প্রভু উভয়েই প্লেগ রোগে মারা যায়। শহরের বিধিভঙ্গকারীদের মধ্যে

ভীতিসঞ্চারের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ থন্‌টিন এর মৃতদেহটি প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রেখে ছিল।

মধ্যযুগের যাজকগণ মনে করতেন যে বাইবেলে বর্ণিত অশ্বারোহী চতুষ্টয়ের (ফোর হর্সমেন অব দি এ্যাপোকালিপ্‌সে) দ্বারা প্লেগ রোগ ব্যপ্ত হয়। স্পেনদেশীয় যাজকগণ বলতেন যে, প্লেগ অত্যধিক নাট্যাভিনয়ের ফল। ফরাসী সম্রাট ফিলিপের পুত্ররা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, রাজবংশের ধর্মগুরুর মতে উক্ত সামাজিক অনাচারই প্লেগের কারণ। দেশের এ চরম দুর্দিনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিতগণ জনসাধারণগণকে বিভ্রান্ত করতেন অলীক কল্পনার দ্বারা। ক্যাপুচিন ও নির্বোধের দল (কম্প্যানিস্ অব দি ফুলস্) নামক যাজকগোষ্ঠীর সাধুরা প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্লেগ রোগের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ ইহুদীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং বহু নিরপরাধ ইহুদিকে লোকসমক্ষে জীবন্ত দগ্ধ করে।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের সমসাময়িক কালে নেপ্‌লস্ শহরের দক্ষিণে ছিল সালের্নো নামক এক স্বাস্থ্যাবাস। নবম শতাব্দীতে ঐ স্থানে একটি বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্যালয় এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট সার্লেমান ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কারও মতে ইহুদি এলিনুস, গ্রীক পণ্টুস, আরবীয় আদ্‌আলী ও রোমক সালের্ন্‌স নামক চারজন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐটি প্রতিষ্ঠিত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কোন পুরুষ এমন কি স্ত্রীলোকও ঐ স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। সালের্নো বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস করতেন ক্যাসিনোতে অবস্থিত ধর্মীয় পুস্তকাগারে। সালের্নো থেকে পাঠ সমাপ্তির পর সকল ছাত্রদের উপাধি দেওয়া হত। খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বহু আহত যোদ্ধা সালের্নোতে চিকিৎসা করিয়েছিলেন! ইংলণ্ডেশ্বর বিজয়ী উইলিয়ামের জ্যেষ্ঠপুত্র রবার্ট চিকিৎসা ব্যপদেশে বহুদিন সালের্নোতে বাস করেন। সেই সুযোগে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় উইলিয়াম ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ডঃ হেসের তাঁর "লেরবুখ্‌ দেস্ গেশিখ্‌তে দের মেদিৎসিন" গ্রন্থে লিখেছেন যে, সালের্নোতে শিক্ষাপ্রাপ্তা পাঁচজন স্ত্রীচিকিৎসকের মধ্যে কনস্তান্তিয়া কালেন্দার অতিশয় খ্যাতিলাভ করেন। ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে সাধু রুডলফ্‌ সালের্নো পরিদর্শনে গিয়ে টরটুল্লা নাম্নী এক বিচক্ষণা চিকিৎসকের

সংস্পর্শে আসেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সিচেলগার্তা নামক এক বিষবিজ্ঞানে (টক্সিকোলজি) পারদর্শিনী মহিলা চিকিৎসক হিংসাপরায়ণা হয়ে তাঁর স্বামী ডিউক রবার্ত গিস্কর্দিকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। ইংল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করতে দেওয়া হয় আজ থেকে মাত্র দুই শতাব্দী আগে থেকে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, সালের্নোর অধ্যাপকগণ ছিলেন নারী প্রগতিপন্থী।

সালের্নোর খ্যাতি ম্লান হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের দক্ষিণে মঁপেলিয়ের ও উত্তর পূর্ব ইতালীর বোলোনিয়া ও পাডুয়া নামক দুটি স্থানে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মঁপেলিয়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ভিলানোভা শহরবাসী আর্নল্ড নামক এক পর্তুগীজ চিকিৎসক। তিনি ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সুহৃদ পোপ অষ্টম বনিফেসের অনুরোধে তিনি কেবলমাত্র চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দ্রাক্ষারস (অ্যালকোহল) সাহায্যে ভেষজ নির্যাস প্রস্তুত কারক। পূর্বে উল্লিখিত গী জ্য শালিয়াক্ মঁপেলিয়ের ও বোলোনিয়াতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পোপ ষষ্ঠ ক্লেমেণ্ট-এর সভা চিকিৎসক এবং 'চিরুরগী ম্যাগনা' নামক একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। গিলবার্ট এ্যাঙ্গেলিকুস্ ও জন্ নামক দুজন ইংরাজও শিক্ষালাভ করেন মঁপেলিয়েরে। জেওফ্রে চসার প্রণীত "ক্যাণ্টারবারি কাহিনী" পুস্তকে জন্এর নাম উল্লেখ আছে। তিনি এডওয়ার্ডের পুত্রকে বসন্ত রোগ হতে রক্ষা করেন। "শরীরের ইতিহাস" নামক পুস্তকে ফ্রেণ্ড নামক এক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, জন্ ভেষজ সাহায্যে মূত্রাশয়ের পাথুরী দ্রবীভূত করতেন ও প্রলেপ দ্বারা বাতের চিকিৎসা করতেন।

মঁপেলিয়ের-এর খ্যাতি সালের্নো অপেক্ষা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিদ্যা লাভের জন্য ছাত্রগণ প্যারী ও পাডুয়া যেত। প্যারীবাসী ইংরাজ ফ্রান্সিস্কান যাজক রোজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) এবং জার্মান ডোমিনিকান যাজক আলবের্টুস মাগনুস (১১৯২-১২৮০) ছিলেন প্যারীর চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এবং ধর্মচর্চায় অবহেলা করবার অপরাধে বেকন ফ্রান্সিস্কান যাজক সম্প্রদায় হতে বহিষ্কৃত হন।

S.C.E.R.T., West Bengal Library

রেনেসাঁস যুগে চিকিৎসাশাস্ত্র

মধ্যযুগের পরবর্তীকালে য়ুরোপের শিল্প ও সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ের যুগকে বলা হয় রেনেসাঁস যুগ। মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসানে, মধ্যয়ুরোপের টিউটনিকেরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুন্মেষের জন্য সচেষ্ট হয়। এই যুগের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং আলব্রেখট্ ড্যুরের এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এক সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। তিনি মৃত মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেন প্রবর্তিত শারীরস্থান তথ্যের বহু ভুল নির্ণয় করেন। এই যুগে, বেলজিয়মের ব্রুসেলস্ শহরে বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ্ আঁদ্রিয়া ভেসালিউসের (ভেসাল) জন্ম হয়েছিল। তিনি লুভেঁ, প্যারী ও পাডুয়াতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর

চিত্র ৫৭

পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে সমগ্র য়ুরোপের ছাত্রমণ্ডলী তাঁর নিকট সমবেত হত। পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করবার পর তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দে করপোরী হ্যুমানিস্" বা "নরদেহের গঠন"। গ্রন্থটি চিত্রিত করেছিলেন বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী টিজিয়ানো ভেচেল্লিও বা টিটিয়ান। পুস্তকটি প্রকাশের পর ভেসালিউসকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক ইয়াকোবুস্ সিল্ভিয়ুস্ এবং প্রিয় ছাত্র কলমুস্ প্রকাশ্যে তাঁকে অপমান করতেও বিরত থাকেন নি। নিরুৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি দগ্ধ করেন। ভেসালিউসের কৃতিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংলণ্ডে আইন দ্বারা ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণকে বৎসরে চারটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শব ব্যবচ্ছেদ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। পাডুয়া হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ ডঃ জন কেয়ুস ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের ক্ষৌরকার শল্য সংস্থার (বার্বার সার্জনস্ গিল্ড) শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে পাডুয়াতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপর এক বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজের নাম উইলিয়ম হার্ভে যিনি মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

চিত্র ৫৮

রেনেসাঁস যুগের অপর এক বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম ফিলিপ্পুস আউরিয়ালিউস্ থিওফ্রাষ্টুস্ ফন্ হোহেনহাইম্। সংক্ষেপে "পারাসেলস্যুস" অর্থাৎ সেলস্যুস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নামে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের

চিত্র ৪২—আরিষ্টটল্

চিত্র ৪৩—গ্যালেন

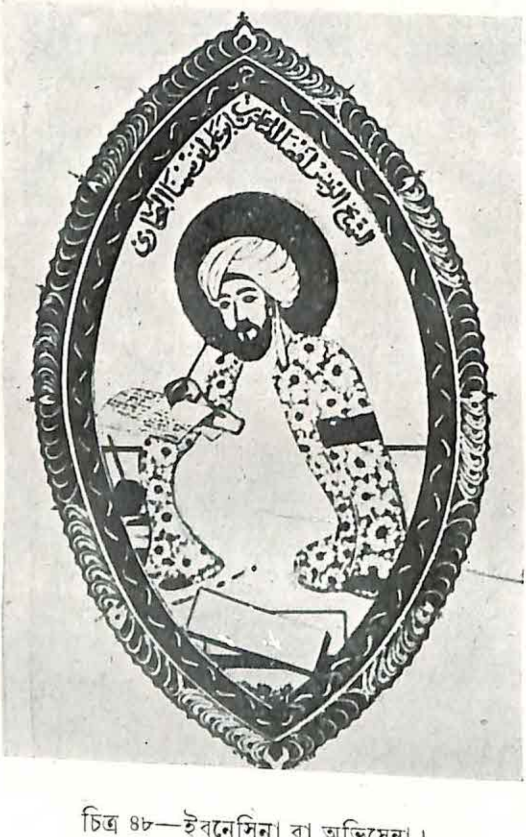

চিত্র ৪৮—ইবনেসিনা বা অভিসেন্না।

আইন্‌সিদেলেন্ শহরের বোমবাষ্ট বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার কারিন্থিয়া প্রদেশের ভিলাখ্ শহরে বাস করতেন। তাঁর পিতা ভিলাখ্ শহরে চিকিৎসাব্যবসায় করতেন। তিনি পুত্রকে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দেন। তারপর প্যারাসেলসুস্ স্বোয়াৎস্ শহরের জিগ্‌মুণ্ড ফুগের এর নিকট রসায়ন শাস্ত্র ও অপরসায়নশাস্ত্র (আরবী-আল খেমি) শিক্ষা করেন। তিনি ভিয়েনা চিকিৎসা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সালৎস্‌বুর্গ শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলে নাগরিকগণের চক্রান্তে তাঁকে ঐ শহর পরিত্যাগ করতে হয়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের বাজেল শহরবাসী মানবতাত্ত্বিক (হিউম্যানিষ্ট) পণ্ডিত ফ্রোবেন অসুস্থ হন এবং প্যারাসেল্‌সুস্ কর্তৃক চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্যলাভ করেন। ফ্রোবেন-এর প্রচেষ্টায় প্যারাসেল্‌সুস্ বাজেল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শহরের পৌরচিকিৎসকের পদ লাভ করেন। তিনি লাতিন ভাষার পরিবর্তে তাঁর মাতৃভাষা জার্মানে বক্তৃতা দিতেন। দুই বৎসর পর তিনি বাজেল ত্যাগ করে কোলমার ও সেণ্টেগালেন শহরে চিকিৎসা শুরু করেন। প্যারাসেলসুস্ বলতেন, "জ্ঞান কেবলমাত্র বই-এর পাতায় নিবদ্ধ থাকে না। চিকিৎসা ও বিজ্ঞান পাঠ করতে গেলে সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। চিকিৎসককে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হতে হবে এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলে দিবারাত্র রোগীর বিষয় চিন্তা করতে হবে।"

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের লাভাল শহরে এক ক্ষৌরকারের গৃহে বিখ্যাত আঁব্রয়ে পারের জন্ম হয়। জেষ্ঠ্য, ভ্রাতা ও খুল্লতাতের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রের

চিত্র—৫৯

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার পর তিনি প্যারীর বিখ্যাত ওতেল্ দীউ নামক চিকিৎসালয়ে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যে অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্য তাঁকে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। তিনি হিপ্পোক্রাতেসের ন্যায় প্রকৃতি বিদ্যা চর্চা করে রোগ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্য ধমনীবন্ধন (লিগেচার) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং গর্ভপথে আবদ্ধ শিশুকে ঘুরিয়ে প্রসব সুসাধ্য করার পথ আবিষ্কার করেন। অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গের জন্য তিনি নানা প্রকার কৃত্রিম

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাবন করেছিলেন। ফরাসীদেশের ক্যাথলিক ও হুজেন্ট্‌গণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় সৈন্যাধ্যক্ষ মারেশাল্‌ ছ মতেয়ার অধীনে তিনি সৈন্য-বাহিনীর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর ধরে কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর পারে প্যারীর সেণ্টকোম চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সুদীর্ঘ ৮০ বৎসরকাল বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্যারীর সেণ্ট আঁদ্রে দেস্ আর্তস্ গীর্জার প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধি আজও বিদ্যমান।

রেনেসাঁস যুগের ইংরাজ চিকিৎসকগণের মধ্যে টমাস্ লিন্‌একার-এর (১৪৬০—১৫২৪) নামও উল্লেখযোগ্য। লিন্‌একার ক্যাণ্টারবারী শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অকস্‌ফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সপ্তম হেনরী কর্তৃক সভা চিকিৎসক নিযুক্ত হন। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে তাঁর উদ্যোগে লণ্ডনে রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিদ্যালয় বা রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তার প্রথম সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। পূর্বে উল্লিখিত জন কেয়ুজ পাডুয়া শহরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে ইংল্যাণ্ডের নরউইচে চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন এবং অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, রাণী মেরী ও রাণী প্রথমা এলিজাবেথের অধীনেও চাকুরী করেন। লিন্‌একারের পর তিনি রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি হন।

রেনেসাঁস যুগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল—যথা, ভেষজ শাস্ত্রজ্ঞ, ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসক (বার্বার সার্জনস্) ও ভেষজ ব্যবসায়ী (এ্যাপোথেকারী)। ফরাসীদেশে ভেষজ শাস্ত্রজ্ঞদের "গ্রাঁদবুর্জোয়া" বা উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর এবং ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণকে "পেতি বুর্জোয়া" নিম্ন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হত। ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণ সমাজের উচ্চস্তরে মেলামেশা করবার সুযোগ পেতেন না। ষোড়শ শতকে ফরাসী ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকেরা একত্রিত হয়ে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসাবিদ্যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও ইংলণ্ডে শল্য চিকিৎসা ব্যবসায় করা যেত। সেই সকল শল্য চিকিৎসকগণ পরিচিত ছিলেন, "মাষ্টার" বা ওস্তাদ নামে। পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ শল্য চিকিৎসকগণ মাষ্টারের পরিবর্তে "মিষ্টার"-এ পরিণত হয়। ইংলণ্ডে শিক্ষিত বহু ভারতীয় শল্য চিকিৎসকও "মিষ্টার" বলে সম্বোধিত হতে পছন্দ করতে। বিখ্যাত বাঙ্গালী শল্য চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "মিষ্টার ব্যানার্জী"

নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভেষজ ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ অন্য চিকিৎসকের নির্দেশে ঔষধ প্রস্তুত করতেন কিন্তু সুযোগ পেলে নিজেরাও রোগী পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের প্লেগ মহামারীর সময় তাঁরা চিকিৎসা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরাও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সংস্থা (রয়েল সোসাইটি অব্ এ্যাপোথেকারীস্) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে সমিতিবদ্ধ হন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

সপ্তদশ শতকে য়ুরোপে বিজ্ঞান চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই শতকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আছেন উইলিয়াম হার্ভে, ফ্রান্সিস্ বেকন, যোহানেস্ কেপ্লের, গ্যালিলিও গ্যালিলেই, রেনে দেকার্ত, ব্লেস্ পাস্কাল্, রবার্ট বয়েল, আইজ্যাক নিউটন, জন লক্, বেনেডিকটুস্ স্পিনোজা ও গটফ্রিদ্ হ্বিল্হেল্ম্ লাইবনিৎস্ এবং আরও অনেকে। গ্যালিলিও এক সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র অবিষ্কার করেছিলেন। ভবিষ্যৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে তারই উন্নত সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছিল। সাংটোরিয়ুস নামক পাডুয়াবাসী বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর মতবাদ অনুসরণ করে সর্বপ্রথম একটি তাপমানযন্ত্র (থার্মোমিটার) আবিষ্কার করেন। রবার্ট বয়েলের ছাত্র জন্ মেয়ো অম্লজান বাষ্প প্রস্তুতে সমর্থ হন। কালক্রমে অম্লজান বাষ্প পরিণত হয় চিকিৎসার এক অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে। স্যর রবার্ট সিবাল্ড নামক এক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আর্চিবল্ড পিটকেয়ার্ন নামক অপর এক স্কট্ চিকিৎসক উক্ত সংস্থার প্রধান সদস্য পদ লাভ করেছিলেন। তাঁরা ছাত্র জন মর্গ্যান আমেরিকার সর্বপ্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যালয় পেন্সিল্ভ্যানিয়া স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা। বিজ্ঞানের এই সুবর্ণযুগে ইংলণ্ডে উইলিয়ামে হার্ভে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে কেম্ব্রিজ ও পরে পাডুয়ায় শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি লণ্ডনের সেষ্ট বার্থোলামিউ হাসপাতালে শল্যচিকিৎসা ও শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। পাডুয়ার অধ্যাপক ফাব্রিসিউস্-এর গবেষণায় অনুপ্রাণিত

চিত্র—৬০

হয়ে তিনি শারীরস্থান শাস্ত্রে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। চতুর্দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি মানব শরীরে রক্ত সঞ্চালনের চক্রবৃত্তগতি

আবিষ্কারে সমর্থ হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর উক্ত তথ্য বিদ্বজ্জন সমক্ষে প্রচারিত হয়। প্রথমতঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও কালক্রমে তাঁর মতবাদই সত্য বলে পরিগণিত হয়। হার্ভের সমসাময়িককালে ইংলণ্ডের অপর বিখ্যাত চিকিৎসক টমাস্ সাইডেনহাম্ (১৬২৪-১৬৮৯) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অলিভার ক্রমওয়েলের সৈন্য বাহিনীতে চাকুরী করতেন। বাইশ বৎসর বয়সে চাকুরী পরিত্যাগ করে অক্সফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি দিবারাত্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে রোগের প্রতিটি লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি রোগনির্ণয় শাস্ত্র বা ক্লিনিকাল ডায়াগ্নোসটিক্ মেডিসিন-এর প্রবর্তক। রক্তাল্পতা রোগের চিকিৎসায় লৌহঘটিত লবণ প্রয়োগ, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় সিনকোনা বল্কল চূর্ণ প্রয়োগ ও উপদংশের চিকিৎসায় পারদ ঘটিত লবণ প্রয়োগ বিধিও তাঁর অমূল্য অবদান। জীবৎকালে তিনি য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে খ্যাতিলাভ করেন।

গ্যালিলিও কর্তৃক আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণ যন্ত্র সরল পরকলা (লেন্স) দ্বারা গঠিত। যৌগিক পরকলা (কম্পাউণ্ড লেন্স) উদ্ভাবনের বহু পূর্বে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মারচেল্লো ম্যালপিঘি ও ওলন্দাজ আন্তনি ভান লেউভেনহোক্ সরল পরকলার সাহায্যে বহু অদৃশ্য বস্তু দর্শন করেছিলেন। ম্যালপিঘি (১৬২৮-১৬৯৪) ছিলেন ইতালীর বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি জীবন্ত ব্যাঙের ফুসফুস পরকলার সাহায্যে পরীক্ষা করে কৈশিকা শিরা ও কৈশিকা ধমনীর (ক্যাপিলারিস্) মধ্যে রক্ত সঞ্চালন রহস্য উদ্ঘাটন করেন। ভ্রূণাবস্থায় রক্ত সঞ্চালন ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছিলেন।

লেউভেন্হোক্ ছিলেন হল্যাণ্ডের ডেল্‌ফ্‌ট্ শহরে বস্ত্র ব্যবসায়ী। অবসর সময়ে তিনি স্ফটিক থেকে বিভিন্ন মানের পরকলা তৈরী করতেন এবং প্রায় দ্বিশতাধিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। তাঁর অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অদৃশ্য বস্তুকে প্রায় ১৬০ গুণ বর্ধিত আকারে দেখা যেত। নিজের দন্তের মধ্য হতে সামান্য ময়লা নিয়ে তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তার মধ্যে জীবাণু দেখতে সমর্থ হন। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে। তাঁর আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যত উন্নতির প্রধান কারণ।

সপ্তদশ শতকের পূর্বে রোগনিদানতত্ত্ব (প্যাথলজি) সম্বন্ধে চিকিৎসকদের

বিশেষ জ্ঞান ছিল না। জিওভান্নি বাতিস্তা মরগান্নি নামক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি রোগ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরণের পরিবর্তন সাধন করে। মরগান্নি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ইতালীর ফোর্লি শহরে জন্ম-গ্রহণ করে ম্যালপিঝির শিষ্য আলবার্টিনি ও ভাল্‌সাল্‌ভা-এর অধীনে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনাকালে তিনি রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে রোগ কেন্দ্র নির্ণয় করতেন। উক্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথাকে তিনি "নিদান তাত্ত্বিক শারীরস্থান শাস্ত্র" (প্যাথোলজিক্যাল এ্যানাটমি) নামে অভিহিত করেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভিয়েনাবাসী অধ্যাপক কার্ল ফ্রেইহের ফন্ রোকীটান্‌স্কী মরগান্নি প্রবর্তিত শাস্ত্রের আরো উন্নতি সাধন করেছিলেন।

নিউটনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে শারীরবৃত্ত, আপেক্ষিক শারীরস্থানতত্ত্ব (কম্পারেটিভ্ এ্যানাটমি) ও অনুবীক্ষণ শাস্ত্রের (মাইক্রোস্কোপি) উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটে। য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে হল্যাণ্ডের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হত। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে হেরমান্ ব্যোরহাভে লেইডেনের ভেষজশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর নিকট ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করতে আসতেন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। তিনি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে। ব্যোরহাভে এর ছাত্রগণের মধ্যে বার্ণের আলব্রেখট্ ফন্ হালের ও ভিয়েনার গেরহার্ড ভান্ সুইটেন এর নাম পৃথিবীখ্যাত।

ব্যোরহাভে বলতেন যে, সকল চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে হবে। এক দেশের আবিষ্কার অন্য দেশের চিকিৎসকগণের সুবিধার্থে যথাসত্বর জানাতে হবে। অষ্টম হেনরীর রাজত্বের শেষকালে চেম্বারলেন (শাঁবেরলাঁ) নামক এক ফরাসী চিকিৎসক ইংলণ্ডে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র প্রসব ব্যবস্থা সরল করবার জন্য "প্রসব-সাঁড়াশী" (অবস্টেট্রিক্যাল্ ফরসেপস্) উদ্ভাবন করেন। বংশানুক্রমে তাঁরা উক্ত যন্ত্রের বিষয় বংশধরদের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন। স্বার্থপর চেম্বারলেন বংশের শেষ চিকিৎসক ডঃ হিউ চেম্বারলেনেব মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) য়ুরোপের চিকিৎসকমণ্ডলী সাঁড়াশীটির বিষয় অবগত হন এবং ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

অষ্টাদশ শতকে ইংরাজ যাজক বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিষ্ট্‌লি প্রমাণ করেন যে প্রশ্বাসিত দূষিত বায়ু জীবন্ত উদ্ভিদের সংস্পর্শে রাখলে পুনরায় দোষমুক্ত হয়।

আঁতোয়া লাভোসিয়ে নামক ফরাসী রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, বায়ুর মধ্যস্থ অম্লজান বাষ্প ফুসফুসের মধ্যে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারাম্লজান বাষ্পে পরিণত হয়। ষ্টিফেন্ হালেস্ নামক ইংরাজ যাজক-বৈজ্ঞানিক রক্তের চাপ নির্ণয় করতে সমর্থ হন।

এই যুগে মানুষের পাচন ক্রিয়ার উপর অনেক গবেষণা হয়। ইতালীয় ধর্মযাজক আবে স্পালানজানী বলতেন যে, পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন ও সম্প্রসারণ দ্বারা খাদ্য মণ্ডে পরিণত হয় এবং পাচিত হয়। উইলিয়াম প্রাউট নামক ইংরাজ পাকস্থলীর অম্লের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেণ্ট মার্টিন নামক একটি কানাডীয় সৈন্যের উদরে বন্দুকের গুলীর আঘাতে একটি ক্ষত হয়। ক্ষতটি ক্রমে ক্রমে ভগন্দরে (ফিস্‌চুলা) রূপান্তরিত হয়। উইলিয়ম বোমণ্ট নামক এক মার্কিন চিকিৎসক উক্ত ভগন্দরের মধ্য দিয়ে পাচক রস সংগ্রহ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা বোমণ্ট প্রতিপন্ন করেন যে উক্ত রসে অম্ল ও অপর একটি অজ্ঞাত পদার্থ থাকে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে থেয়োডোর স্বোয়ান নামক জার্মাণ বৈজ্ঞানিক উক্ত অজ্ঞাত পদার্থের নামকরণ করেন, "পেপ্‌সিন্"। বোমণ্টের পরীক্ষার প্রায় শতবর্ষ পরে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান্ পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ অস্ত্রোপচার দ্বারা কুকুরের পাকস্থলীতে ভগন্দর সৃষ্টি করে পাচকরস নিঃসরণ ও পাচন প্রক্রিয়ার উপর নতুন গবেষণা করেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লুইজি গ্যাল্‌ভানি নামক বোলোনিয়াবাসী বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে একটি ব্যাঙের স্নায়ু রজ্জুতে প্রাণোন্মেষ করতে সমর্থ হন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পাভিয়া শহরের বৈজ্ঞানিক আলেসান্দ্রো ভোল্টা অধিকতর শক্তিশালী বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে মাংসপেশী সঙ্কুচিত করেন। প্রায় এক শতাব্দী পরে জার্মান শারীবৃত্তজ্ঞ দ্যু বোয়া রেমোঁ প্রমাণ করেন যে, মানব শরীরে স্নায়ুর ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যুৎতরঙ্গ দ্বারা উন্মেষিত হয়। উক্ত স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যুৎতরঙ্গ রেখাঙ্কিত করে আজ "হৃৎবিদ্যুৎ লেখন" (ইলেকৃট্রো কার্ডিওগ্রাফী) ও "মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ লেখন" (ইলেকৃট্রো এন-সেফালোগ্রাফী) করা হয়।

এই শতকে ইংলণ্ডে উইলিয়ম ও জন হাণ্টার নামক ভ্রাতৃদ্বয় সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। জন হাণ্টার উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিদ্য ছিলেন। উইলিয়ম প্রথমে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের চিকিৎসক। কালক্রমে লণ্ডনে ভাগ্যান্বেষণে এসে তিনি ডঃ জেমস্ ডগ্‌লাস্ নামক বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ্-এর সান্নিধ্য লাভ

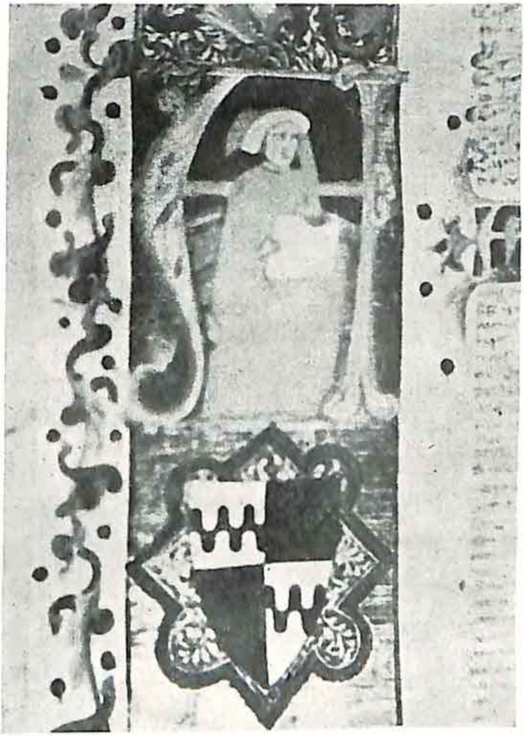

চিত্র ২৯—ইউহান্না ইবন্ মাসাওয়াই।

চিত্র ৫০—
ইবন্‌ঝুর।

চিত্র ৫১—ঔষধ প্রদানরত এক পারসিক চিকিৎসক।

চিত্র ৫২—উত্তপ্ত লোহশলাকা দ্বারা উপদংশ ক্ষত শোধন (পারস্য)।

চিত্র ৫৩—প্রাচীন পারস্যে শব ব্যবচ্ছেদ।

চিত্র ৫৪—প্রাচীন আরবে ঔষধ প্রস্তুত করণ।

চিত্র ৫৫—মুঘল আমলের প্রখ্যাত চিকিৎসক হাকিম সাদ্‌রা।

করেন। ডগলাসের মৃত্যুর পর উইলিয়ম লেইডেনে শারীরস্থান শাস্ত্র-পাঠ করেন ও লণ্ডনে ফিরে একটি শারীরস্থান বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জন হাণ্টার (১৭২৮-১৭৯৩) উইলিয়মের নিকট শারীরস্থান তত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন। তিনি লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ডঃ চেসেলডেন ও সেণ্ট বার্থোলামিউ হাসপাতালে ডঃ পার্সিভ্যাল পট্ এর নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে তিনি কিছুকাল পর্তুগালে ছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে শারীরতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োজিত করেন। উইলিয়ম ধমনীস্ফীতি (এ্যানিউরিজম্) রোগের চিকিৎসার এক নতুন সীবন পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি লণ্ডনের লিষ্টার স্কোয়ারে যে বৃহৎ নিদানতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়াম) স্থাপনা করেছিলেন বর্তমানে সেই সংগ্রহশালাটি রাজকীয় শল্যচিকিৎসক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

জন অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন এবং দুঃসাহসিকতার জন্যই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। প্রমেহ ও উপদংশ রোগের প্রভেদ বিচারের জন্য তিনি এক যৌন ব্যাধিগ্রস্থের ক্ষত থেকে পুঁজ নিয়ে নিজের শরীরে টিকা দেন এবং উপদংশ রোগাক্রান্ত হন। উপদংশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাঁর হৃদযন্ত্রের "মুকুট ধমনী" (করোনারী আর্টারী) অপরিসর হয়ে যায় এবং সেজন্য তিনি প্রায়ই হৃদিশূল (এ্যানজিনা পেক্টোরিস) বেদনায় কষ্ট পেতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জর্জ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। জন হাণ্টার এর ন্যায় চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসক আজও বিরল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে পরিগণিত হন।

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফিলিস্তিন থেকে বসন্ত রোগ য়ুরোপে আনেন। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বসন্ত রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করত। রাণী দ্বিতীয়া মেরীও বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিলেন।

স্পেন থেকে অভিযাত্রীগণ কর্তৃক বসন্ত রোগ আমেরিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। আমেরিকায় রোগটি মহামারীরূপে দেখা দেয়। বসন্তের কারণ বা চিকিৎসা উভয়ের সম্বন্ধেই চিকিৎসকগণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের ইংরাজ

রাজদূতের পত্নী লেডী মেরী অর্টলি মণ্টেগু তাঁর এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন যে, তুরস্কে বসন্তের প্রতিষেধের জন্যে বসন্ত রোগীর মারী গুটিকা থেকে লসিকা নিয়ে সুস্থ বালক বালিকার দেহে সূচিকা সাহায্যে টিকা দেওয়া হয়। টীকা দেওয়ার পর শিশুদের দেহে স্বল্প পরিমাণে গুটিকা নির্গত হয় ও জরভাব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুগণ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ দেহে পরবর্তী জীবনযাপন করে। ইংলণ্ডে উক্ত প্রতিষেধক প্রথার প্রবর্তনের জন্য লেডী মণ্টেগু এককভাবে আন্দোলন করেছিলেন এবং রবার্ট সাটন নামক এক ভদ্রলোক লেডী মেরীর আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এসেক্স এর ইন্‌গেট্‌স্টোন শহরের প্রায় সতেরো হাজার ব্যক্তিকে টিকা দেন। মাত্র পাঁচ ব্যক্তি উক্ত টিকার বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারান কিন্তু অপর সকলেই ভবিষ্যতে বসন্ত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কটন মাথের নামক ব্যক্তি মার্কিন দেশে টিকা পদ্ধতির প্রবর্তক। মনুষ্যদেহের বসন্ত গুটিকা লসিকার বিকল্পের জন্য মানুষ আরও নিরাপদ প্রতিষেধকের অনুসন্ধান শুরু করল। ইংলণ্ডের গ্লষ্টারশায়ারবাসী ডঃ এডওয়ার্ড জেনার (১৭৪৯-১৮২৩) বাল্যকালে শুনেছিলেন যে, গো-দেহের মারী গুটিকাক্রান্তা গোয়ালীনিদের বসন্ত রোগ হয় না। তাঁর পরম সুহৃদ ডঃ জন হাণ্টার উক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য জেনারকে গবেষণা করতে অনুরোধ করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জেনার গো দেহের মারী গুটিকার লসিকার দ্বারা একটি বালকের বাহুতে টিকা দেন। প্রায় দু মাস পরে, মানুষের বসন্ত গুটিকার লসিকা দিয়ে বালকটিকে আবার টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বালকটির আর বসন্ত হয় না। টিকার এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর জেনার টিকা ব্যবস্থার বহুল প্রচারে সচেষ্ট হলেন। জেনারের সুনামে ঈর্ষান্বিত বেঞ্জামিন জেষ্টি নামক একজন কৃষক লোকসমক্ষে প্রচার করতে লাগলেন যে জেনার কর্তৃক টিকা দেওয়ার প্রথা আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি গো-বসন্ত লসিকা দ্বারা তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণকে টিকা দিয়েছেন। জনমত সংগ্রহ করে তিনি তাঁর দাবী পার্লামেণ্টে উত্থাপন করেন। অবশেষে তাঁকে অর্থ ও সম্মান প্রদর্শন করে শান্ত করা হয়। জেনারও পুরস্কারস্বরূপ রাজকোষ থেকে দশ সহস্র পাউণ্ড লাভ করেন এবং রুশিয়ার জার তাঁকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন।

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষার সময় আঙ্গুলের সাহায্যে বুকে আঘাত করে বুকে শব্দ করেন ও সর্বশেষে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করেন।

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রের এই দুই অত্যাবশ্যক পরীক্ষাবিধিও অষ্টাদশ শতকের অবদান। লিওপোল্ড আউয়েনব্রুগের নামক এক চিকিৎসক ভিয়েনার স্পেনীয় সামরিক হাসপাতালে চাকুরী করতেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মদ্য

চিত্র—৬১

ব্যবসায়ীরা মদের পিপার বাহিরে আঘাত করে পিপার অভ্যন্তরে মদ্যের পরিমাণ বুঝতে পারে। তাঁর মনে হয় যে, অসুস্থ মানুষের বক্ষপিঞ্জর বা উদরের উপর আঘাত করলেও হয় তো আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝা যাবে। তাঁর অনুমান প্রকৃতই সত্য হয়। তাঁর উক্ত "সংঘট্ট বিধি" (পার্কাসান্) আজও রোগ নির্ণয় শাস্ত্রের এক অবশ্য করণীয় ব্যবস্থা। ষ্টেথোস্কোপ আবিস্কার করেন এক ফরাসী চিকিৎসক ; তাঁর নাম রেণে থিয়োফিল্ হিয়াসিন্তে লেনেক্। উক্ত দীর্ঘ নাম ধারী ছিলেন এক অতি শীর্ণ ব্যক্তি। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিটানীতে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন প্যারীর এ্যকোল দ্য মেদেসিন্-এ ডঃ কর্ভিসার্ত ও ডঃ বেইলে-এর অধীনে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জুর্ণাল দ্য মেদেসিন-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন ও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্যারীর লোপিতাল্ নেকার-এর পরিদর্শক চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। একদিন তিনি দেখতে পান যে, ক্রীড়ারত দুটি শিশু একটি কাষ্ঠ খণ্ডের দুটি প্রান্তে কান লাগিয়ে শব্দ করে একে অন্যের শব্দ শুনছে। লেনেক্-এর মনে হল হয়তো অনুরূপ উপায়ে রোগীর হৃৎস্পন্দন বা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও

চিত্র—৬২

শোনা যাবে। এক অতি স্থূলকায়া রোগিণীকে পরীক্ষার সময় একটি কাগজের নলের সাহায্যে আশাতীত ভাল ভাবে রোগিণীর হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ তিনি শুনতে পান। উক্ত কাগজের নল থেকেই উদ্ভূত হল বর্তমান চিকিৎসকের নিত্যসঙ্গী "ষ্টেথোস্কোপ্"। অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাসে এক অদ্ভুত চরিত্র ডঃ ফ্রানৎস্ আন্তোন মেসমের। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কল্পনা করতেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকাসমূহ মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। প্রফেসর হেহ্‌ল্ নামক এক যেসুইট পুরোহিত মেসমেরকে কয়েক খণ্ড চুম্বক দেন। মেসমের দাবী করেন যে তিনি এক হৃদরোগীর দেহে চুম্বক

চিত্র—৬৩

স্পর্শ করে আশাতীত ফল লাভ করেছেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁর ধারণা হল যে, মানুষের শরীরের মধ্যেই চুম্বকশক্তি উৎপন্ন হয়। ব্যারণ হারেৎস্কি নামক এক ধনীর গৃহে সমবেত রোগীদের মধ্যে এক স্নায়ুবিক দৌর্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তিকেও মেসমের নিরাময় করেন। মেসমেরকে ঐরূপ পাগলামি থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেন ভিয়েনার চিকিৎসক সংস্থার সভাপতি ব্যারণ ফন্ ষ্টোর্ক। অষ্ট্রীয় সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসিয়ার পরিচারিকা মাদ্‌মোয়াজেল্ পারাদীস্ নামক মহিলার চিকিৎসা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ভিয়েনা চিকিৎসক সংস্থার প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়। মহিলাটি ছিলেন অন্ধ। অপরাপর চিকিৎসকগণ সাব্যস্ত করেন যে, পারাদীসের চক্ষুর স্নায়ু দুটি পক্ষাঘাতদুষ্ট হওয়ায় চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎসায় মহিলার দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। মেসমের-এর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত চিকিৎসকগণ তাঁকে ভিয়েনা থেকে বহিষ্কৃত করলেন। ভাগ্যান্বেষী মেসমের প্যারীর অভিজাত পল্লী প্লাস ভেঁদোম-এ চিকিৎসা ব্যাসায় আরম্ভ করলেন। তাঁর চুম্বকীচিকিৎসায় বহু অভিজাত রমণীগণের কপট মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া) রোগ আরোগ্য হতে লাগল। মেসমেরকে তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন প্যারীর চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি মঁসিয়ে লেরয়। বিপদগ্রস্ত মেসমের সম্রাজ্ঞী মারী আঁতোয়ানেতের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট ষোড়শ লুইএর অনুগ্রহে আরও কিছুকাল মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎসা চলতে লাগল। অবস্থা আরও প্রতিকূল হওরায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী পরিত্যাগ করেন। আজও যাদুকরগণ যে হাত পা নেড়ে "মেসমেরিস্‌ম্"-এর খেলা দেখান, তা মেসমের এর নামের সাক্ষ্য বহন করে। মেসমের এর শিষ্য কাউন্ট দ্য পীসেগুর মেসমের এর ন্যায় চিকিৎসা করতেন। জেমস্ এস্‌কৃডেইল নামক ইংরাজ চিকিৎসক ভারতে মেসমের-এর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন।

চিত্র—৬৩

এই শতকে ফরাসী দেশের অপর একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ফিলিপ্পে পিনেল্। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পূর্বে তিনি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। ত্রিশ

চিত্র—৬৪, ৬৫

বৎসর বয়সে ধর্মচর্চা ত্যাগ করে মঁপেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপনান্তে তিনি প্যারীর বিউতর্ বন্দীশালার চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বিউতর্ বন্দীশালায় সাধারণ অপরাধীগণের সঙ্গে

উন্মাদগণকেও বন্দী করে রাখা হত। দুই বৎসর পর তিনি সাল্‌পেত্রিয়ে বন্দীশালার কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর এক প্রিয় বন্ধু উন্মাদ অবস্থায় উক্ত বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে নৃশংসভাবে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক নিহত হন। ঐ ঘটনায় মর্মাহত পিনেল উন্মাদের চিকিৎসায় জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প নেন। ফরাসীদের বন্দীশালায় আবদ্ধ উন্মাদগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। পিনেল ঐরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট মর্মস্পর্শী ভাষায় বারম্বার করুণাভিক্ষা করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী নেতা কুথঁর নিকট উন্মাদগণের নাগরিক অধিকার প্রত্যার্পণের দাবী করেন। কুথঁ প্রথমে তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলেও স্বচক্ষে বন্দীদিগের করুণ অবস্থা পরিদর্শনের জন্য পিনেল-এর সঙ্গে সালপেত্রিয়ে বন্দীশালা পরিদর্শনে যান। সালপেত্রিয়ে বন্দীশালার নারকীয় অবস্থা দেখে নির্মম বিপ্লবী কুথঁ-এর কঠিন হৃদয় অভিভূত হয় এবং তিনি পিনেল-এর প্রধান সমর্থক হন। পিনেল উন্মাদের শৃঙ্খলমুক্ত করলেন। তাঁর সমবেদনশীল ব্যবহারে বহু উন্মাদ আবার সুস্থ মানুষে পরিণত হল। পিনেল বহুকাল ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তাঁর করুণাময় হৃদয়ের কথা আজও কেউ ভোলেনি।

চিত্র—৬৬

উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

উনবিংশ শতকের জনসাধারণ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের প্রতি অধিকতর সচেতন হন। বৈজ্ঞানিকগণের সান্নিধ্যে এসে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হন তাঁরা। দেশে দেশে শুরু হয় শিল্পের জয়যাত্রা। বহু অভিনব আবিস্কারে চিকিৎসাশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়। এই শতাব্দীর চিকিৎসকগণের মধ্যেই সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটে। উনবিংশ শতকের চিকিৎসকগণ অনু-ধাবন করেন যে কেবলমাত্র ঔষধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয় না, প্রয়োজন উপ-যুক্ত সেবা ও যত্নেরও। মধ্যযুগে কোনও কোনও খৃষ্টীয় ধর্মসংস্থার সন্ন্যাসিনীগণ রোগ সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও উপযুক্ত জ্ঞান ও শৃঙ্খলার অভাবে সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হত না। সেবিকারা সমাজে উচ্চস্থানের অধিকারিণী ছিলেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কাইজেরস্‌ত্থের্থ শহরে থেয়োডোর ফ্লিদনের নামক এক লুথারপন্থী যাজক ও তাঁর স্ত্রী ফ্রিদেরিকে তাঁদের গৃহে একটি রোগ সেবিকা শিক্ষালয় স্থাপনা করেন। শিক্ষালয়টিতে সন্ন্যাসিনীগণ শিক্ষা নিতেন। বিশ্ববিশ্রুত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় রোগ জর্জরিত, আহত ও অর্ধভুক্ত ইংরাজ সৈন্যদের সেবা ও যত্ন করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি লণ্ডনের সেণ্ট টমাস্ হাসপাতালে একটি সেবিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সংক্রামক রোগ সমস্যা

চিকিৎসা ঐতিহাসিকদের মতে জীবাণুজাত সংক্রামক রোগের বিষয় সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ইতালীর টারেন্টিউস্ রুস্টিকুস্; মধ্যযুগে ফ্রাকাসটেরিউস নামক এক ব্যক্তি তাঁর "দে কণ্টাজিওনে" বা সংক্রমণ নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, মানবচক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কিরসের নামক এক ব্যক্তি একটি আদিম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক প্লেগ রোগীর রক্ত ও পুঁজের মধ্যে প্লেগ জীবাণু দেখতে পান বলে দাবী করেন। আধুনিক জীবাণু বিজ্ঞানের জনক ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের জন্ম এই যুগে (১৮২২-১৮৯৫)। প্রথম জীবনে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও কেলাসন (ক্রিস্টালাইজেসন্) বিষয়ে গবেষণা করতেন। তাঁর এক প্রবন্ধ পাঠ করে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সংস্থা তাঁকে লিলে, ষ্ট্রাসবুর্গ, ও সর্বশেষে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। লিলে শহরে অবস্থানকালে মদ্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য তিনি গাঁজন (ফারমেনটেশান্) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা করতেন। পাস্তুর প্রমাণ করেছিলেন যে, কয়েক প্রকার অদৃশ্য জীবাণু দ্বারা দ্রাক্ষারসে গাঁজন হয়ে দ্রাক্ষাসব (এ্যালকোহল) উৎপন্ন হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর দুই সহকর্মী বিস্ফোটক রোগগ্রস্ত একটি গরুর রক্তের মধ্যে এক প্রকার বৃহদাকৃতি জীবাণু দেখতে পান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত জীবাণুকে "এ্যানথ্রাক্স" জীবাণু নামে অভিহিত করেন জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ রোবের্ট কোখ্। সংক্রামক রোগ জীবাণু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুর জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্যও চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্কৃত টিকা পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করে পাস্তুরের ধারণা হয় যে, সংক্রামক রোগ জীবাণু স্বল্প পরিমাণে মানব শরীরে প্রবিষ্ট করালেও হয়ত অনুরূপ প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মাবে। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কর্ষিত মুর্গীর উদরাময় জীবাণু জলে নিলম্বিত

চিত্র ৫৬—মুঘল যুগে এক রাজপুত রমণীর উদর ভেদন দ্বারা সন্তান প্রসব
(স্পেনীয় ডঃ ফের্নান্দো বুয়েনো মার্তিনেজ-এর সৌজন্যে)

চিত্র ৫৭—
আঁদ্রিয়া
ভেসালিউস্
(ভেসাল্)

চিত্র ৫৮—
পারাসেল্‌সুস্‌

চিত্র ৫৯—
আঁব্রোয়া পারে

চিত্র ৬০—উইলিয়ম্ হার্ভে।

চিত্র ৬১— লেওপোল্ড আউয়েন্‌ব্রুগ্‌গের।

চিত্র ৬২—লেনেক্

চিত্র ৬৩—ফ্রানৎস্ আন্তোন মেস্‌মের

চিত্র ৬৪—য়ুরোপীয় ক্ষৌরকার শল্যচিকিৎসক কর্তৃক মস্তকে কপট-অস্ত্রপচার।

(সাস্‌পেন্‌সন্) করে মুর্গী শাবকের দেহে সূচীবিদ্ধ করেন। ফলে ভবিষ্যতে মুর্গীশাবকগুলি উদরাময় রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কৃত্রিম উপায়ে কর্ষিত (কালটিভেটেড্) হীনবলীকৃত (এ্যাটেনিউএটেড্) জীবাণুদ্বারা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ক্ষমতা উৎপন্ন করা সম্ভব। কালক্রমে পাস্তুর ও তাঁর সহযোগী সামবেরলাঁ, রু ও থুলিয়ের এ্যানথ্রাকস, শূকরের বিস্ফোটক ও জলাতঙ্ক রোগের (রেবিস) প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতে সক্ষম হন। অনেকে হয় তো লক্ষ্য করেছেন যে, কুকুর বা শিয়ালে দংশন করলে কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালের "পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট"-এ গিয়ে প্রতিষেধক টিকা নিতে হয়। পৃথিবীতে অনুরূপ বহু পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট্ আজও পাস্তুরের স্মৃতি বহন করছে। পাস্তুরের শিষ্যদের মধ্যে রুশীয় এলি মেশ্‌নিকফ্ (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, ১৯০৮) ও ফরাসী এমিলে রু-এর নাম পৃথিবী বিখ্যাত।

চিত্র—৬৮

ফরাসী ও জার্মান পরস্পরের জাত শত্রু। পাস্তুরের পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীগন যথন রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের গবেষণায় রত, তখন প্রুসিয়ার এক গ্রাম্য চিকিৎসক জীবাণুর সন্ধানে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, তাঁর নাম রোবের্ট কোখ্। কোখের জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পর তিনি কিছুকাল জার্মানীর সামরিক বিভাগে চাকুরী করেন। তারপর এক গ্রাম্য চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। সে সময়ে জার্মানীতে যক্ষ্মারোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। কোখ্ যক্ষ্মাজীবাণু অনুসন্ধানের জন্য যক্ষ্মায় মৃত রোগীর দেহের বিভিন্ন তন্তু তন্তুরঞ্জক পদার্থ দ্বারা রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এক মৃত যক্ষ্মারোগীর শ্বাসযন্ত্রের তন্তুর মধ্যে তিনি একপ্রকার জীবাণুর দর্শন পেলেন এবং পরবর্তী তিন বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার পর নির্ভুলভাবে প্রমাণ করলেন যে, উক্ত জীবাণুই যক্ষ্মার কারণ এবং তা প্রধানতঃ রোগীর শ্লেষ্মার ও থুথুর মাধ্যমে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়ে যক্ষ্মারোগ সৃষ্টি করে। তিনি জীবন্ত যক্ষ্মাজীবাণু শর্করা থেকে প্রস্তুত এক প্রকার ক্বাথের মধ্যে কর্ষিত করে 'গিনিপিগের' দেহে সূচিকাবিদ্ধ করেন ও অবিকল মানব দেহের যক্ষ্মার ন্যায় ক্ষত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যক্ষ্মার জীবাণু থেকে এক প্রকার নির্যাস প্রস্তুত করেন এবং তার সাহায্যে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে

ব্যর্থ হন। উক্ত নির্যাস সাহায্যে যক্ষ্মারোগ নিরূপণের পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন ভিয়েনাবাসী বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ ক্লেমেন্স ফ্রাইহের্ ফন্ পির্কে। ডঃ পির্কে পরবর্তীকালে অধুনা সর্বজনজ্ঞাত "এলার্জি" মতবাদের প্রবর্তন করেন। কলেরা রোগ জীবাণু ভয়াবহ "ভিব্রিও কোমা"-ও কোখ্-এর অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। উক্ত জীবাণুর সন্ধানে তিনি মিশর ও ভারত পরিভ্রমণ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেন। সেই পরিদর্শনের স্মরণে স্থাপিত তাঁর আবক্ষ মর্মর মূর্তি আজও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিদ্যমান। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

চিত্র—৬৯, ৭০

উনবিংশ শতকের নিদানতত্ত্ব

উনবিংশ শতকে নিদানতাত্ত্বিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জার্মানীর ভ্যুয়ের্তসবুর্গের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক রুডলফ্ ফিয়েরকোভ্ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রচার করলেন যে, মানবদেহের প্রতিটি কোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিদানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত কোষসমূহ অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করা কর্তব্য। তিনি প্রমাণ করেন যে, মানবদেহে জীবাণু সংক্রমণ হলে শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংসের জন্য যোদ্ধার ন্যায় রোগকেন্দ্রে সমবেত হয়ে জীবাণু ভক্ষণ করে ফেলে। পূর্বোক্ত রুশীয় নিদানতাত্ত্বিক এলি মেশ্নিকফ্ উক্ত বিষয়ে আরও নতুন গবেষণা করে স্থির করেন যে শ্বেতকণিকাসমূহের কিয়দংশ জীবাণুর দেহ নিঃসৃত বিষ শোধন করে এবং অপরাংশ জীবাণু ভক্ষণ করে।

উপদংশ রোগের সূত্র-সন্ধান

প্রবাদ আছে যে, কলম্বাসের সঙ্গী আমেরিকা প্রত্যাগত নাবিকগণ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশে উপদংশরোগ (সিফিলিস) ছড়ায়। নাবিকগণের মধ্যে উক্ত রোগ দেখতে পান রুই ডিয়াজ দে ইস্লা নামক চিকিৎসক। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে লাস কাসাস্ নামক ব্যক্তি উপদংশের কারণ অনুসন্ধানে হাইতি দ্বীপে গিয়েছিলেন। ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লসের রাজত্বকালে তাঁর সৈন্যবাহিনীর কতিপয় পেশাদারী স্পেনীয় সৈন্য উক্ত রোগ প্রথমে ফরাসীদেশ ও পরে ইতালীতে বিস্তৃত করে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাকাসটোরিয়ুস নামক এক ভেরোনাবাসী পদ্যের ছন্দে 'সিফিলিস' নামক এক যুবক পশুচারকের

উপদংশ রোগ যন্ত্রণা বর্ণনা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই উপদংশের নাম হল সিফিলিস্। সিফিলিস রোগ ইংলণ্ডে নিয়ে যায় সম্রাট চার্লসের অধীনস্থ ইংরাজ সৈন্যগণ। রাজা চতুর্থ জেম্স্ সিফিলিস্ রোগীদের এডিনবরা শহরের সন্নিকটস্থ লেইথ দ্বীপে নির্বাসিত করেছিলেন। আদেশ অমান্যকারী রোগীগণের গাত্রে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা হত। ইংল্যাণ্ডের ব্যভিচারী রাজা সপ্তম হেনরী নিজেই উপদংশ রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। প্যারীর সিফিলিস্ রোগীগণকে সাঁ জের্‌মেঁ পল্লীতে বাস করতে বাধ্য করা হত। স্কটল্যাণ্ডবাসীগণ সর্বপ্রথম বুঝতে পারেন যে, রোগটি যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রামিত হয় এবং সেইজন্য এবারডিন শহরের বারবণিতাগণের গণ্ডে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করে শহর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে জঁ্য আসক্রক্ নামক চিকিৎসক সর্বপ্রথম সন্দেহ করেন যে, উপদংশ এক জীবাণু সংক্রামিত ব্যাধি। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ ফ্রিৎস্ সাউডিন্ সিফিলিসের জীবাণু "স্পিরোকিটা প্যালিডা" আবিষ্কার করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কোখ্-এর শিষ্য ডঃ আউগুস্ত ফন্ হ্বাসারমান্ সিফিলিস নির্ণয়ের এক অভিনব বিধি রক্ত পরীক্ষার আবিষ্কার করেন। পরীক্ষাটি "হ্বাসারমান্ রিঅ্যাক্সন্" বা "ডব্লিউ আর" নামে এখন সর্বজন পরিচিত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিখ সিফিলিসের সর্বপ্রথম ঔষধ "স্যালভারসান" আবিষ্কার করেন। এরলিখ্ ১৯০৮ খৃঃঅব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি বর্তমানে সুপরিচিত "কিমোথেরাপী" বা কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা জীবাণু নিরোধন পদ্ধতির জনক বলে আজও সম্মানিত হন। বিংশ শতাব্দীতে ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত মহৌষধ "পেনিসিলিন"-এর সাহায্যে সিফিলিসকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় নির্মূল করা হয়েছে। ১৫ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিফিলিস রোগ নিয়ে আসে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গী নাবিকগণ।

চিত্র—৭১

ডিফ্‌থেরিয়া রোগ

অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপে ডিফ্‌থেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল এবং বহু শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফিয়েরকোভ্-এর সুযোগ্য শিষ্য ডঃ এডভিন্ ক্লেবস্ একটি ডিফ্‌থেরিয়া রোগীর লালার মধ্যে ডিফথেরিয়া রোগ জীবাণু দেখতে পান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কোখ্-এর অপর

এক ছাত্র ফ্রিদেরিখ্ ল্যোফলের্ পুষ্টিকর ক্বাথের মধ্যে উক্ত জীবাণু কর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডিফ্‌থেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ধনুষ্টঙ্কার রোগের টিকা আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী এমিল ফন্ বেহ্‌রিং ও তাঁর জাপানী সহযোগী সিবাশাবুরো কিটাসাটো। কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র বেহরিংকে চিকিৎসা বিষয়ে প্রথম নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হয়!

শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালা

সপ্তদশ শতকে এক ইতালীয় শারীরস্থানবিদ্ সর্বপ্রথম মানবদেহের নালীবিহীন গ্রন্থিসমূহের (ডাকট্‌লেস্ গ্ল্যাণ্ডস) অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হলেও চিকিৎসকগণ উক্ত গ্রন্থি সমূহের কার্যক্ষমতা হীনতাজনিত ব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছিলেন সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী পরে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের গাইস্ হাসপাতালের চিকিৎসক টমাস এ্যাডিসন একটি রোগীর বৃক্কশীর্ষ গ্রন্থির (সুপ্রারেনাল গ্ল্যাণ্ড্স্) ক্ষরণ ক্ষমতা হীনতাজনিত রোগ "এ্যাডিসনস্ ডিজিস্" নির্ণয় করেছিলেন। বিখ্যাত সুইজারল্যাণ্ডবাসী শল্যচিকিৎসক থেয়োডোর কোখের পরবর্তীকালে "ঢালগ্রন্থি" বা গলগ্রন্থির (থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড) কার্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন ও তাঁর গবেষণা উৎকর্ষের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর অনুগামী মরিৎস্ সীফ্ প্রমাণ করেন যে, গলগণ্ড রোগগ্রস্তের ব্যাধিদুষ্ট গলগ্রন্থি সম্পূর্ণ অপসারিত করলে রোগীর মৃত্যু হয়। ল্যাংডন ব্রাউন নামক ইংরাজ চিকিৎসক সর্বপ্রথম পিটুইটারী গ্রন্থিকে "সর্দার গ্রন্থি" (মাষ্টার গ্ল্যাণ্ড) নামকরণ করেন। পরবর্তীকালে "সর্দার গ্রন্থি"-র (পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড) কার্যপ্রণালী সঠিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন হার্ভে কুশিং নামক বিখ্যাত মার্কিন স্নায়ু শল্যচিকিৎসক।

বিংশ শতাব্দীতে (১৯২১) কানাডীয় শারীরবৃত্তিক (ফিজিওলজিষ্ট) ফ্রেডেরিক ব্যানটিং জার্মান নিদানতাত্ত্বিক লান্‌গেরহান্স-এর গবেষণা পুনরায়-অনুসরণ করে অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) এর মধ্যস্থিত "কোষদ্বীপপুঞ্জ" (ইন্‌সুলা) হতে মানবশরীরের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় রস "ইন্‌সুলিন" আবিষ্কার করেন। উক্ত রসের অভাব ঘটলে ভয়াবহ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস্ রোগ হয়। উক্ত আবিষ্কারের জন্য তিনি ও তাঁর গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ম্যাকলিয়ড ১৯২৩ খৃঃ অব্দে নোবেল পুরস্কার পান। ম্যাকলিয়ডকে বিনা কারণে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় ব্যানটিং অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং পুরস্কারের নিজ অংশের অর্ধেক তাঁর

চিত্র ৬৫—প্রাচীন য়ুরোপে বস্তির প্রস্তরাপসারণ।

চিত্র ৬৬—রেম্‌ব্রাণ্ট্‌ অঙ্কিত শব ব্যবচ্ছেদের এক তৈলচিত্র।

চিত্র ৬৭—অবসাদক আবিষ্কারের পুর্বকালের নৃশংস অঙ্গচ্ছেদের এক চিত্র।

চিত্র ৬৮—ল্যুই পাস্তর

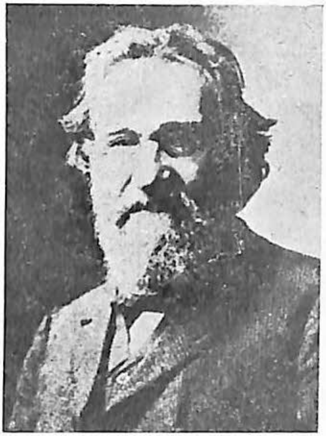

চিত্র ৬৯—এলি মেশ্‌নিকফ্‌।

চিত্র ৭০—রোবের্ট কোখ্‌।

চিত্র ৭১—এমিল্‌ ফন বেহ্‌রিং।

চিত্র ৭২—ফ্রেডেরিক্ ব্যান্‌টিং।

চিত্র ৭৩—স্যর রোণাল্ড রস্।

চিত্র ৭৪—লর্ড যোসেফ লিষ্টার।

গবেষণার সহকারী ছাত্র চার্লস বেষ্ট নামক এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। লজ্জিত ও বিব্রত ম্যাকলিয়ড নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য তাঁর পুরস্কারের অর্ধেক ব্যানটিং-এর অপর এক সহকারী কলিপ্‌কে প্রদান করেন। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে অনুরূপ হাস্যকর ঘটনা আর কখনো ঘটেনি!

চিত্র—৭২

অধুনা সর্বজনজ্ঞাত "কর্টিজোন্" নামক ঔষধ নালীবিহীন বৃক্কশীর্ষ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। কর্টিজোন-এর অভাবজনিত বহু কষ্টকর রোগের গবেষণা করে অষ্ট্রীয়-কানাডীয় বিজ্ঞানী ডঃ হান্স সেইলী আজ পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন।

চেতনা-নাশকের সন্ধানে

চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিকাল থেকে রোগী চিকিৎসককে আহ্বান করে আবেদন জানাত তার শরীরের বেদনা নিরসন করতে। প্রাচীন চিকিৎসক সেইজন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বেদনানাশক লতাগুল্মের অনুসন্ধানে। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাচীনতম অধ্যায়ে ধুতুরাজাতীয় মান্দ্রাগোরা (ম্যানড্রেক) ও গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন মিশরীয়গণও সেকথা জানতেন। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে মান্দ্রাগোরা ব্যবহৃত হত। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে গ্রীক চিকিৎসক আমোস গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় অবহিত হন। হেরোডোটুস বলেছেন যে, হাসিস্ বা গঞ্জিকার ধূম নিঃশ্বাসের সঙ্গে আঘ্রাণ করলে চেতনা লুপ্ত হয়। প্রাচীন চৈনিকগণ অহিফেনের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার করেন। ডিওস্কোরিডেস্ নামক গ্রীক মান্দ্রাগোরা (ধুতুরা জাতীয়) মূল দ্রাক্ষারসে সিক্ত করে প্রস্তুত নির্যাস দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করাতেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে অস্ত্রোপচারের পূর্বে অনেক সময় রোগীর গল-ধমনী (ক্যারটিড্ আরটারিস্) সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে রোগীকে অজ্ঞান করা হত। বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎসক জন হাণ্টার ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গচ্ছেদের পূর্বে অঙ্গটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে অবচেতন করতেন (হাইপোথার্মিয়া)। অবচেতক ভেষজাদি প্রস্তুতের পূর্বকালে শল্য-চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারে ছিলেন অতিশয় ক্ষিপ্র ও পারদর্শী। বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম চেসেল্‌ডেন মাত্র একমিনিট কালের মধ্যে মূত্রাশয় থেকে পাথুরী অপসারণ করতে পারতেন।

প্রকৃত অবচেতনা শাস্ত্রের (এ্যানেস্থেসিওলজি) জন্ম ইংরাজ রাসায়নিক

স্যার হাম্‌ফ্রী ডেভী কর্তৃক "হাস্যোদ্দীপক বাষ্প" (নাইট্রাস অক্সাইড) আবিষ্কারের পর থেকে। উক্ত বাষ্প সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন ডঃ রিগস্ নামক এক দন্ত চিকিৎসক তাঁর এক বন্ধু ডঃ ওয়েলস্ এর উপর। ডঃ জ্যাকসন ও মর্টন নামক দুই মার্কিনী চিকিৎসক "ইথার" নামক এক জৈব রাসায়নিক দ্বারা অবচেতন প্রথার প্রবর্তক। ডঃ লিষ্টন নামক ইংরাজ অস্থি শল্যচিকিৎসক ইংল্যাণ্ডে "ইথার" দ্বারা অবচেতন করে অস্ত্রোপচার করতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবার শহরের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সিম্পসন ক্লোরোফর্ম নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থের অবচেতনাকারক গুণের বিষয় নিরূপণ করেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ও তাঁর দুই সহকর্মী ডঃ কীথ ও ডঃ ডানকান্ নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের আঘ্রাণ নিতে নিতে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ করে অজ্ঞান হয়ে যান।

ঘটনাটির পর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমানে ক্লোরোফর্মের স্থান নিয়েছে সাইক্লোপ্রোপেন, টেট্রাক্লোর এথিলিন ও ফ্লুয়োথেন প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ।

রোগীকে অজ্ঞান করে যেভাবে তার দেহে অস্ত্রোপচার করা যায় ঠিক সেই-ভাবেই রোগীর দেহের রোগদুষ্ট স্থানবিশেষে "স্থানীয় স্পর্শলোপকারী" (লোকাল এ্যানেস্‌থেটিক্) প্রয়োগ করে বেদনাশূন্যভাবেও অস্ত্রোপচার করা যায়। পেরুদেশীয় সুসভ্য ইন্‌কারা "কোকা" নামক বন্য বৃক্ষের পত্র চর্বণ করে শরীরের বেদনাগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিত। বৈজ্ঞানিকগণ কোকা পত্রের রসে "কোকেন" নামক স্পর্শলোপকারী ভেষজের সন্ধান পান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার চক্ষু চিকিৎসক ডঃ কার্ল কোলের সর্বপ্রথম উক্ত কোকেন প্রয়োগ করে একটি রোগীর চক্ষুর উপর অস্ত্রোপচার করেন। তাঁর বন্ধু বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁকে উক্ত ঔষধ প্রয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বর্তমানে কোকেনের বিকল্পে এ্যামিথোফেন, প্রোকেন, লিগনোকেন ও ন্যুপারকেন ইত্যাদি ঔষধের সাহায্যে স্পর্শলোপ করা হয়। অবচেতনা ও স্পর্শলোপের ক্রমোন্নতি শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রকে বিস্ময়কর পর্যায়ে উন্নত ও নিরাপদ করেছে। বর্তমানে "স্নায়ু অবসাদন" বা "নিউরোলেপসিস্" নামক এক নতুন পদ্ধতিতে রোগীর জ্ঞান বজায় রেখেও তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে।

উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র মোরাভিয় ইহুদীর ঘরে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের জন্ম

হয়েছিল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীর বিখ্যাত স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ জ্যঁ মার্তিন সার্কো-এর অধীনে স্নাতোকত্তর চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণ করতে যান। সারকোর স্নায়ুতত্ত্বশাস্ত্রীয় জ্ঞানে বিমুগ্ধ ফ্রয়েড আজীবন স্নায়ুতত্ত্বশাস্ত্রাভ্যাস করতে মনস্থ করেন। ব্রেউয়ের নামক সারকোর এক ছাত্র মানসিক রোগ চিকিৎসায় সম্মোহন প্রয়োগের সম্ভাবনার বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্তা রোগিণীকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করে ব্রেউয়ের তার সঙ্গে কথপোকথন শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে রোগিণীর অব্যক্ত মনের বহু বাসনা প্রকাশ পায়। পুর্ণ চেতনা লাভের পর দেখা যায় যে, রোগিণী অত্যাশ্চর্যভাবে পক্ষাঘাত মুক্ত। উক্ত সাফল্যের পর ব্রেউয়ের ও ফ্রয়েড একযোগে বহু গবেষণা করে নির্ণয় করেন যে, মানুষের মনের অভ্যন্তরে বহু অব্যক্ত বাসনা ও চিন্তা লুক্কায়িত থাকে, ঐ সকল বাসনা বৈকল্যের জন্য মানুষ মানসিক রোগগ্রস্ত হয়। ফ্রয়েড বলতেন যে, সমীক্ষার দ্বারা অব্যক্ত বাসনা প্রকাশ করতে পারলে, মানসিক বৈকল্য দূর হয়। ভিয়েনা মানসিক হাসপাতালে তিনি তাঁর শিষ্যদ্বয় আদ্‌লের ও ইয়ুঙ্গ-এর সহযোগিতায় আরও গবেষণা চালান। হিটলার কর্তৃক ইহুদি বিতাড়নের আগে তিনি লণ্ডনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং পরিণত বয়সে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ সমস্যার সমাধান

খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ছয় শতাব্দী আগে সুশ্রুত বলেছিলেন যে, মশক দংশন করলে জ্বর হয়। খৃষ্টীয় প্রথম দশকে কলুমেল্লা নামক ব্যক্তিও অনুরূপ সন্দেহ করতেন। প্রাচীন রোমে জ্বর রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। রোমকগণ মনে করত যে, অপরিচ্ছন্ন জলাভূমি থেকে উত্থিত দূষিত বায়ু থেকেই উক্ত রোগের জন্ম। সেইজন্য তারা উক্ত জ্বরের নামকরণ করেছিল "মালারিয়া" বা দূষিত বায়ু। কালের পরিবর্তনে "মালারিয়া" ম্যালেরিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রীক চিকিৎসক হিপ্পোক্রাতেসও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ১৫ শতকের দক্ষিণ আমেরিকার য়ুরোপীয় অভিযাত্রীগণ লক্ষ্য করেন যে, ম্যালেরিয়ার ন্যায় জ্বর নিরাময়ের জন্য পেরুদেশীয় আদিবাসীরা এক প্রকার বৃক্ষের বল্কল চূর্ণ করে ভক্ষণ করতেন। আনুমানিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পেরুর স্পেনীয় শাসনকর্তা কাউন্ট্ সিন্‌কোনার পত্নীর সম্মানার্থে উক্ত বৃক্ষের নাম-

করণ করা হয় "সিন্‌কোনা"। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জঙ্গী চিকিৎসক আলফোঁস্ ল্যাভের্‌ঁ আলজিরিয়ায় অবস্থানকালে এক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে সর্বপ্রথম একপ্রকার কীট দেখতে পান। তিনি পরবর্তীকালে উক্ত আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মধ্যবর্তীকালে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক জিওভান্নি বাতিস্তা গ্রাসস্‌সি ও ইংরাজ চিকিৎসক রোনাল্ড রস্ ম্যালেরিয়ার কীটবাহক এনোফিলিস্ মশক আবিষ্কার করেন। ডঃ রস্ কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের (বর্তমান শেঠ্ সুখলাল কারনানি স্মৃতি হাসপাতাল) একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উক্ত যুগান্তকারী গবেষণা করেন। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত কক্ষটি আজও অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান। রোণাল্ড রস্ উত্তর প্রদেশের

চিত্র—৭৩

আলমোড়া শহরে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কারধারী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করায় পৃথিবীতে সিন্‌কোনা বল্কলের অত্যন্ত অভাব ঘটে। তজ্জন্য বৈজ্ঞানিকগণ সিন্‌কোনা বল্কলজাত কুইনাইন অপেক্ষা শক্তিশালী বহু ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার করেন। ম্যুলের নামক সুইজারল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক "ডি-ডি-টি" নামক মশক ধ্বংসকারী ঔষধ প্রস্তুত করায় মশক ও ম্যালেরিয়া উভয়ই পৃথিবী হতে প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। উক্ত আবিষ্কারের জন্য ম্যুলের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আফ্রিকা ও আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পীতজ্বর নামক একপ্রকার ভয়াবহ মশক বাহিত রোগ হয়। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ হিউজেস নামক চিকিৎসক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উক্ত রোগাক্রান্ত বহু রোগী দেখতে পান। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ত কর্তৃক হাইতি অভিযানে প্রেরিত ৩০,০০০ সৈন্যের মধ্যে প্রায় ২৩,০০০ পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমেরিকার আলাবামাবাসী ডঃ যোসুয়া ক্লার্ক নট্ লক্ষ্য করেন যে, মশক প্রধান অঞ্চলে পীতজ্বর বেশী হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হাভানার কার্লোস ফিন্‌লে নামক এক চিকিৎসক প্রচার করেন যে, পীতজ্বর সংক্রমিত "এডিস্ এগিপ্তি" নামক মশকের দংশন থেকে হয়। জেসি লাজিয়ের নামক এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় 'এডিস্ এগিপ্তি' মশক কর্তৃক দংশিত হন এবং পীতজ্বরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বিজ্ঞানীগণ

আরও লক্ষ্য করেন যে, কোনও স্থানে মানুষের মধ্যে পীতজ্বর মড়ক আরম্ভ হবার পূর্বে প্রথমে বানরেরা পীতজ্বরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীতজ্বর মূলতঃ বানরের রোগ এবং তার জীবাণু "এডিস্ এগিপ্টি" মশক কর্তৃক বানরের দেহ থেকে মানব শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জাপানী জীবাণুতত্ত্ববিদ্ হিদেও নোগুচি পীতজ্বরের জীবাণু নিয়ে গবেষণার সময় অসাবধানতাবশতঃ পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন এবং মাত্র স্বল্পকাল পরে তাঁর সহকর্মী ডঃ এড্রিয়ান ষ্টোকস্ ও ডব্লিউ ইয়ঙ্গও পীতজ্বরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁরা আজও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে সম্মানিত হন। ডঃ মাকস্ থেইলের নামক বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, পীতজ্বর থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর রক্তমস্ত (সিরাম) মূষিকদের শরীরে সূচিকাবিদ্ধ করলে রোগনিরোধক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। বহু বৎসর অক্লান্ত গবেষণার পর পীতজ্বর নিরোধক টীকা আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ রোগ প্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত। ডঃ থেইলের ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মশক বাহিত অপর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ "গোদ" এর কারণ নির্ণয়ও হয় উনবিশ শতকে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্যার প্যাট্রিক ম্যান্সন নামক নিদানতাত্ত্বিক উক্ত রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, গোদ রোগের কৃমি মশক দংশন দ্বারা মানব শরীরে প্রবেশ করে। গোদ রোগীর রক্ত পরীক্ষার কালে তিনি দেখতে পান যে, গোদের সূত্রানুকৃমি (মাইক্রো ফাইলেরিয়া) সন্ধ্যার পর থেকে রোগীর রক্তের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এক চৈনিক গোদ রোগী স্বেচ্ছায় ম্যানসনকে গবেষণায় সাহায্য করেন। ম্যানসন রোগীকে সন্ধ্যাবেলা একটি ঘরে আবদ্ধ করে সেই ঘরে কয়েকটি 'ষ্টিগোমাইয়া ফাটিগান্স' জাতীয় মশক ছেড়ে দেন। রোগীটিকে দংশন করবার পর মশকগুলির পাকস্থলীতে বহু সূত্রানুকৃমি পাওয়া যায়। সূত্রানুকৃমিনাশক বহু ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় ও "ডি-ডি-টি" দ্বারা ষ্টিগোমাইয়া মশক প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় গোদের প্রাদুর্ভাবও আজকাল হ্রাস পেয়েছে।

শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব

প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎসার ক্ষত শুকাবার প্রধান অন্তরায় ছিল জীবাণু সংক্রমণ। বহু প্রকার জীবাণু ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি ও

প্রাণনাশ করত। জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য প্রাচীন শল্য-চিকিৎসকগণ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অস্ত্রোপচার করতেন। এমন কি তাঁরা কার্যের পূর্বে হস্ত ও শল্য যন্ত্রাদি ধৌত করতেন না। ডঃ চার্লস বেল্ নামক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক মনে করতেন যে নিশ্চয়ই বায়ু মধ্যস্থ কোনও অদৃশ্য বস্তু অস্ত্রোপচারের ক্ষত দূষিত করে। তিনি উক্ত অজ্ঞাত বস্তুর নাম করণ করেন "পূতিবাষ্প"। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যোসেফ্ লিষ্টার (১৮২৭-১৯১২) নামক এক চিকিৎসক গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ডঃ বেলের মতবাদের বিষয় সর্বদা চিন্তা করতেন।

চিত্র — ৭৪

গ্লাসগোর রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ টমাস এণ্ডারসন-এর সঙ্গে লিষ্টারের পরিচয় হয়। লিষ্টারকে এণ্ডারসন লুই পাস্ত্যরের গবেষণার বিষয় অবহিত করেন। পাস্ত্যর বলতেন যে, উত্তাপ, পরিস্রাবণ ও উগ্র রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা জীবাণু ধ্বংস করা যায়। লিষ্টার সে সময়ে বহুল প্রচলিত জীবাণু নিরোধক কার্বলিক অম্লসিক্ত কাপড় দিয়ে অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থান বেঁধে রাখতেন, ফলে ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ অভাবনীয়রূপে হ্রাস পায়। শল্যগৃহের বায়ু জীবাণু-মুক্ত করবার জন্য বায়ুর মধ্যেও কার্বলিক-অম্ল ছিটান হত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লিষ্টার উদ্ভাবিত পদ্ধতি পূর্ণ সমর্থন করেন মিউনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-চিকিৎসার অধ্যাপক ডঃ ফন্ ন্যুস্‌বাউম্। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, সুশ্রুতের সময়ে শল্যচিকিৎসার পূর্বে শল্যকক্ষের অভ্যন্তর গন্ধক ও গুগ্‌গুল ধূম্র দ্বারা পরিশোধিত করা হত। শল্যচিকিৎসকরা স্নান করে রৌদ্র-স্নাত (ষ্টেরিলাইজড্) বস্ত্র পরিধান করতেন এবং হস্ত ধৌত করে অস্ত্রোপচার করতেন। তাঁদের যন্ত্রপাতি অগ্নিদগ্ধ করে পরিশোধন করা হত। সুতরাং লিষ্টারের যুগান্তকারী প্রচেষ্টার বহু পূর্বেই ভারতীয় শল্যচিকিৎসকেরা ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে লিষ্টার তাঁর প্রচেষ্টা ও ফলাফল ঘোষণা করেন। লিষ্টারের কৃতকার্যতায় মুগ্ধ হয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে প্রথমে নাইট, তারপর ব্যারণ ও সর্বশেষে লর্ড উপাধি প্রদান করেন। লিষ্টারই ইংল্যাণ্ডের সর্বপ্রথম "লর্ড" পদাভিষিক্ত চিকিৎসক। লিষ্টারের সমসাময়িক বের্লিনের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডঃ এরনস্ত ফন্ বের্গমান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবদ্ধ উচ্চচাপের বাষ্প সহযোগে জীবাণু নিধনের পন্থা উদ্ভাবন

করেছিলেন, যে পদ্ধতি "অটোক্লেভিং" নামে বর্তমানে বহুল প্রচলিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম হাল্‌ষ্টেড্ জীবাণুমুক্ত রবারের দস্তানা পরিধান করে অস্ত্রোপচারের রীতি প্রবর্তন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্যারীর সোরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে বৃদ্ধ পাস্তুর আনন্দবিহ্বল চিত্তে লিষ্টারকে চুম্বন করে অভিনন্দিত করেছিলেন। এক স্কটল্যাণ্ডবাসী ও অপর ফরাসীর আন্তরিক আলিঙ্গনের শুভক্ষণে সূচিত হয়েছিল আরও উন্নতশালী জীবাণুতত্ত্বের ভবিষ্যত।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইগনাৎস্ ফিলিপ জেমেল্‌ভাইস্ নামক এক হাঙ্গেরীয় যুবক ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উক্ত চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ রোগিনীই সূতিকাজ্বরে প্রাণত্যাগ করে। কিছুদিন পরে তিনি আবার লক্ষ্য করলেন যে, প্রসূতিশালার প্রথম কামরার রোগিনীদের মধ্যেই সূতিকাজ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। হাসপাতালের প্রচলিত প্রথা অনুসরে পথিপার্শ্বের প্রথম কামরায় রোগীনীদের চিকিৎসা ও প্রসব করাত পুরুষ ছাত্রেরা এবং পশ্চাদ্‌বর্তী কামরায় প্রসব করাত ধাত্রীগণ। হাসপাতালের বিপরীতে অবস্থিত শবব্যবচ্ছেদাগারে শবব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রেরা প্রসবাগারের মধ্যে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রসূতিগণের সান্নিধ্যে আসতেন। কিন্তু পিছনের কামরায় যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাজ করতেন ধাত্রীরা। জেমেল্‌ভাইস্ উক্ত জ্বরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একান্ত চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ কোলেট্‌স্কা এক রোগিনীর শবব্যবচ্ছেদ করবার সময় আঙ্গুলে আহত হয়ে সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত দুষ্ট হয়ে মারা যান। কোলেট্‌স্কার শবব্যবচ্ছেদের সময় জেমেল্‌ভাইস্ লক্ষ্য করেন যে, কোলেট্‌স্কার দেহের অভ্যন্তরে অবিকল সূতিকা রোগিনীর ন্যায় পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিশ্চয়ই শবব্যবচ্ছেদ-গৃহ হতে কোনও অদৃশ্য বিষাক্ত বস্তু শিক্ষার্থীগণের হস্ত

চিত্র—৭৫

দূষিত করে এবং তারা প্রসূতিগণের দেহে সেই দোষ সংক্রামিত করে। তিনি এক আদেশজারী করে শবব্যবচ্ছেদ-গৃহ প্রত্যাগত ছাত্রগণকে রোগিনীগণের সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেন। উক্ত আদেশের ফলে অতি সত্বর সূতিকাজ্বরে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে। এক প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশের পর তাঁর সহকর্মীগণ রুষ্ট হয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে

মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে ভিয়েনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে পদার্থবিদ্যার অবদান

জার্মান পদার্থবিদ্ হ্বিল্‌হেলম্ কন্‌রাড ফন্ রোয়েণ্টগেন কর্তৃক "রোয়েণ্টগেন রশ্মির" আবিষ্কারের পর চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি দ্রুততর হয়েছে। রোয়েণ্টগেন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন ও হল্যাণ্ডের য়ুট্রেখট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রথমে গীসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা রত হন এবং অতঃপর ভুয়ের্তস্‌বুর্গের অধ্যাপক কুন্দৎ এর অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে একটি ক্লার্ক কর্তৃক উদ্ভূত বায়ুশূন্য নলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে গবেষণা করবার সময় তিনি হঠাৎ এক অজ্ঞাত ও অদৃশ্য রশ্মি বা "এক্স-রে" এর সন্ধান পান। প্রথমতঃ রোয়েণ্টগেন্ চিকিৎসা ব্যবস্থায় উক্ত রশ্মি প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করেন নি। কিন্তু কালক্রমে উন্নত ধরনের রশ্মি বিচ্ছুরণকারী যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে রোয়েণ্টগেন রশ্মি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীকালে অধিক শক্তিশালী ও গভীর প্রসারী এক্সরে বা রোয়েণ্টগেন রশ্মির সাহায্যে কর্কট রোগ বা ক্যানসার চিকিৎসার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রোয়েণ্টগেন পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পদার্থবিদ্ অঁরি বেকারেল্ কোন কোনও মৌলিক পদার্থের গামা রশ্মি বিচ্ছুরণকারী ক্ষমতার

চিত্র—৭৬, ৭৭, ৭৮

বিষয় অবগত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদাম মারী কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী "গামা" রশ্মি বিচ্ছুরণকারী "রেডিয়াম" নামক এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। কর্কট রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম গভীর প্রসারী রোয়েণ্টগেন রশ্মির অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রস্থ হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বেকারেল ও কুরি দম্পতি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীকালে মার্কিন পদার্থবিদ্ আরনেষ্ট ওরলাণ্ডো লরেন্স কর্তৃক "সাইক্লোট্রোন" নামক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং উহা দ্বারা নতুন বিচ্ছুরক "সমঘর" (আইসোটোপ্) পদার্থ সৃষ্টি করে কর্কটরোগ চিকিৎসার ও রোগনির্ণয়ের প্রচুর সুবিধা হয়েছে। লরেন্স তাঁর আবিষ্কারের জন্য ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন।

চিত্র—৭৯

বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল্ এরলিখ্ কর্তৃক উপদংশ জীবাণু বিধ্বংসী স্যালভারসান নামক রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতের পর থেকে পৃথিবীর রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞগণ নতুন নতুন ঔষধ প্রস্তুতে সচেষ্ট হন। ডঃ এরলিখ্ নোবেল পুরস্কারে (১৯০৮) ভূষিত হন। ডঃ গেল্‌মো নামক এক অখ্যাত ভিয়েনাবাসী ফলিত রাসায়নিক প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোন অ্যামাইড নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। উক্ত পদার্থের অসাধারণ জীবাণু-বিধ্বংসী গুণের বিষয় তিনি বা অন্য কেউ জানতেন না। পদার্থটি পশমের বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার জন্য ব্যবহৃত হত। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিদানতত্ত্ববিদ ডঃ গেরহার্ড ডোমাগ উপরোক্ত পদার্থের অনুরূপ "প্রণ্টসিল" নামক এক পদার্থের অসাধারণ জীবাণুনিধক ক্ষমতার বিষয়ও আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে "প্রণ্টসিল" মানব শরীরের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা গেলমো কর্তৃক সৃষ্ট প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোন অ্যামাইড-এ রূপান্তরিত হয়ে জীবাণু ধ্বংস করে। ঔষধটি নিয়ে বহু গবেষণার পর সালফাথিয়াজল, সালফাডায়াজিন, সালফামেজাথিন, সালফাগুয়ানিডিন প্রভৃতি উন্নত ধরণের জীবাণু বিধ্বংসী ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে "ট্রাইমেথোপ্রিম্" নামক আরও উন্নত সালফা গোষ্ঠীর ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহয্যে সংক্রামক রোগের চিকিৎসা আরও সহজ হয়েছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ডোমাগ্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও ইহুদী বিদ্বেষী হিটলার ইহুদী-বংশোদ্ভব আলফ্রেড নোবেল প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণে ডোমাগ্‌কে বাধা দেন। পরবর্তীকালে ডোমাগ সুইডেনের নৃপতির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন।

চিত্র—৮০

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, অনাবৃত পাঁউরুটির উপর এক-প্রকার সূক্ষ্ম ছত্রাক জন্মায়। বহু সহস্র বৎসর ধরে অনাবৃত খাদ্যের উপর উক্ত ছত্রাক দেখা সত্ত্বেও মানুষ তার জীবাণু জন্মনিরোধক (এ্যান্টিবায়োটিক) গুণের বিষয় কল্পনাও করতে পারেনি। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম "পেনিসেলিউম্ নোটাটুম"। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের সেণ্ট মেরীস্ হাসপাতালের জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ডঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন যে অসাবধানতাবশতঃ একটি কৃত্রিম জীবাণুকর্ষণ ক্ষেত্রের এক কোণে একটি পেনিসেলিউম ছত্রাকের বসতি হয়েছে। ক্ষেত্রটিতে ষ্টাফাইলোকক্কাস্ নামক এক প্রকার জীবাণু কর্ষিত করা

হয়েছিল। দুই তিন দিন পরে উক্ত স্থান পুনরায় পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান যে, ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে ষ্টাফাইলোকক্কাস জন্মেছে কিন্তু কোনও এক

চিত্র—৮১

অজ্ঞাত কারণে পেনিসেলিউম্ ছত্রাকের বসতির পরিধি থেকে ষ্টাফাইলোকক্কাস অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ফলে ফ্লেমিং-এর মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হল। তিনি পূর্ণোদ্যমে অন্যান্য জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে কয়েক প্রকার জীবাণু পেনিসেলিউম ছত্রাকের সান্নিধ্যে আসলে তাদের বংশ বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে লণ্ডনের অধ্যাপক রাইষ্ট্রিক উক্ত ছত্রাক কর্ষণের উপযোগী এক তরল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। উক্ত তরল ক্ষেত্রে ছত্রাকটি কর্ষিত করবার পর ক্ষেত্রের জলীয় পদার্থের মধ্যে এক প্রকার শক্তিশালী জীবাণু জন্মনিরোধক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পেনিসেলিউম ছত্রাকজাত পদার্থটির নামকরণ করা হল "পেনিসিলিন"। পেনিসিলিন সহজ লভ্য করবার জন্য বহু পরীক্ষা চলতে লাগল। অক্সফোর্ড-এর প্রফেসর হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও তাঁর সহকারী ডঃ বরিস চেইন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেনিসিলিনের গাঢ় দ্রাবণ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন ঔষধ ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ ফ্লেমিং ও ফ্লোরি "নাইট উপাধি ভূষিত হলেন, এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ চেইন সহ তাঁরা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ফ্লেমিং এর সাফল্যে উৎসাহিত পৃথিবীর বহু ছত্রাক বিজ্ঞানী (মাইকোলজিষ্ট) নানাপ্রকার ছত্রাকের জীবাণু জন্মনিরোধ ক্ষমতা নিরুপণের জন্য গবেষণা শুরু করেন। রুশ-মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ সেল্মান ভাকস্মান "এ্যাকটিনোমাইকোসিস গ্রাইসিউস" নামক ছত্রাক থেকে যক্ষ্মা জীবাণু রোধক ঔষধ "স্ট্রেপ্টোমাইসিন" প্রস্তুত করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তী-কালে অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন ওলিয়াণ্ডোমাইসিন, ভায়োমাইসিন প্রভৃতি আরও ছত্রাকজাত ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। অরিওমাইসিন উৎপাদন প্রচেষ্টায় আমেরিকাবাসী ভারতজাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডঃ ইয়াল্লাপ্রাগাডা সুব্বারাও এর অবদান সর্বজন বিদিত।

বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা

মধুমেহ রোগের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত ঔষধ ইনসুলিন ও মস্তকে

বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা আক্ষেপ উৎপাদিত করে মানসিক রোগের চিকিৎসা বিংশ শতাব্দীর দুই বিস্ময়কর অবদান। ডঃ মানফ্রেড্ ফন্ সাকল্ নামক এক ভিয়েনাবাসী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মানসিক রোগীদের দেহে ইন্সুলিন সূচীবিদ্ধ করে রোগীর শরীরে মৃগী রোগীর ন্যায় আক্ষেপ উৎপাদিত করেন এবং উক্ত প্রকারে দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব রোগ (স্কিৎসোফ্রেনিয়া)-এর চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসাটি এখনও সুপ্রচলিত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বুদাপেস্তবাসী ডঃ ফন্ মেডুনা "লেপ্টাজোল" নামক ঔষধ প্রয়োগেও অনুরূপ আক্ষেপ চিকিৎসার উদ্ভাবন করেন। বর্তমানকালে রোগীর মস্তকে শক্তিশালী বিদ্যুৎতরঙ্গ দিয়েও আক্ষেপ চিকিৎসা করা হয়। ইতালীর ডঃ চেরলেত্তি ও ডঃ বেন্নি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পর্তুগালবাসী চিকিৎসক ডঃ এগাজ্ মোনিজ ও তাঁহার সহকর্মী ডঃ আলমেইডা লিমা মানসিক রোগীর মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ অপরাংশ হতে অস্ত্রোপচার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে মানসিক রোগ চিকিৎসার নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারের বৈজ্ঞানিক নাম "প্রিফ্রণ্টাল লিউকোটমী।" ডঃ মোনিজ্‌কে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় (১৯৪৯)।

বিগত দশ বৎসর কালের মধ্যে মানসিক রোগ চিকিৎসার উপযোগী বহু নতুন নতুন রাসায়নিক ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় চিকিৎসা পূর্বাপেক্ষা আরও সহজতর হয়েছে। উক্ত ঔষধসমূহ দ্বারা আজকাল রোগীকে মানসিক আরোগ্যশালায় আবদ্ধ না রেখেও সাফল্যের সঙ্গে দুরূহ মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায়। তাই আজ নিপীড়িত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানসিক রোগী আর বিশেষ দেখতেই পাওয়া যায় না।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিংশ শতকের অবদান

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রে বিংশ শতকে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। কন্‌রাড্ র‍্যোণ্টগেন্ "রঞ্জনরশ্মি" আবিষ্কার করে যে বিরাট সম্ভাবনায় সৃষ্টি করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে উত্তোরোত্তর নির্ণয়শাস্ত্রের আরও উন্নতি হয়েছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পর্তুগীজ স্নায়ুতত্ত্ববিদ ডঃ এগাজ্ মোনিজ্ ভিয়েনাবাসী দুই তরুণ শারীরস্থানবিদ্ হাসেক্ ও লিণ্ডেনথাল্-এর এক প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণায় জীবন্ত মানুষের ধমনী ও শিরার রঞ্জন চিত্রণের এক আশ্চর্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। পদ্ধতিটি এখন "এ্যান্‌জিওগ্রাফী" বা "শিরাধমনী

চিত্রণ" নামে অতি পরিচিত ও সুপ্রচলিত। উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা মস্তিষ্কের অর্বুদের স্থান আকার ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়।

বিংশ শতকের আর একটি আবিষ্কারও আজ বহুল প্রচলিত। ওলন্দাজ শরীর বিজ্ঞানী ভিলেম্ আইনথোভেন্ সর্বপ্রথম মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-

চিত্র—৮২

কলাপের বৈদ্যুতিক চিত্রণ করতে সমর্থ হন এবং তাঁর পদ্ধতি সারা পৃথিবীতে "ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাফী" বা "হৃদবিদ্যুৎচিত্রণ" নামে সর্বজনবিদিত। ডঃ আইনথোভেন্ ১৯২৪ খৃঃ অব্দে তাঁর আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ডঃ হানস্ বের্‌গের নামক এক জার্মান মনঃস্তত্ত্ববিদ আইনথোভেন প্রদর্শিত পথানুসরণ করে "মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ লেখন্" বা "ইলেকট্রো এন্‌সেফালোগ্রাফী" পদ্ধতি আবিষ্কার করে স্নায়ুতত্ত্বশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি করেছেন।

আমেরিকার মিশিগানবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বসুকুমার বাগচি উক্ত বিদ্যুৎলেখনের প্রভূত উন্নতি সাধন করে অমর হয়ে আছেন। তিনি প্রথম জীবনে সন্ন্যাসী ধীরানন্দরূপে আমেরিকা প্রবাসী হন। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও মস্তিষ্ক বিদ্যুৎলেখন শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি গৌরবের বিষয়। তাঁর রচিত মস্তিষ্ক বিদ্যুৎলেখনের বহু পুস্তক ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী। ডঃ বাগচীর ছাত্র ডঃ উন ও ডঃ কুই উভয়েই এখন পৃথিবী বিখ্যাত। তিনি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যোগসমাধি ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বিষয়ে গবেষণার জন্য ভারতে এসেছিলেন। তাঁর উক্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের মার্কিণ নভোচারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ লেখন বিভাগ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তরকালে বিদ্যুৎ-লেখনের পদ্ধতি আরও উন্নত হয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।

আইন্‌ষ্টাইন্, বোর, হাহন্ বোলৎস্‌মান্, মেইট্‌নের, ফের্‌মি প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ পরমাণু ভঙ্গীকরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করে একাধারে যেমন বিশ্ববিধ্বংসী পরমাণু বোমার সৃষ্টি করেছেন সেই সঙ্গে তাঁরা বহু "পরমাণু সমঘর" বা "আইসোটোপ" সৃষ্টি করে রোগ নিরূপণের এক নবতম অধ্যায় রচনা করেছেন।

আপনারা সবাই জানেন যে, "পরমাণু সমঘর" থেকে গামা রশ্মি নির্গত

চিত্র ৭৫—
ইগ্‌নাৎস্ ফিলিপ্‌ জেমেলভাইস্।

চিত্র ৭৬—
পিয়ের কুরী।

চিত্র ৭৭—মাদাম মারী কুরী স্ক্লদভ্‌স্কা।

চিত্র ৭৮—আঁরি বেকারেল্।

চিত্র ৭৯—আরনেষ্ট ওরলান্দো লরেন্স।

চিত্র ৮০—পাউল এরলিখ্‌।

চিত্র ৮১—স্যর আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

চিত্র ৮২—ভিলেম্‌ আইন্‌থোভেন্‌।

চিত্র ৮৩—অ্যালান্ কর্ম্যাক্।

চিত্র ৮৪—স্যর গড্‌ফ্রে হাউন্সফিল্ড।

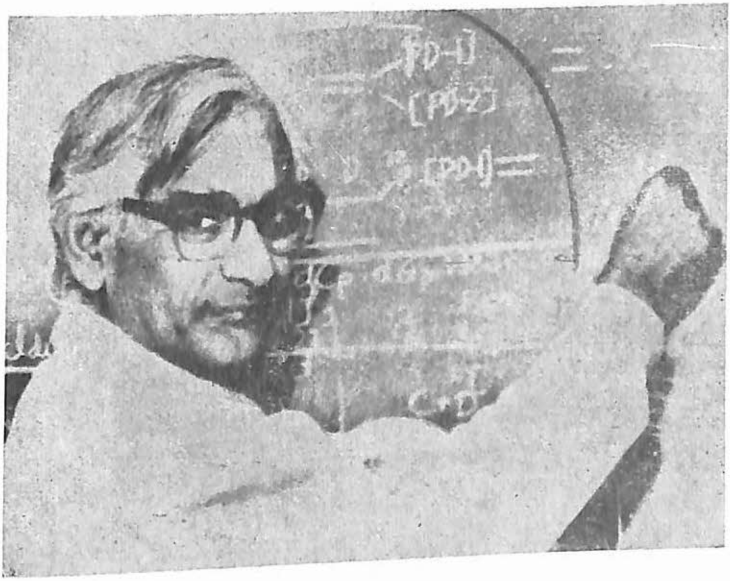

চিত্র ৮৫—হরগোবিন্দ খোরানা।

চিত্র ৮৬—নীলস্ বোহ্‌র।

চিত্র ৮৭—পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত।

হয়। কোন ব্যক্তির শরীরে কোন বিশেষ সমঘর সূচীবিদ্ধ করলে রোগগ্রস্থস্থানে তাহা রাশীকৃত হয় এবং গামারশ্মী বিকীরণ করতে থাকে। গামারশ্মী বিকীরণ নির্ণয়কারী যন্ত্রর দ্বারা উক্ত রোগগ্রস্থ স্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। উক্ত পদ্ধতির দ্বারা অর্বুদরোগ এবং কর্কটরোগ নিরূপণ করা অতি সহজসাধ্য হয়েছে। ইহা ব্যতীত কর্কটরোগের চিকিৎসায় বহু "সমঘর" ভেষজরূপেও ব্যবহৃত হয়। সমঘরের সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে। যাকে বলা হয় "নিউক্লিয়ার মেডিসিন" বা "পরমাণুকেন্দ্র চিকিৎসা"।

আমাদের সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাহিরেও শব্দতরঙ্গ আছে। যাকে বলা হয় "শ্রবণাতীত তরঙ্গ" বা "আল্ট্রাসনিক্ ওয়েভ্স্"। মানুষ সেই তরঙ্গ শুনতে পায় না। কিন্তু কুকুর বা অন্যান্য প্রাণী সেই তরঙ্গের স্বর শুনতে পায়। গোয়েন্দাগিরিতে সেই প্রকার শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টিকারী বাঁশির দ্বারা গোয়েন্দা-কুকুরকে অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা করা হয়। মাদাম মারী কুরী কর্তৃক আবিষ্কৃত "পিয়েৎজো ইলেক্ট্রিক ক্রিষ্টাল" নামক বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক "কেলাস" দ্বারা ঐ "শব্দাতিতরঙ্গ" বা "আল্ট্রাসনিক্ ওয়েভ্স" নিরূপণ করা যায়। সাধারণ শব্দ তরঙ্গের মত শব্দাতিতরঙ্গেরও প্রতিধ্বনি হয়। উক্ত বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর ভিত্তি করে ভিয়েনাবাসী ডুসিক ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রথম মানুষের মস্তিষ্কের অর্বুদের স্থান নিরূপণ করতে সক্ষম হন। অতঃপর সুইডেন দেশীয় স্নায়ুশল্যচিকিৎসক লারস্ লেক্সেল্ উক্ত রোগ নির্ণয় যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন এবং বর্তমানে উক্ত যন্ত্র মস্তিষ্ক রোগ, হৃদরোগ, রক্তনালী রোগ, অন্ত্ররোগ এবং শরীরের অপর যন্ত্রাংশের রোগ এমন কি গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের আয়তন ও গঠন বৈকল্য নিরূপণেও প্রভূত ফলপ্রসূ। উক্ত শাস্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে "একোগ্রাফী" বা "প্রতিধ্বনি লেখন"।

চিত্র ৮৩ ও ৮৪

ডঃ করম্যাক্ নামক এক দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী পদার্থবিদ্যাবিদ্ একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চিন্তার উদ্রেক্ হয়েছিল যে কি উপায়ে সাবেকী রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে শরীর পরীক্ষার আরও উন্নতি সাধন করা যায়। তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারার উপরে এক প্রবন্ধ লিখে এক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি অবহিত হলেন যে, ইংল্যাণ্ডের "হিস্ মাষ্টার্স ভয়েস্" বা ই. এম্. আই নামক বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যবসায়ী সংস্থার হাউনস্‌ফিল্ড নামক এক প্রযুক্তিবিদ্ করম্যাকের

মতানুগ এক যন্ত্র নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। করম্যাক্ সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র মারফৎ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের জানিয়ে দিলেন যে হাউনস্ফিল্ডের বহু পূর্বেই তিনি উক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কালক্রমে উক্ত যন্ত্র প্রকৃষ্টভাবে নির্মিত হল এবং বর্তমানে উহা "সিটি স্ক্যান" বা "কম্পূটারাইজড্ টমোগ্রাফী' নামে সর্বজন বিদিত। করম্যাক্ এবং হাউনস্ফিল্ড উভয়ে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত যন্ত্র দ্বারা শরীরের সকল প্রকার রোগাবস্থার চিত্রণ করা যায়। উক্ত চিত্রণ প্রথায় রোগীর শরীরে কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষত উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না।

পরবর্তীকালে আরও বহুপ্রকার সমধর্মীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে "নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক্ রেসোনেন্স্ টমোগ্রাফী", "প্রজিট্রন এমিশান্ ট্রান্সভারস টমোগ্রাফী", "ফোটন্ টমোগ্রাফী" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতের অন্তরালে আরও কত কি আবিষ্কার লুক্কায়িত আছে তাহা এখনও আমাদের ধারণাতীত।

বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা

অবচেতনা শাস্ত্রের উন্নতি ও জীবাণুনিরোধক ঔষধ আবিষ্কারের পরবর্তীকাল থেকে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের আমূল পরিবর্তন ও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এ যুগে শরীরের এমন কোন যন্ত্র বা অংশ নেই যার উপর সফলতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার করা যায় না। মস্তিষ্ক থেকে পদপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র নানাবিধ অস্ত্রোপচার করা যায়। কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র এবং শ্বাস প্রশ্বাস চালনের যন্ত্র (হার্টলাঙ্গ মেশিন) নির্মাণের পর থেকে সাময়িকভাবে হৃদ্পিণ্ডের কার্য স্থগিত রেখে তার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দুরূহ অস্ত্রোপচার করা হয়। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী শল্যচিকিৎসক ডঃ ক্রিষ্টিয়ান্ বার্ণার্ড্ সদ্য মৃত মানুষের হৃদ্পিণ্ড রোগগ্রস্ত অন্য মানুষের শরীরে সংস্থাপিত করে বিংশ শতাব্দীর শল্যচিকিৎসা জগতে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। সম্প্রতি এক মার্কিণ হৃদরোগীর বক্ষে সম্পূর্ণ কৃত্রিম এক হৃদ্যন্ত্র সফলতার সহিত সংস্থাপিত হয়েছে। বিখ্যাত মার্কিণ বৈমানিক কর্ণেল চার্লস্ লিণ্ডবার্গ-এর কল্পনাপ্রসূত ও কল্ফ্ নামক ওলন্দাজ চিকিৎসক কর্তৃক সৃষ্ট "কৃত্রিম বৃক্ক" বা "আর্টিফিসিয়াল কিডনী" যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মানুষের দেহ থেকে অন্যের দেহে সুস্থ বৃক্ক সংস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনঃ সংযোজন শল্যচিকিৎসার একটি অতি সাধারণ কার্যক্রম। আধুনিক শল্যচিকিৎসায় চিকিৎসকের পরম সহায়ক হয়েছে "শল্যচিকিৎসার অনুবীক্ষণ যন্ত্র" বা "অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ"। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম স্নায়ু বা রক্তনালীর সম্মিলন, মধ্য কর্ণের সূক্ষ্ম স্নায়ুর সংযোজন, অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টিগোচর বহির্ভূত শল্যচিকিৎসা সম্ভাব্য হয়েছে।

ডঃ বোভী নামক এক মার্কিণ পদার্থবিদ্যাবিদ "ডায়াথার্মী" নামে এক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। উক্ত যন্ত্রের দ্বারা অতি সহজে অস্ত্রোপচার ঘটিত রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে দুই ভারতীয়ের অবদান অসামান্য। ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে কর্মরত ভারত-

চিত্র ৮৬

মার্কিনী বিজ্ঞানী ডঃ হরগোভিন্দ খোরানা সর্বপ্রথম কৃত্রিম "জীন্‌" সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং সেই "জীন" একটি "ভিরোফাজ" জাতীয় জীবাণুর মধ্যে প্রবেশ করান। তিনি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত আবিষ্কার অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, উহার সাহায্যে ভবিষ্যতে কর্কটরোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে এবং হয়ত কৃত্রিম মানুষও সৃষ্টি করা যাবে। ডঃ আনন্দ চক্রবর্তী নামক অপর এক বাঙ্গালী ভারত-মার্কিণ বিজ্ঞানী তৈলভোজী একপ্রকার কৃত্রিম জীবাণু সৃষ্টি করেছেন। জীবাণু বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভবিষ্যত উক্ত আবিষ্কারের ফলে অতিশয় উজ্জ্বল হয়েছে। ভবিষ্যতে কৃত্রিম জীবাণু দ্বারা রোগ সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক জীবাণু ধ্বংস করে মানুষের জীবন পরিক্রমা আরও বৃদ্ধি করা যাবে এই আশা নিতান্ত অমূলক নয়।

কর্কটরোগের চিকিৎসার বিবিধ রাসায়নিকজাত ভেষজ ও হরমোন জাতীয় ভেষজ প্রয়োগও বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য অবদান। উক্ত ভেষজাদি প্রয়োগে দুরারোগ্য কর্কট রোগগ্রস্থদের প্রাণে এক নতুন আশার আলোকপাত হয়েছে।

১৯৩৩ খৃঃ অব্দে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯২২) দিনেমার পদার্থবিদ্‌

চিত্র—৮৬

নীলস্‌ বোর সর্বপ্রথম "লেসার" নামক শক্তিশালী পরমাণুজাত রশ্মির কথা

উল্লেখ করেন। আইন্‌ষ্টাইন্, টাউনস্, ব্যাসভ এবং প্রোখোরোভ্‌ও উক্ত পরমাণুজাত রশ্মির বিষয় গবেষণা করেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে মার্কিন পদার্থবিদ মাইমান চুনীমণিকার সাহায্যে "রুবিলেসার" রশ্মি উৎপাদন করতে সক্ষম হন। বর্তমানে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে "লেসার" রশ্মি অতি উপযোগী। উহার সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে অতি স্বল্প রক্তপাতে শল্যচিকিৎসা করা যায়। চর্মের কর্কট রোগগ্রস্থ অংশ লেসার রশ্মির সাহায্যে দাহন করলে রোগারোগ্য হয়। স্নায়ু ও অক্ষি শল্যচিকিৎসায় এখন "লেসার" রশ্মি বহুল ব্যবহৃত। "লেসার" রশ্মি প্রয়োগে কঠিন শল্যচিকিৎসা সহজসাধ্য হয়েছে। "অতিশৈত্য" প্রয়োগ করেও বহু দুরূহ অস্ত্রোপচার সহজ হয়েছে। উক্ত শৈত্য প্রয়োগ প্রণালীকে "ক্রাইয়ো সার্জারী" বা "অতিশৈত্য শল্যতন্ত্র" বলা হয়।

ভারতে য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন

পঞ্চদশ শতকে তৎকালীন পর্তুগীজ সম্রাট প্রাচ্যের ধনরাশি আহরণের জন্য পর্তুগাল-এর সমুদ্রচারী নাবিকগণের উপর চাপ দেন। বার্থোলামিউ ডায়াজ নামক নাবিক ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপ (উত্তমাশা) ঘুরে সমুদ্র পরিক্রমা করেন। ভাস্কো-ডা-গামা নামক অপর নাবিক ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনটি ক্ষুদ্র জাহাজ নিয়ে কেরালার কালিকট্ বন্দরে অবতীর্ণ হন। তৎকালে কেরালায় "জামোরিন" নামক রাজা রাজত্ব করতেন। ভাস্কো-ডা-গামা-র আগমনের বহু আগে থেকে কেরালায় "মোপ্‌লা" নামধেয় আরবী ব্যবসায়ীরা ব্যবসার উদ্দেশে বসতি স্থাপন করে। জামোরিন-এর কয়েকটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল যাদের তিনি আরবী বণিকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। মলয়ালী ভাষায় "মো পিল্লাই" শব্দের অর্থ জামাতা। সেই থেকে "মোপ্‌লা" শব্দের উৎপত্তি এবং বর্তমানে মলয়ালী মুসলমানদের 'মোপ্‌লা' বলা হয়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল-এর রাজা, পেড্রো আল্‌ভারেজ্ কাব্রাল্-এর নেতৃত্বে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বহু মোপ্‌লাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আফন্‌সো দে আলবুকার্ক বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া অধিকার করেন। গোয়া নগরীতে তৎকালে বৈদ্য নামধেয় আয়ুর্বেদজ্ঞরা চিকিৎসা করতেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ে গোয়া পরিদর্শন করে বলেছিলেন যে, দেশীয় চিকিৎসকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র পুস্তক অনুসারে চিকিৎসা করতেন। তাঁরা

চিত্র ৮৮—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর।

চিত্র ৮৯—ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ছাত্রচতুষ্টয়
(বাম হইতে দক্ষিণে ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল,
দ্বারকানাথ বসু ও সূর্যকুমার চক্রবর্তী)।

চিত্র ৯০—স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

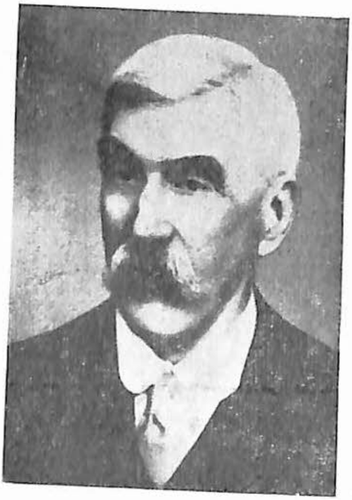

চিত্র ৯১—ডঃ লেওনার্ড রজার্স।

বিখ্যাত আরবী চিকিৎসক আল্ জাহ্‌রাভী বা আজ্ জাহ্‌রাভী লিখিত শল্যচিকিৎসা পুস্তক "কিতাব আল্ তস্‌রিফ্"-এর তিনটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ও উহার সরল বাংলা ব্যাখ্যা।

على هذه الصورة

ثم يلقط بمقص لطيف تلك العروق بلطف وتمسح الدم حينا
بعد حين حتى يرى العين قد ذهبت منها آثار العروق واجتذاب
الدم وتحفظ من القرنية يؤذيها بأطراف المقص ولكن
عملك نصف النهار بإزاء الشمس وتلبث في عملك جدا
جدا لئلا تقطع غير تلك العروق وعند فراغك فقطر
في العين الاشياف الاحمر او الاخضر لياكل حديه ما بقي من
السبل فان لم يمكنك لقط كله في تلك الساعة
فضمد العين بما يسكن المادة واتركها اياما حتى
يسكن المها وتأمن الورم واعد العمل على
الصفة بعينها حتى يبرأ ان شاء الله تعالى
وهذه صورة المقص

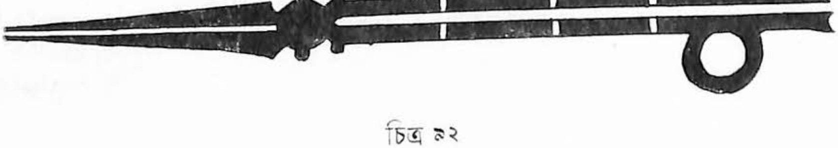

চিত্র ৯২

চিত্র ৯২—বাংলা ব্যাখ্যা ঃ

……তারপর তুমি উহাদের উপর কাঁচি প্রয়োগ কর কিন্তু অতিশয় হাল্কাভাবে এবং অতি সন্তর্পণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছতে থাক যেন রক্তের উৎস দেখা যায়। কাঁচি এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন রোগীর বেশী কষ্ট না হয়। এই অস্ত্রোপচার ঠিক রৌদ্রালোকিত মধ্যাহ্নে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ কাজে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করতে হবে যাতে অভিষ্ট শিরাটি ছাড়া অন্য কোনও তন্ত্রী কাটা না পড়ে। অতঃপর চোখে "আশয়ার-আস্‌মার" ও "আখয়ার" ফোঁটা ফোঁটা দিতে হবে ফলে দূষিত রস শোষিত হবে কেননা শুধুমাত্র অস্ত্রপ্রয়োগ করে দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করা যায় না। তারপর চোখটি বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দাও এবং কয়েকদিন বন্ধনী খুলো না। ব্যথা প্রশমিত হবে এবং ফোঁড়াটিও সেরে যাবে, যদি না হয় তবে পুনরায় অস্ত্রোপচার করতে হবে।

ইন্‌শাল্লাহ্‌

وهذه صورة المبضع

فإن كانت الرطوبة أزيد والورم أعظم فاجعلها شقين
متقاطعين على هذه الصورة

فإن كانت الرطوبة التي ذكرت تحت
العظم وعلامته أن ترى خياطات الرأس مفتوحة من كل
جهة والماء يغمز إذا عصرته بيدك إلى داخل وليس
يخفى عليك ذلك فينبغي أن تشق في وسط الرأس
ثلث شقوق على هذه الصورة
وبعد الشق تخرج الرطوبة كلها
ثم تشد الشقوق بالخرق والرفائد ثم تنطله من فوق
بالشراب والزيت إلى اليوم الخامس ثم تحل الرباط وتعالج
الجرح بالفتل والمراهم ولا تترك شد الرأس باعتدال
وتغذي العليل بكل غذاء جاف قليل الرطوبة إلى أن
يقوى العضو ويبرأ إن شاء
الله

চিত্র ২৩

চিত্র ৯৩—বাংলা ব্যাখ্যা ঃ

······কিন্তু যদি তরল দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং ফোঁড়া আবার বড় হয় তাহলে তাকে দুই অংশে খণ্ডিত কর······

যদি দূষিত পদার্থ পরিমাণে বেশী ও হাড়স্পর্শী হয় এবং তার লক্ষণ এই যে মস্তিষ্কের সমস্ত তন্ত্রীগুলি চারদিক থেকে শিথিল হয়ে গিয়েছে। তুমি সেই ক্ষতের মধ্যে আঙ্গুল দিলে উত্তাপ অনুভব করবে।

অস্ত্রোপচার করবার পর সমস্ত দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করে দাও এবং ক্ষতটি "হুরুক" এবং "ফায়েদ" দিয়ে জোরে বেঁধে দাও। পাঁচদিন পর সেই বন্ধনীগুলিকে আল্ কোহল্ কিংবা তেল দিয়ে ভিজিয়ে খুলে দাও এবং মলহম্ পটি দিয়ে ক্রমান্বয়ে চিকিৎসা চালাও।

রোগীকে শুষ্ক এবং অপেক্ষাকৃত নীরস খাদ্য খেতে নির্দেশ দেবে। ইন্‌শাল্লাহ্ রোগীর দেহে শক্তি ফিরে আসবে এবং রোগ নিরাময় হবে।

ان كان قد كوى الكية الواحدة التي وصفنا فلم ينفعه شيء من
ذلك فانظر فان كان بالعليل قوة البنية بالسمع ولم يكن
ضعيفا وكان تجد بردا شديدا فاكوه كية اخرى فوق
تلك قليلا ثم اوبد على كل قرن من راسه كية بعد ذهاب الجلد
وتكشف من العظم الذي وصفنا واكوه كية في مؤخر راسه
في الموضع الذي يعرف بالناس وخفف يدك في ميل ولا
تكشف العظم فان العليل تجد لها الما شديدا خلاف الم سائر
كيات الراس كلها وساذكر هذه الكية في موضعها
ان شاء الله . وينبغي ان تكون المكواة التي تكوى بها قرنا الراس
ومؤخره الطف من المكواة التي تكوى بها وسط الراس
وهذه صورتها

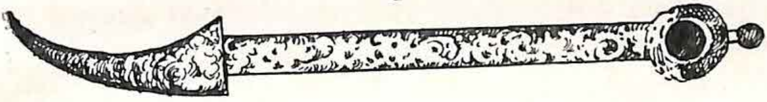

الفصل الثالث

في كي الشقيقة المزمنة

চিত্র ২৪

চিত্র ৯৪—বাংলা ব্যাখ্যা ঃ

……যদি একবার "দাগা" দেবার পর তা ফলপ্রসূ না হয় তাহলে দেখা দরকার যে রোগী স্বাভাবিকভাবে অতি শক্তিশালী বা অতি দুর্বল কিনা। যদি সে শীত অনুভব করে তবে তার মাথার সম্মুখের দুই অংশে আবার "দাগা" দিতে হ'বে। "দাগা" কিন্তু কদাচ হাড় পর্যন্ত প্রসারী হবে না, কেননা তাতে রোগী ভীষণ কষ্ট পাবে। "মেক্ওয়া" মাথার চতুষ্পার্শ্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি ঠিক সেইরূপ।

নীচের ছবিটি "দাগা' যন্ত্রের।

শারীরস্থান বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন এবং শবব্যবচ্ছেদ-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বেনিয়ে ফরাসী দেশের বিখ্যাত মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৫৫৮ বা ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সুরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন এবং মুঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক দারা শিকোহ্ নিহত হবার পর তিনি অপর এক ফরাসী ভারত পরিব্রাজক তাভেরনিয়ে-এর সঙ্গে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। দারা শিকোহ্-এর অন্যতমা এক পত্নীর মুখাবয়বে এক দুষ্ট স্ফোটকের চিকিৎসা করে বেনিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

চার্লস ডেলোঁ নামক অপর এক ফরাসী পরিব্রাজক বলেছেন যে, পণ্ডিত নামধেয় পৌত্তলিক ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান ব্যতীতই চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। তাদের কাছে বংশানুক্রমিক সূত্রে প্রাপ্ত কিছু ভেষজাদি ও চিকিৎসা কল্প বিধি ছিল। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে গার্সিয়া দে অর্তা নামক বিখ্যাত ইহুদি বংশজাত পর্তুগীজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন এবং রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। তিনিই গোয়াতে পাশ্চাত্য মতে চিকিৎসা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। মেস্ত্রে ইয়োহান নামক এক জার্মান শল্যচিকিৎসক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে এসেছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ ভারতে আগমনকারী প্রথম য়ুরোপীয় শল্য চিকিৎসক। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে গন্‌সালো ফেরনান্দেজ্ নামক অপর এক পর্তুগীজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন ও স্বল্পকাল বাস করেন, তাঁর সময়ে গোয়ার ভেষজ ব্যবসায়ী ছিলেন গ্যাস্‌পার পিরেজ ও টমে পরেজ। পরবর্তী কালে গ্যাসপার পিরেজ নিজামের রাজসভায় পর্তুগাল এর রাজদূত নিযুক্ত হন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায় যে গোয়া অঞ্চলের বায়ু অত্যন্ত বিষাক্ত ছিল। কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসরের মধ্যে সেখানকার জন সংখ্যা ৪০০,০০০ থেকে মাত্র ৪০,০০০ এ নেমে আসে। ১০ জন পর্তুগীজ রাজ্যপাল গোয়াতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তৎকালে সেখানে "মর্দেখিন্" নামক এক ভয়াবহ জর ব্যাধির প্রকোপ ছিল। "মর্দেখিন" জরে আক্রান্ত হলে মৃত্যুই ছিল একমাত্র পরিণতি। আপাতদৃষ্টিতে মর্দেখিন বর্তমানের ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সন্ত ফ্রানন্‌সিস জাভিয়ের এর মরদেহ সুদূর চীনদেশের সান্‌চিয়াম্ থেকে গোয়াতে আনীত হয়েছিল। গোয়ার নারী চিকিৎসকদের মধ্যে দোনা হুলিয়ানা-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে তিনি তিনি মুঘল

সম্রাট আকবরের হারেমের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ সরকার ভারতীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসা ব্যবসায় বাতিল করে দেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের উক্ত চিকিৎসকদের নিকট চিকিৎসা না করার জন্য এক নিষেধনামা প্রচার করা হয়।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে নিকোলাউ মানুচ্চি নামক এক ভেনীসিয় যুবক লর্ড বেলামণ্ট নামক ইংরাজের সঙ্গে সুরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দারা শিকোহ্-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি দুইবার গোয়া পরিদর্শনে যান ও কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করেছিলেন। দারা শিকোহ্ নিহত হবার পর তিনি আগ্রা সহরে বেশ জাঁকিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা করতে সুরু করেন। তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার কোনও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তিনি সপ্রতিভতা ও বাক্‌চাতুরীর সাহায্যে রোগক্লিষ্টদের মনে আশার সঞ্চার করতে পারতেন। ১৬৭১-১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লাহোরবাসী ছিলেন এবং ১৬৭৮-১৬৮২ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের অধীনের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ সহরে পৌর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। "ষ্টোরিয়া দো মোগর" বা মুঘল কাহিনী নামক পুস্তক রচনা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি ঐ পুস্তকে লিখেছেন যে, শিকান্দর বেগ্ নামক এক আর্মানী দারার পুত্র সুলেমান শিকোহ্-এর চিকিৎসক ছিলেন এবং বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহান-এর চিকিৎসক ছিলেন মুকার্‌রাম খান্ নামক এক পারসিক। এছাড়া দিনেমার ইয়াকব্ মিনুস ও গেল্‌মের ফোরবুর্গ, ফরাসী লুই বেইসো, গুস্ত্রেমঁ ও কাতেন্ এবং ভেনিসীয় আঞ্জেল্লো লেগ্রেঞ্জি প্রভৃতি য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সভা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে মঃ ফাঁসোয়া দ্য লা পালিস্ মুঘল দরবারে এবং মঃ ক্লডিয়ুস্ মালে এলাহাবাদের শাসকের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭১৫-১৭১৬ পর্যন্ত মুঘল সম্রাট ফারুখ শিয়ার-এর চিকিৎসক ছিলেন মঃ মার্তিন। পরবর্তীকালে তিনি বাহাদুর শাহ ও মহম্মদ শাহ্-এর অধীনেও চাকুরী করেছিলেন। মহীশূর-এর নবাব হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের চিকিৎসক ছিলেন জঁ্য মার্তিন নামক ফরাসী।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী পরিব্রাজক জঁ্য বাপ্তিস্তে তাভেরনিয়ে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর পিতা গাব্রিয়েল তাভেরনিয়ে ভূগোল-বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতার উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় জঁ্য বাপ্তিস্তে ছয়বার প্রাচ্য পরিক্রমা করেছিলেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইস্পাহান হয়ে তিনি

ভারতে আসেন এবং সুরাট, আগ্রা, গোয়া, গোলকুণ্ডা ও ঢাকা প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করেন। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্বতন বাংলার লোহার ডাগা সহরে এসেছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "লুভেল্লে রেলাসিওঁ দু সেরেইল দু গ্রঁ াদ্ সিনিয়র" নামক গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞতার মনোরম বিবরণ রেখে গেছেন। ইংরাজীতে ভাষান্তরিত গ্রন্থটির নাম "তাভেরনিয়েরস্ ট্রাভেল্স ইন ইণ্ডিয়া"। তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন যে, তৎকালীন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় রাজকীয় চিকিৎসক ছিল কিন্তু জনসাধারণ চিকিৎসার অভাবে মারা যেত। গৃহস্থবধূরা বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে টোটকা বনৌষধি সংগ্রহ করতেন ও গৃহ চিকিৎসায় প্রয়োগ করতেন। বড় বড় গ্রামে ও গঞ্জে ভেষজ ব্যবসায়ীরা লতাগুল্ম বিক্রী করত এবং অনুপানের ব্যবস্থাপত্র দিত। পিটার্ ডেলান্ নামক এক ওলন্দাজ গোলকুণ্ডায় সভা চিকিৎসক ছিল। তাভেরনিয়ে-এর পরবর্তীকালে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ফ্রঁসোয়া বেনিয়ে, লে জঁ্য থেভেনো, জন্ চারদিন্, কারে, জন ফ্রেয়ার ও মানুচ্চি। জন্ ফ্রেয়ার ছিলেন ইংরাজ, তিনি ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা উচ্চ ছিল না।

ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনা করতে পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ও ফরাসীরা বিশেষ সফলতা লাভ করে নি। কিন্তু বিচক্ষণ ও কুটবুদ্ধি ইংরাজরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের ছদ্মবেশে ক্রমে ক্রমে ভারতের মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জেমিসন্, ডঃ ব্রিটন ও ডাঃ ট্রেলার নামক তিনজন ব্রিটিশ চিকিৎসক ভারতীয়গণকে য়ুরোপীয় চিকিৎসাশিক্ষাদানের বিষয় উদ্যোগী হন। প্রথমতঃ হিন্দু ছাত্রদের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ও মুসলিম ছাত্রগণকে কলিকাতা মাদ্রাসায় পারসীক ভাষায় মাধ্যমে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। ইতিপূর্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের নিকটবর্তী ডুলানদহ গ্রামে একটি বৃহৎ য়ুরোপীয় আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত স্থানে ফাদার কিরনান্দার নামক এক সুইডেন দেশীয় ধর্মযাজকের আশ্রম ছিল। আরোগ্যশালাটি প্রথমে জেনারেল হাসপাতাল ও পরে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল এবং বর্তমানে শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল নামে পরিচিত। উক্ত হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগ বহনকারী মশক সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করে ভারতজাত ইংরাজ চিকিৎসক রোণাল্ড রস্ ১৯০২

খৃষ্টাব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ চার বৎসর পাঠের পর ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া

চিত্র—৮৭

হত। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত নামক বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ছাত্র সর্বপ্রথম মানুষের শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে তোপধ্বনি করা হয়েছিল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজকীয় শল্যচিকিৎসক সংস্থা ও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সমিতির পাঠ্যক্রমের অনুকরণে শিক্ষার কাল বর্ধিত করে পাঁচ বছর করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর নামক বাঙ্গালী চিকিৎসক কলিকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম বেসরকারী চিকিৎসা

চিত্র—৮৮

মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বৃটিশ রাজত্বকালে বিদ্যালয়টি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

চিত্র—৮৯

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ভোলানাথ বসু, ডাঃ গোপাল চন্দ্র শীল, ডাঃ দ্বারকানাথ বসু ও ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তী নামক বাঙ্গালী ছাত্র চতুষ্টয় উচ্চমানের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। বাঙ্গালী ধনী ও বিদ্যোৎসাহী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মুর্শিদাবাদ এর নবাব সাহেব উক্ত ছাত্রদের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। প্রথমোক্ত তিন জন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন এবং শেষোক্ত জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভেষজশাস্ত্রে প্রথম এম ডি হন ডঃ চন্দ্রকুমার দে, শল্য-চিকিৎসায় প্রথম এম এস্ হন মিঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধাত্রীবিদ্যার প্রথম এম্ ও হন ডাঃ সতীনাথ বাগচী। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত নিদানতাত্ত্বিক ডঃ লিওয়ার্ড রজার্স, কলিকাতায় স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন স্থাপনা করেন।

চিত্র—৯০

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মার্কিন ধনবীর রকিফেলার-এর বদান্যতায় কলিকাতায় ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ হাইজিন্ এণ্ড পাব্‌লিক হেলথ স্থাপিত হয়।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনার অব্যবহিত কাল পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও অনুরূপ কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতের সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত হয়। বাঙ্গলার সুসন্তান ও দেশবরেণ্য ভারতরত্ন চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায় উক্ত প্রচেষ্টায় প্রধান উদ্যোক্তা।

ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও স্যর কেদারনাথ দাশ প্রভৃতির নাম বিশ্ববিখ্যাত। স্যর উপেন্দ্রনাথ ভয়াবহ কালাজ্বর

চিত্র—৯১

রোগের ঔষধ "য়ুরিয়া ষ্টিবামিন" আবিষ্কার করে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন।

য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমোন্নতি ও অবহেলাজনিত ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমাবনতির জন্য কালক্রমে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আজ প্রায় ঐতিহাসিক ঘটনার পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। কেবলমাত্র ভবিষ্যতদ্রষ্টারাই বলতে পারেন যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার উৎকর্ষ কবে আবার প্রাচীন গৌরব ফিরে পাবে।

পরিশিষ্ট

সরল বাংলা ব্যাখ্যা সহ কতিপয় প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি

আয়ুর্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা।
ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ॥ ১
যান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
রোগীস্যাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরূপ্যতে॥ ২

(চরক চিকিৎসা ১৫। ১-২)

ব্যাখ্যাঃ দেহের অগ্নিজনিত ফল হ'ল—আয়ু, গাত্রবর্ণ, শক্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্থূলতা (উপচয়), উজ্জ্বলতা, ব্যাধি প্রতিরোধকারী ক্ষমতা (ওজঃ), প্রাণপ্রাচুর্য (তেজ) ও খাদ্যবস্তু জীর্ণ করার দাহিকাশক্তি (অগ্নি)। ১

শরীরগত অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীরে যদি এই অগ্নি যুক্ত থাকে, তবে মানুষ চিরজীবি ও নীরোগ হয়। বিকৃতি প্রাপ্ত হ'লে, মূল অগ্নির উপসর্গ কি কি হয়, তাহা নিরূপণ করা হচ্ছে॥ ২

আমাশয়গতঃ আহারঃ পাকং প্রাপ্য পক্তুমারব্ধঃসন্ পশ্চাৎ
পচ্যমানানায়ে কেবলং কৃৎস্নং পরিসমাপ্তং পাকং প্রাপ্যপশ্চাৎ
পাকঃ কিট্টমূত্রপুরীষয়োঃ পৃথগ্‌ভাবেন পক্কাশয়ে গমনাৎ
পৃথগ্‌ভূত্বা সারভুতো রসাখ্যো দ্রবরূপঃ সন্ রসাদিবাহিনীভি ঃ
ধমনীভিঃ স্রোতোভিঃ পশ্চাৎ সর্ব্বাশয়ং রসরক্তাদিধাত্বাযায়ং প্রপদ্যতে॥

(চরক বিমান ২। ২৪)

ব্যাখ্যাঃ পাকস্থলীতে খাদ্য বস্তু গেলে পাকক্রিয়া দ্বারা পক্ক অর্থাৎ হজম হ'তে সুরু করে। পরে পাকাশয়ের সেই সমস্ত বস্তু কিট্ট অর্থাৎ মলমূত্র থেকে পৃথক্ হ'য়ে সারবস্তুতে পরিণত হয়। সারবস্তু রস নামে পরিচিত। রস আবার দ্রবীভূত হ'য়ে রসবাহিকা ধমণী-স্রোতের মধ্য দিয়ে রস, রক্ত, ধাতু ইত্যাদি রূপে শরীরের সর্বস্থানে পরিচালিত হয়।

অগ্ন্যধিষধনেমন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণীমতা।
নাভেরুপরি সা হ্যগ্নিবলোপস্তম্ভবৃংহিতা॥
অপক্কং ধারয়ত্যন্নং পক্কং সৃজতি চাপধ্যঃ
দুর্ব্বলাগ্নিবলাদ্দুষ্টাদামমেব বিমুঞ্চতি॥

(চরক চিকিৎসা ১৫। ৫৩-৫৪)

ব্যাখ্যা : নাভির উপরে অগ্নির স্থান। অগ্নির এই স্থানকে গ্রহণী বলা হয় কেননা ইহা খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। গ্রহণীকে অগ্নি ধরে আছে। অপরিপক্ক খাদ্যবস্তুকে পরিপক্ক ক'রে নিম্নদেশে নামিয়ে দেয়। ভক্ষিতদ্রব্য দুর্বল অগ্নিদ্বারা দূষিত হ'লে মলরূপে গ্রহণী তাকে ত্যাগ করে।

ত্বক্‌পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোহয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈব বর্ণ্যতেহঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিসংশয়ং জ্ঞানং চ শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্‌ দ্রষ্টব্যোঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্‌॥ (সুশ্রুত-শারীরস্থান ৫।৪৯)

ব্যাখ্যা : শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনকি ত্বকের সম্পূর্ণ জ্ঞান শল্যবিদ্যা ছাড়া বর্ণনা করা যায় না। তাই শল্যবিদ্যার জ্ঞান নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয়। মৃতদেহ শোধনের পর শল্য প্রয়োগ করে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা উচিত। এভাবে প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্রবিদ্যা উভয়ে মিলিত হ'য়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি।
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্ব্বাণো ন প্রমুহ্যতি কর্মসু॥
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছনং শাস্ত্রক্ষারাগ্নি কর্মসু।
যস্য যত্রেহ সাধর্ম্মং তত্র যোগ্যং সমাচয়েৎ॥
(সুশ্রুত-শারীরস্থান ৯।৪-৫)

ব্যাখ্যা : এভাবে মেধাবী চিকিৎসক উপযুক্ত প্রাথমিক দ্রব্যগুলির উপর এ বিদ্যা (শল্যবিদ্যা) নিয়মিত প্রয়োগ করে কখনও মোহগ্রস্ত হ'ন না। তাই যিনি শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্মের কৌশল যেখানে আরও আয়ত্ব করিতে ইচ্ছুক, তিনি সেখানে নিজের ধর্ম অর্থাৎ বিদ্যার প্রয়োগ করবেন।

তস্মাৎ সমস্তগাত্রমধিধোপহতম্‌ দীর্ঘব্যাধিপীড়িতম্‌ কর্ষশতিকং
নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং
মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীমন্যত মেনাবেষ্টিতাঙ্গমপকাশো দেশো কোথয়েৎ।
সম্যক্‌ প্রকুয়িতঞ্চোদ্ধৃত্য ততো দেহং সপ্তরাত্রা—
দুশীরবালবেণুবল্কল কুঞ্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈঃ
অবঘর্ষয়নং ত্বগাদীন্‌ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গ—
প্রত্যঙ্গবিশেষন্‌ লক্ষয়েচ্চক্ষুষা। (সুশ্রুত শারীরস্থান—৫।৫০)

ব্যাখ্যা ঃ তাই এমন একটি লোকের শব নিতে হ'বে যে দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করেনি, যাকে হত্যা করা হয়নি অথবা যে শতায়ু নহে। তারপর অন্ত্র থেকে সমস্ত মল বের করে দিয়ে সেই দেহটি একটি পিঞ্জরের মধ্যে রেখে, মুঞ্জ, কুশ, শণ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে। তারপর দেহটি বদ্ধ জলাশয়ে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সাতদিন পরে দেহটি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেলে, জল থেকে দেহটি তুলে উশীর, বাঁশ অথবা চুলের তৈরী তুলিকা দিয়ে ত্বক্ ইত্যাদি ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলতে হ'বে। তারপর দেহটির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহির ও ভিতর নিজের চোখে দেখতে হ'বে।

অধিগত সর্বশাস্ত্রার্থমপি শিষ্যং যোগ্যং কারয়েৎ।
স্নেহাদিষু ছেদাদিষু চ কর্মপথমুপদিশেৎ।
সুবহুশ্রুতপ্যকৃতযোগ্যঃ কর্মস্বযোগ্যো ভবতি।
তত্র পুষ্পফলালাব কালিন্দকত্রযুসৈর্বাযক কর্কাটক—
প্রভৃতিষু চ্ছেদ্যবিশেষন্ দর্শয়েচ্ছন্
কর্ত্তনপরিকর্ত্তানানি চোপদিশেৎ। দৃতিবস্তিপ্রসেবক—
প্রভৃতিষুদক পঙ্ক পূর্ণেযুমেদ্যযোগ্যাম্ সরোম্নি চর্মণ্যাততে
লেখ্যস্য মৃতপশুশিরাসুত্‌পলনালেষু চ বেধ্যস্য
ঘুণোপহতকাষ্ঠবেনুমলনালোশুষ্কালাবুমুখেস্বস্থস্য
পনসবিম্বোবিল্বফলমজ্জমৃতপশুদন্তেষ্বাহার্যস্য
মধুচ্ছিষ্টোপলিপ্তে শাল্মলীফলকে বিস্রাব্যস্য
সূক্ষ্মঘনবস্ত্রান্তয়োর্মৃদুচর্মান্তয়োশ্চ সৌব্যস্য,
পুস্তময়পুরুষাঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষেষু বন্ধযোগ্যাং
মৃদুমশাংপেষীযু উৎপলানেষু কর্ণসন্ধিবন্ধযোগ্যাম্
মৃদুষুমাংসখণ্ডেষ্বগ্নিরক্ষারযোগ্যাম্ উদকপূর্ণঘট—
পার্শ্বস্রোতসি অলাবুমুখাদিষু চ নেত্র প্রণিধান—
বস্তিব্রণবস্তি পীড়ণ যোগ্যামিতি॥ (সুশ্রুত সংহিতা ৯/২-৩)

ব্যাখ্যা ঃ সমস্ত শাস্ত্র ভাল করে আয়ত্ব করার পরে ছাত্রকে (শল্য) চিকিৎসায় পারদর্শী করান উচিত। দেহে তরল পদার্থের সূচিপ্রয়োগ ও অস্ত্রোপচার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ দেখতে ইচ্ছুক ছাত্রকে প্রথমে পুষ্পফল, অলাবু (লাউ), তরমুজ, শশা, কাঁকুড় ইত্যাদি ফল কেটে-কেটে শেখাতে হবে। শরীরের গভীর অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার করতে হ'লে জলভরা

চামড়ার থলি, পশুর মূত্রাশয় অথবা অন্য কোনও থলিতে জল পূর্ণ করে ভেদন করতে হ'বে। লোমশ চামড়াতে ঘর্ষণ প্রয়োগ, পদ্মনালের সাহায্যে মৃত পশুর শিরায় রক্তমোক্ষণ, শলাকা দিয়ে পরীক্ষা ও ক্ষতস্থান পূর্ণ করার জন্য ঘুণধরা কাঠ, বাঁশ অথবা শুকনো লাউয়ের মুখের ব্যবহার, বিম্বী, বেল, কাঁঠালবীজ মৃতপশুর দন্তে উৎপাটন প্রণালীর প্রয়োগ, সিমুল কাঠের তক্তার উপর মোম মাখিয়ে ক্ষরণ বা শূণ্যীকরণ, সূক্ষ্ম বা ঘনবস্ত্র বা পাতলা চামড়া দিয়ে ক্ষত জোড়া লাগানো, পুতুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর ক্ষত বন্ধনের চর্চা। নরম মাংস-পেশীতে পদ্মনালের সাহায্যে কর্ণসন্ধি শিক্ষা, নরম মাংসখণ্ডে অস্ত্রচিকিৎসার তপ্তলৌহ অথবা ক্ষারের প্রয়োগ আর জলপূর্ণ ঘটের সঙ্কীর্ণ ফাটলে ক্ষত দূরীকরণ বা সূচিপ্রয়োগের শিক্ষণ করা উচিত।

গ্রীক

"হিরোফিলোস্ দে এন্ তো দিয়াইএটিকো কাই সোফিয়েন ফেসিন আনেপিদেইকেতন কাই তেখেন কাই ইস্‌খুন আস্তোগেনিস্তন কাই প্লুতোন আখেরেইওন কাই লোগন আহ্নাতন আপোউসেস্।"

ব্যাখ্যা: স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কলা, বিজ্ঞান, বাগ্মিতা, বিত্ত ও শৌর্য সবই অর্থহীন।

হিরোফিলোস

লাতিন

"মর্ত্তুই ভিভোস দোসেন্ত্"

মরগান্নি

ব্যাখ্যা: মৃত্যুই জীবনকে শিক্ষা দেয় অর্থাৎ এক রোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ অন্য ব্যক্তির দীর্ঘজীবন লাভের পথপ্রদর্শক।

জিওভান্নি বাতিস্তা মরগান্নি

Quotes from "The CANON OF MEDICINE OF AVICENNA (*QUANOON EL FIT TIBBI)* O. Cameron Gruner, Augustus M. Kelley, New York, 1970.

228. "Some diseases turn into new ones, and so themselves disappear. This is very satisfactory. *One disease becomes the medicament for curing other*. Thus, quartan malaria often cures epilepsy (cf. GPI) also podagra, varices and arthralgias ...."

Ibn Sina

ব্যাখ্যা : "কোনও কোনও রোগের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় এবং সেই রোগগুলিকে আর চেনা যায় না। ঘটনাটি মঙ্গলপ্রদ। এক রোগকে অন্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। যেমন, ম্যালেরিয়া জর দ্বারা মূর্চ্ছারোগ (উপদংশ জনিত), পদবেদনা, শিরাস্ফীতি এবং অস্থিগ্রন্থি বেদনা প্রভৃতি রোগের উপশম ঘটানো যায়।"

অভিসেন্না

20. "Natural philosophy of four elements and no more. The physician must accept this. Two are light, and two are heavy. The lighter elements are fire and air ; the heavier are earth and water."

Ibn Sina

ব্যাখ্যা : "প্রাকৃত দর্শনশাস্ত্রে চারটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ আছে। প্রতি চিকিৎসকের কথাটি জানা উচিত। ঐ পদার্থগুলির মধ্যে দুটি ভারী ও দুটি হাল্কা। অগ্নি ও বায়ু হাল্কা এবং মৃত্তিকা ও জল ভারী।"

অভিসেন্না

803. "Wine does not readily inebriate a person of vigorous brain, for the brain is not susceptible to ascending harmful gaseaus products nor does it take up heat from the wine to a degree beyond what is expedient. Therefore it renders his mental power clearer that before ; other talents are not affected in such an advantageous manner. The effect is different on persons who are not of this calibre.

A person who is weak in the chest, to the extent that the wintertime is trying to the breathing, cannot (wisely) take much wine."

Ibn Sina

ব্যাখ্যা : "শক্তিশালী মস্তিষ্ক যে ব্যক্তির আছে, সে সুরাপান করলে মাতাল হয় না। উপরন্তু সুরা তার মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তার কোনও প্রতিভাই সুরা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উক্তিটি প্রযোজ্য নয়।

যে ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্র দুর্বল তাদের পক্ষে শীতকালে সুরাপান ক্ষতিকারক।"

অভিসেন্না

তথ্যের সূত্র

Ābul Fazl. : Āyn-e Ākbari, translated into English by Blockmann et al, Munshi Rām Monohar Lāl, Delhi.

Ālvi, M. A. and A. Rahmān. : Jahangir as a Naturalist, National Institute of Science of India, New Delhi, 1968.

Ārya, P. : Atharvavedeeya Chikitsāshātra, Sarvadeshik Ārya Pratinidhi Sabhā, Delhi—1941.

Aschoff, L and Diepger, P. : Kurze Uebersichtstablle zur Geschichte der Medizin, Verlag von J. F. Bergmann, Muenchen, 1936.

Ashtāngahṛdaya Samhitā of Vāgbhatta. : A compendium of the Hindu System of Medicine, composed by Vagbhatta, with the commentary of Arundatta, Revised and colleted by Anna M. Kunte, 2 vols. Bombay, 1880.

Āstāngāhṛdayasamhitā, Vāgbhatta. : Ein altindisches Lehrbuch der Heilkunde, aus dem Sanskrit ins Deutsche uebertragen, mit Einleitung, Anmerkungen und Indices von Luise Hilgenberg und Willibald Kirfel, Leiden, 1937-1940.

Ashtānga Sangraha of Vāgbhatta. : (In Sanskrit), with the commentary by Indu, edited by T. Rudraprasava, 3 vols., Trichur, 1913-24.

Atharva Veda. : Translated in English by Ralph T. H. Griffith, 3 vols. E. K. Lazarus and Co. Benares, 1916.

Bāgchī, A. K. : Yug hate Yugāntare Chikitsā Shāstra (Medicine through the ages), Serialised in Amṛta, Calcutta, 1963.

Bāgchī, A. K. : Susruta—A man of History and Science. *Internat Surg.* 50, 403, 1968.

Bāgchī, A. K. : The Emergence of Surgery in India, *Phronesis* (Spain), 12, 476, 1974.

Bāgchi, A. K. : Indian influences on Arabic and Moorish medicine—*Phronesis* (Spain), 37, 3, 1978.

Bāgchī, A. K. : Sanskrit and modern medical vocabulary. A comparative study, Riddhi, Calcutta, 1978.

Bailey, Hamilton and Bishop, W. J. : Notable names in Medicine and Surgery, H. K. Lewis, London, 1946.

Banerjee, D. N. : Āyurveda Shārira, vol. 1 Industry Publishers. Calcutta, 1951.

Bhela Samhitā. : Published by the University of Calcutta, 1921.

Bose, D. M., Sen S. N., Subbarāyāppā B. N. (Editors) : A Concise History of Science in India. Indian National Academy, New Delhi, 1971.

Brendt, Catherine, H and Brendt, Ronald M. : The Barbarians, C. A. Watts, London, 1971.

Beal Samuel. : Chinese Accounts of India, Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang, 4 vols. Susil Gupta, Calcutta, 1957-58.

Bhāva Prakāsha of Sri Bhāva Mishra. : (In Hindi) Edited by Bhishagratna Pandit Shree Brahma Shankara Mishra, Chowkhāmbā Sanskrit Series office, Vārānasi, 1961.

Bhela Samhitā. : (In Sanskrit) Edited by Ashutosh Mookerjee, Calcutta University, *Jour of Dept. of Letters Calcutta*, vol. 6, 1921.

Bjornstjern, Count M. : The Theogony of the Hindoos. London. John Murray, 1844.

Bower Manuscript, The. : Facsimile leaves, Nāgari Transcript, Romanised Transliteration and English Translation with Notes, Edited by A. F. R. Hoernle, Part 1, 2, Archaeological Survey of India, New Imperial Series, vol. 22, Calcutta, 1893-1912.

Chakravorty, C. : An Interpretation of Ancient Hindu Medicine, Vijay Krishna Bros., Calcutta, 1923.

Celsus. : De Medicina, trans. by W. G. Spencer, Cambridge University Press Harvard, 3V., 1935-38.

Charaka Samhitā, The. : With the commentary of Chakrapānidatta, edited by Vaidya Bhushan Vāman Kesheo Dātār, 1st edition, Nirnaya Sāgar Press, Bombay, 1922.

Charka Samhitā. : (In Sanskrit) with the commentary by Chakrapānidatta and Jajjāta, edited by Haridatta Shāstri, 2 vols, 2nd Ed., Motilal Bānārsidāss, Lahore, 1940.

Charaka Samhitā, The. : Edited and published by Shree Gulābkunverba Āyurvedic Society 6 vols, with translations in Hindi, Gujarati and English, Jamnagar. 1949.

Charaka Samhitā. : (A Scientific Synopsis). P. Ray and H. N. Gupta, published by the National Institute of Sciences of India, New Delhi, 1965.

Devi, A. K. : The Vedic Age, Vijay Krishna Bros. Calcutta, 1931.

Dioscorides, The Greek Herbal of. : Edited and translated by Robert T. Gunther, Hafner publishing Co., New York, 1959.

Dwarakanāth, C. : Introduction to Kāya Chikitsā Popular Book Depot., Bombay, 1959.

Elgood, C. : A Medical History of Persia and Eastern Caliphate, Cambridge, 1951.

Filliozat, J. : The Classical Doctrine of Indian Medicine, translated by D. R. Chānānā, Munshi Rām Manohar Lāl, Delhi, 1964.

Goetze, A. : Persische Weisheit in Griechischen Gewande in *Zeit. fuer Ind. und. Ir.*, II, 1923.

Gordon, B. L. : Medicine throughout Antiquity, F. A. Davis Company, Philadelphia, 1949.

Gruner, O. C. : A Treatise on the Canon of Medicine of Avicenna, Luzac and Co, London, 1930.

Gupta, A. : Sushruta Samhitā—Motilāl Bānarsidāss, Benāres, 1950.

Haddad, Farid Sami. : History of Medicine. Arab contribution to Medicine, *Le Jonrnal Medical Libanais*, 26, 331, 1973.

Hoernle, A. F. R. : Indien und die Deutschen, by Leifer, W., Erdmann, Tuebingen, 1969.

Johnston Saint, P. : Quoted by The Pioneer, Allahabad (India) May, 31 and June 1, 1929.

Jolly, J. : Indian Medicine, C. G. Kāshikār, Poona, 1951.

Kausika Sutra. : The Kausika Sutra of the Atharvaveda, Edited by Maurice Bloomfield, *Journal of the American Oriental Society*, Vol., XIV, New Haven, 1890.

Keswāni, N. H. : "Evolution of Surgery". *The Medicine and Surgery*, 1, 8, 1961.

Keswāni, N. H. : "Anaesthesia and Analgesia among the Ancients. Part II (The Egyptians and Mesopotamians)" *Indian Journal of Anaesthesia*, 1, 55, 1962.

Keswāni, N. H. : "Foreword" Sushruta Samhitā, English Translation by K. L. Bhishagratna, 2nd Edition, Chowkhāmbā Sanskrit Series, Vārānasi, 1963.

Keswāni, N. H. : "Ancient Hindu Orthopaedic Surgery", *Indian Journal of Orthopedics*, 1, 76, 1967.

Keswāni, N. H. : "Medical Education in India since Ancient Times", in "The History of Medical Education", edited by C. D. O. Malley, University of California Press, pp. 329-366, 1970.

Khān, M. S. : An Arabic source for the history of Ancient Indian Medicine, Studies in History of Medicine, pp. 1-12, 1979.

Kinjbadedkar, R. S. : Ashtāngasangraha Tasya Shārirasthānam, Chitrashāla Mudranālaya, Poone, 1936.

Kutumbiah, P. : Ancient Indian Medicine, Orient Longmans, 1962.

Lash, Abraham. F. : History of Gynecology from Prehistoric to Modern Times, *J. Intern*, 32, 1959.

Lassen, Ch. : Indische Altertumskunde, 4 vols, Leipzig, 1843-72.

Mādhava Nidāna of Mādhava Kāra. : (In Hindi) Edited by Bhishagratna Pandit Shree Brahma Shankar Shāstri, Chowkhamba Sānskrit Series Office, Bānāres, 1954.

Mahāvagga. : In Vinaya Texts, Translated by T. W. Rhys Davids and Hermann Oldenberg, in the Sacred Books of the East Series, Vol. XIII and XVII Edited by Max Mueller, Clarendon Press, Oxford, 1881.

Mahāvamso. : In Roman Characters, with the translation subjoined and with Introductory essay by George Turnour, Church Mission Press, Cotta, Ceylon, 1837.

Majno, Guido. : The Healing Hand, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1975.

Manu Smriti. : The Laws of Manu, Translated by G. Buehler, in the Sacred Books of the East Series, vol. XXV. Edited by Max Mueller, Clarendon Press Oxford; 1886.

Manucci, Niccolao. : Storia De Mogor (or Mughal India), Translated into English by William Irvine, vol. I-IV, John Murray, London, 1907-08.

Max Mueller, F. : The Upanisads (Translation), Dover Publications Inc. New York, 1962.

Mettler, C. C. and Mettler F. A. : History of Medicine, the Blakiston Company, Philadelphia, 1947.

Meunier, L. : Histoire de le Medecine Librairie E. Le Francois, Paris, 1924.

Pāthak, R. : Marma Vijnān, Jaykrishnadās Haridās Gupta, Benāres, Samvat 2006.

Pāndya, S. K. : Medicine in Goa, Sānjgiri foundation, Goa, 1980.

Pococke, E. : India in Greece, Glasgow University Library, 1852.

Rāy, D. N. : The Principles of Tridosha in Āyurveda, Calcutta, 1937.

Rig Veda Samhltā. : Edited and published by Manmatha Nātha Dutt (Shāstri) Society for the Resuscitation of Indian Literature, Calcutta, 1906.

Rig Veda Samhitā. : Translated by H. H. Wilson, 6 vols., Ashtekar and Co., Poona, 1925-28.

Said, H. M. : Ours in Trust only, *Hemisphere*, 22,206,1979.

Sāma Veda, The Hymns of the. : Translated by R. T. H. Griffith, E. J. Lazarus and Co. Benāres, 1926.

Sarton, G. : Introduction to the History of Science, Carnegie Institution of Washington publication 376, 3 vols. in 5 pts. Williams and Wilkins, Baltimore. 1927-28.

Schinz, Hans R. : 60-Jahre Medizinische Radiologie, George Thieme, Stuttgart, 1959.

Sen, G. N. : Hindu Medicine—An Address on Āyurveda delivered at the foundation ceremony of Benāres Hindu University in 1916.

Shāh, M. H. : The General Principles of Avicenna's Canon of Medicine, Karachi, Pakistan, 1966.

Siddiqui, M. Z. : Studies in Arabic and Persian Medical Literature, Calcutta University, 1959.

Siegerist, Henry, E. : The Great Doctors, Dover Publications, New York, 1971.

Singer, Charles. : Greek Biology & Greek Medicine, Oxford, 1922.

Stoddart, Anna M. : The life of Paracelsus, William Rider & Son, London 1915.

Sushruta Samhitā, The. : Translated and Edited by Kavirāj Kunjalāl Bhishagratna, 3 vols, 2nd Ed., Chowkhāmbā Sanskrit Series Office, Vārānasi, 1963.

Takakusu, I. T. : I-tsing—A Record of the Buddhist Religion As Practised in India and Malay Archipelago (671-695 A. D.) English Translation, Clarendon Press, Oxford, 1896.

Tavernier, Jean Baptiste. : Travels in India, Calcutta, 1905.

Thorwald Juergen. : The Century of the surgeon, Thames and Hudson, London, 1957.

Uenver, Sueheyl : Hospital of the Sultan--750 years of Turkish Medicine., *Abbottempo Interview*, Abbott Universal Ltd., 1970, pp 72-77.

Verma, R. L. ; The Growth of Greco-Arabian Medicine in Mediaval India. *Ind. J. Hist. Sci.* 5,348, 1970.

Vidyālankār, J. : Charakasamhitā, Motilāl Banārsidāss, Benāres, 1947.

Wilson, Leonard G. : Erasistratus, Galen, and the Pneuma, *Bull. Hist. Medicine*, July-Aug., 1959,

Yajur Veda, (Krishna). : The Veda of the Black Yajus School, Translated by A. B. Keith, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1914.

Yajur Veda, (The Texts of White) : Translated by R. T. H. Griffith, E. J. Lazarus and Co., Benares, 1957.

Zysk, Ken. : In wider fields, *Hemisphere*, 23, 200 1979.

—o—

S.C.E.R.T., West Bengal
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

আঠারো টাকা

চিকিৎসা শাস্ত্র যুগে যুগে

ডাঃ, ডঃ অশোক কুমার বাগচী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

3944
16.4.87

চিকিৎসাশাস্ত্র যুগে যুগে

ডাঃ ডঃ অশোক কুমার বাগচী

এম্.বি. বি. এস্., এম্. এস্. এন্. এস্., এফ্. এন্. এস্., এফ্. এ. সি. এস্.,
এফ্. আই. সি. এস্. ; ডি. লিট্., এফ্. আই. এম্. এস্. এ.,
পি. এইচ্. ডি।

অধ্যাপক স্নায়ুশল্য চিকিৎসক ও স্নায়ুতত্ত্ব বিভাগীয় প্রধান, নীলরতন সরকার
মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা ; ভারতীয় স্নায়ুতত্ত্ব সংস্থার অবৈতনিক
ঐতিহাসিক ; ভারতীয় স্নায়ুতত্ত্ব পত্রিকার সম্পাদক ও জার্মাণ
স্নায়ুশল্যশাস্ত্র পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ; ভারতীয়
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও স্নায়ুবিজ্ঞান সংস্থার
উপদেষ্টা ও ভারতীয় সেনা-বাহিনীর
পরামর্শদাতা স্নায়ুশল্য চিকিৎসক।

S.C.E.R.T., West
Library
Calcutta
25/3, B. C. Road

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

CHIKITSHA SHASTRA YUGE YUGE

(Medical Science through the ages)

Dr. Asoke Kumar Bagchi

© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

610.9
BAG

প্রকাশকাল : মার্চ, ১৯৮৪

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

S.C.E.R.T. West Bengal
Date 16-4-87
Acc. No. 3944

মুদ্রক :
ইম্প্রেশন
৩৩বি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : শ্রীদুর্গা রায়

মূল্য : **আঠারো টাকা**

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

"বাল্মিকী নাদশ্চ সসর্জ পদ্যং
জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।
চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ
পশ্চাৎ তদ্‌ আত্রেয় মুনির্জগাদ ॥"

(অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত)

১ম সর্গ

অর্থাৎ

মহর্ষি বাল্মিকীর একটি উদ্ধৃতি থেকে কবিতার সৃষ্টি,
যে কবিতা মহামুনি চ্যবন লিখতে অসমর্থ হয়েছিলেন।
যে চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণয়ন করতে অত্রি অসফল হয়েছিলেন
আত্রেয় সেই কার্যে সফলতা লাভ করেছিলেন।

সদ্য প্রয়াত পিতা পরম শ্রদ্ধেয়
ডাঃ দ্বিজদাস বাগচী
মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
উৎসর্গীকৃত।

২০. ৬. ১৯৮৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তক প্রণয়নে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আমার স্ত্রী শ্রীমতী সাধনা বাগচী, আমার সহকর্মিনী পাপিয়া পাল, প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক শ্রদ্ধেয় ডঃ স্থকুমার সেন, ভারতীয় নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক ডঃ স্থরজিৎ সিন্‌হা, সংস্কৃতজ্ঞা ডঃ শান্তি চক্রবর্তী, আরবী ও পারসিক ভাষার স্থপণ্ডিত ডঃ মহম্মদ সাবির খান্‌, ও নিরিক্ষক ডাঃ সমর রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ-এর পরিচালক শ্রীদিব্যেন্দু হোতা, ও শ্রীঅশোক বিশ্বাস এবং আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীভান্থ চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুখবন্ধ

ছোটবেলা থেকেই আমার ইতিহাস ও ভূগোল পড়ার নেশা ছিল। ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্য দিয়ে আমার কিশোর মন চলে যেত অতীতে বা দূর হ'তে দূরান্তে।

এক চিকিৎসক বংশে আমার জন্ম। পিতামহ বৃটিশ সেনাবাহিনীর চিকিৎসক ছিলেন। পিতা ৺ডাঃ দ্বিজদাস বাগ্‌চী কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে স্নাতক হ'ন। তিনি আমাদের আদিনিবাস উত্তরবঙ্গের পাবনা শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। আমার বাবা অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের লাইব্রেরী থেকে বহু সচিত্র পত্রিকা আমাকে এনে দিতেন। তার মধ্যে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ম্যাগাজিন আমাকে নেশার মত আকৃষ্ট করত। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারতাম না, কিন্তু আমার মন ঐ পত্রিকার মধ্য দিয়ে চলে যেত বহু দূর দেশের নগরে প্রান্তরে। সেই সমস্ত দেশের বিচিত্র মানুষ, পশুপক্ষী ও নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে আমি মোহিত হতাম। পত্রিকাটির অনুপ্রেরণাতেই আরম্ভ হয়েছিল আমার ইতিহাস ও ভূগোল পাঠের নেশা।

আমাকেও বংশানুক্রমিক ভাবে চিকিৎসাশাস্ত্র ব্যবসায়ী হ'তে হ'ল। যখন আমি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন পরমশ্রদ্ধেয় ৺ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক বিশ্ববিশ্রুত চিকিৎসাবিদ্যার ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনিই আমার চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস পাঠের পথ প্রদর্শক। অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি আমাকে তাঁর নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ থেকে কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিয়ে গিয়েছেন। সেই পুস্তকগুলি আজ পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য।

স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের জন্য আমি বেছে নিয়েছিলাম মধ্য ইউরোপের ভিয়েনা শহরটিকে। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ভিয়েনার চিকিৎসা বিদ্যালয় পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বহু বিখ্যাত চিকিৎসা জগতের দিকৃপালগণ ভিয়েনা চিকিৎসা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আজ প্রতি পদে পদে চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্রকে তাঁদের নাম স্মরণ করতে হয়। তাঁদের উদ্ভাবিত চিকিৎসা পদ্ধতি, নিদান পদ্ধতি এবং রোগ নিরূপণ পদ্ধতি আজও প্রচলিত। পৃথিবীর বহুদেশেই এইরূপ আরও

বিখ্যাত চিকিৎসকগণ ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে তাঁদের জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারা লিখে রেখে গিয়েছেন। ভিয়েনায় আমার পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ৺ডক্টর লিওপোল্ড স্খোন্‌বাউয়ের একাধারে স্নায়ুশল্য চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসেরও প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি আমার চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাস পাঠের উপর আগ্রহ দেখে পরম যত্ন সহকারে আমাকে আরও বহু তথ্য শিক্ষা দিয়েছেন। সেইজন্য আমি তাঁর কাছেও আজীবন ঋণী। অধ্যাপক স্খোন্‌বাউয়ের এর আদেশমত আমি জার্মান, ল্যাটিন ও গ্রীক্‌ভাষা শিক্ষা করি। পরবর্তীকালে সেই শিক্ষা আমার ইতিহাস ও ভাষাতত্ত্ব পাঠের পরম সহায়ক হয়েছে। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় স্নায়ুতত্ত্ব শাস্ত্রীয় সংস্থার সভ্যরা আমাকে সংস্থার চিকিৎসাবিদ্যার ঐতিহাসিক পদাভিষিক্ত করে আরও ইতিহাস চর্চার প্রেরণা দিয়েছেন।

বর্তমান লেখাটি আমার ১৯৬৩ সালে অধুনালুপ্ত অমৃত পত্রিকায় 'যুগ হ'তে যুগান্তরে' নামক ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেখার অবলম্বনে পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত। ১৯৬৩ সাল এবং ১৯৮৩ সাল এই দুই দশকের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। মানুষের শরীরে অন্য মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র, বৃক্ক এবং অন্যান্য যন্ত্রাদি সংযোজন ও সংস্থাপন সম্ভব হয়েছে। রোগনিরূপণ শাস্ত্রেরও আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পদে পদে চিকিৎসাশাস্ত্র পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের অন্যান্য নব নব আবিষ্কার সমূহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। আজ চিকিৎসাশাস্ত্রে নতুন এক অধ্যায় সূচিত হয়েছে যার নাম বায়ো-ইঞ্জিনীয়ারিং বা 'জীব প্রযুক্তিকলা'। কালক্রমে চিকিৎসাবিদ্যা আরও কতদূর যে অগ্রসর হয়ে যাবে সে কথা আমার উত্তরসূরীরাই হয় তো ভবিষ্যতের পাঠকদের জানাতে পারবেন। ইচ্ছাকৃত ভাবেই পুস্তটির আকার সীমাবদ্ধ রাখা হ'য়েছে কেননা কৌতুহলী পাঠকবর্গের মনে ভীতি উদ্রেককারী বৃহদাকৃতি পুস্তক প্রণয়নে আমার একান্ত অনীহা।

আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা যদি ভবিষ্যতের চিকিৎসাশাস্ত্র বিদ্যার ছাত্রদের মনে সামান্য কৌতূহল উদ্রেক করতেও সমর্থ হয় তাহলেই আমার এই লেখার সার্থকতা প্রমাণিত হ'বে।

দোলপূর্ণিমা, ১৩৯০ অশোক কুমার বাগচী
কলিকাতা

বিষয় পরিচিতি

বিষয়			পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	...	...	চ
ভূমিকা	...	...	১
প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহ্য	...	...	৪
প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	১২
জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	১৩
প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	১৫
সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	১৫
প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	১৬
গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	১৭
আলেক্জান্দ্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	২৪
রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	২৪
প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	২৬
প্রাচীন আরবী চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	২৭
আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী	...	...	২৮
চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান	...	...	৩১
কায়চিকিৎসা	...	...	৩২
আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয় প্রভাব	...	...	৩৩
প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	৩৬
য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	৩৭
মধ্যযুগের য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	৪৩
রেনেসাঁস যুগের চিকিৎসা	...	...	৪৮
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	৫১
বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম	...	...	৫৫
ঊনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	৫৯
সংক্রামক রোগ সমস্যা	...	...	৬০
ঊনবিংশ শতকের নিদানতত্ত্ব	...	...	৬২
উপদংশ রোগের সূত্র-সন্ধান	...	...	৬২

বিষয়			পৃষ্ঠা
ডিফ্‌থেরিয়া রোগ	...		৬৩
শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী	...	...	৬৪
চেতনা-নাশকের সন্ধানে	...	...	৬৫
উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান	...	...	৬৬
গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ সমস্যার সমাধান	...	...	৬৭
শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব		...	৬৯
চিকিৎসাশাস্ত্রে পদার্থবিদ্যার অবদান	...	...	৭২
বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র	...	...	৭৩
বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা	...	...	৭৪
চিকিৎসাশাস্ত্রে বিংশ শতকের অবদান	...	...	৭৫
বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা	...	...	৭৮
ভারতে য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন	...	...	৮০
পরিশিষ্ট	...	...	৮৬
তথ্যের সূত্র	...	...	৯৯

॥ ভূমিকা ॥

কোটি কোটি বৎসর আগেকার কথা। পৃথিবীর কোন এক আদিম জলাভূমির কাদায় একটি এককোষী এ্যামিবার জন্ম হয়েছিল। এককোষীর পর এলো বহুকোষী জলচর প্রাণী। তারপর উভচর, খেচর এবং সর্বশেষে পৃথিবীর বুকে আসে বানররূপী প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মানুষ। কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধানে সেই মানুষই আজ পরিণত হয়েছে চন্দ্রে অবতরণকারী নভচর মানুষে। সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাগ্‌ঐতিহাসিক মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে কালক্রমে বর্তমান সুসভ্য মানুষে পরিণত হয়েছে। প্রথমে বিকট দর্শন এবং হিংস্র প্রাগ্‌ঐতিহাসিক প্রাণীর আক্রমণ হ'তে তারা আত্মরক্ষা করতে শিখেছিল। কিন্তু তাদের দৃষ্টির অগোচরে বহু অদৃশ্য রোগজীবাণু শরীরে প্রবেশ করার ব্যাপকভাবে তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হত। তারা অদৃশ্য অলৌকিক শক্তির আধিপত্যকে মৃত্যুর কারণ বলে মনে করত। রোগ চিকিৎসার কোন উপায়ই তারা জানত না। কিন্তু স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাবলে তারা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন রোগ দেখা দিয়েছে এবং সেই রোগানলেও আত্মাহুতি দিয়েছে বহু মানুষ, কিন্তু যারা বেঁচেছে তাদের অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতের মানুষকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে। তাই আমার মনে হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রে ক্রমবিকাশের ইতিহাস বর্তমান সকল মানুষেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য।

পৃথিবীর আদিতম রোগগ্রস্ত এক ডিনোসাউর-এর জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল মার্কিন দেশের ওয়াইওমিং প্রদেশের একস্থানে। পুরা-নিদানতত্ত্বের (প্যালিওপ্যাথলজি) পণ্ডিতগণের মতে ওই ডিনোসাউরের পুচ্ছের একটি অস্থি ক্ষয়রোগগ্রস্ত ছিল। কোটি কোটি বৎসর পূর্বে সিনোসাউর পৃথিবীপৃষ্ঠ হ'য়ে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার জীবাশ্মটি রোগক্লিষ্ট জীবনের এক করুণ ইতিহাসকেই আজকের সভ্য মানুষের চোখে তুলে ধরেছে। মানবদেহের

প্রাচীনতম রোগগ্রস্ত জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল যবদ্বীপে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ খননকার্যের দ্বারা যবদ্বীপ মানুষের (পিথাকান্‌থ্রোপুস্ ইরেকটুস্) একটি চোয়ালের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন। অস্থিটিতে একটি অর্বুদ বা টিউমার ছিল।

চিত্র—১

অতি প্রাচীন মানুষের রোগ সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র তাদের অস্থির অবশিষ্ট থেকে জানতে পারা যায়। মিশর দেশীয় সংরক্ষিত 'মমি'-এর দেহে রয়েছে অস্থি প্রদাহ, বৃক্ক ও মূত্রাশয়ের পাথুরী, পিত্তাশয়ের পাথুরী, মেরুদণ্ড ও অপরাপর অস্থির ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিদর্শন। অর্বুদাক্রান্ত প্রাচীন মানুষের অস্থিও বহু পাওয়া গিয়েছে। প্রাচীন মিশরে দন্তরোগ ও বাতরোগের খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। মিশরের ফারো, আখেনাটন-এর পিটুইটারী গ্রন্থির রোগ হয়েছিল তারও প্রমাণ সমকালীন চিত্র থেকে পাওয়া যায়। কেননা সুদর্শন সেই ফারো বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিৎ দর্শন হয়েছিলেন।

চিত্র—২

ফরাসীদেশের পিরেনিজ্ পর্বতের এক নির্জন গুহাভ্যন্তরে বন্যজন্তুর ছাল পরিহিত এক যাদুকর চিকিৎসকের চিত্র অঙ্কিত আছে। পণ্ডিতগণের মতে উক্ত চিত্রের শিল্পী অরিগনাসিয়ান যুগের এক আদিম চিত্রকর। ঐরূপ বিচিত্রবেশধারী চিকিৎসক কিভাবে প্রাচীন মানুষের রোগযন্ত্রণা লাঘব করতেন তার কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু তার বিচিত্র বেশবাস দেখে আজও মনে হয় যে তিনি রোগীর মনে ভীতির ভাব উদ্রেক করে কার্য সিদ্ধ করতেন।

চিত্র—৩

জীবাশ্মীভূত অস্থিরঅবশিষ্ট একথা আরও প্রমাণিত করে যে প্রাচীন মানব শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড, রুশিয়া, জার্মানী ও স্পেনের গুহাভ্যন্তরে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশের "মাছু পিছু" নামক ইঙ্কানগরীতে বহু সচ্ছিদ্র করোটি পাওয়া গিয়াছে। কিভাবে প্রাচীন মানুষ করোটির ন্যায় কঠিন অস্থি ছিদ্র করত তা ভাবলে আজ আশ্চর্য হ'তে হয়। দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগোনিয়াতে প্রস্তরফলাকাবিদ্ধ একটি মানুষের বক্ষাস্থি পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং স্বতঃই অনুমেয় যে ধাতু অ্যবিষ্কারের বহু পুর্বেই প্রাচীন ও নবপলীয় যুগের মানুষেরা যে সমস্ত প্রস্তরের

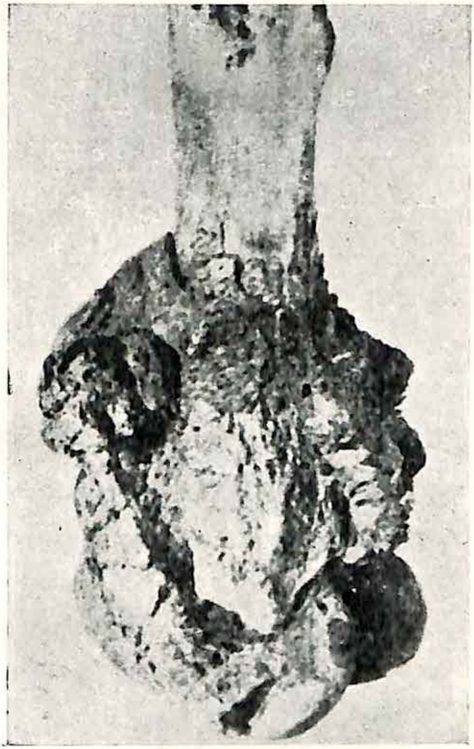

চিত্র ১—প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগের এক বন্য বৃষের
উরুর অস্থি ভঙ্গ (প্লেইষ্টোসিন যুগ)।

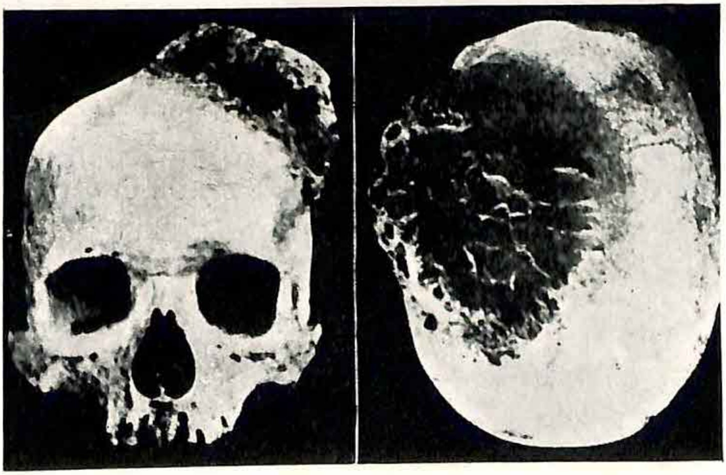

চিত্র ২—প্রাগ্-ঐতিহাসিক মানুষের করোটিতে অর্বুদ (পেরু দেশে প্রাপ্ত)।

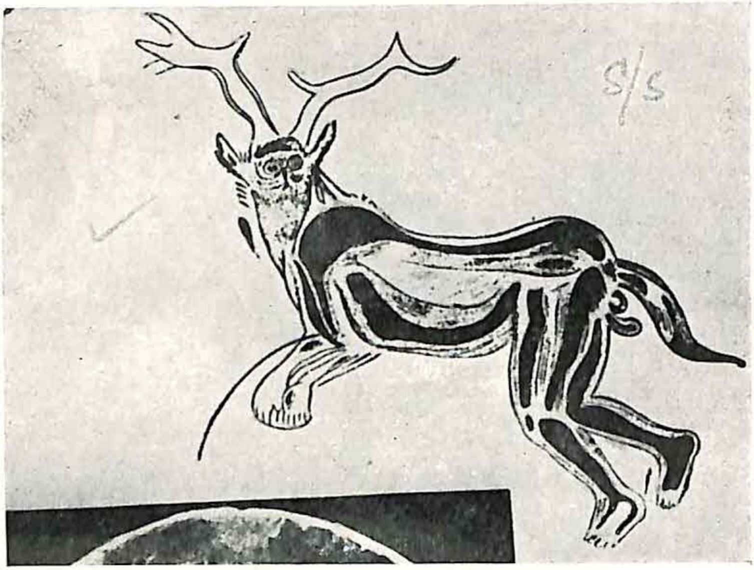

চিত্র ৩—অরিগনাসিয়ান যুগের এক যাদুকর চিকিৎসক
(পিরেনিস পর্বতের গুহাচিত্র)।

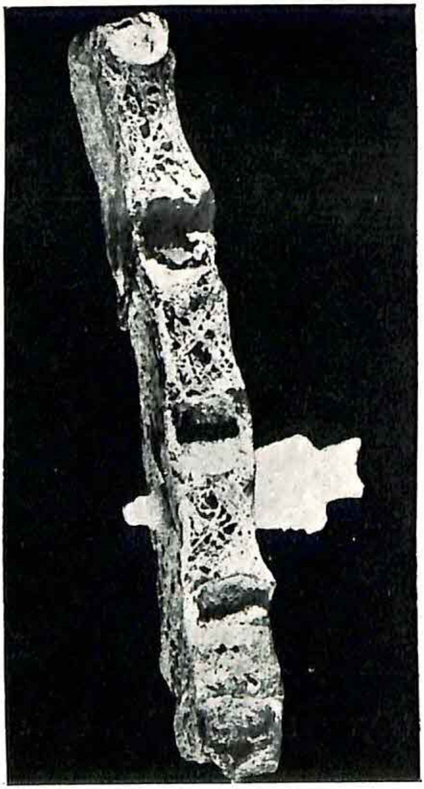

চিত্র ৪—প্রস্তর নির্মিত
তীরবিদ্ধ মানুষের বক্ষাস্থি
(প্যাটাগোনিয়াতে প্রাপ্ত)

অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেন সেগুলো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্থিবিদ্ধ করতে সক্ষম হ'ত।

চিত্র—৪

নৃতত্ত্ববিদগণের মতে প্রাচীন শল্য চিকিৎসকদের অস্ত্র প্রথমতঃ প্রস্তর, আগ্নেয় শিলা, আগ্নেয় স্ফটিক এবং কালক্রমে তাম্র ও লৌহের দ্বারা নির্মিত হয়।

করোটি ছিদ্রকরণ দ্বারা হয়তো প্রাচীন মানুষ করোটির অভ্যন্তর হ'তে শিরঃপীড়া, মৃগীরোগ বা মানসিক রোগের কাল্পনিক অপদেবতা বিতাড়ন করতেন। সিন্ধুনদের অববাহিকায় আবাসকারী প্রাক্ আর্য ভারতীয়গণও করোটি ছিদ্রকরণে পারদর্শী ছিলেন। সর্বসাকুল্যে তাদের কৃত দুটি ছিদ্রিত করোটি সিন্ধুনদের অববাহিকায় পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে একটি ছিল উত্তর কাশ্মীরের বুর্জাহোম নামক স্থানে। যেটি পুরাতন পলীয় যুগের (আনুমানিক ২৩৭৫ খৃষ্টপূর্বাব্দের)। দ্বিতীয়টি নবপলীয় যুগের, সেটি পাওয়া গিয়েছে হরপ্পা নগরীর সন্নিকটে এক কবরে (আনুমানিক ২৩০০ হইতে ১৭৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দের)।

চিত্র—৫ ও ৬

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসকগণ নানাবিধ অলৌকিক প্রক্রিয়ায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁরা মুখ্যতঃ ছিলেন পুরোহিত কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায়ের দ্বারা বিকল্পে অর্থোপার্জন করতেন। এবেরস্ ও এডউইন স্মিথ্ নামক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মিশরীয় ভূর্জপত্রলিখন থেকে বহু প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাবিধি ও ভেষজাদির তালিকা আবিষ্কার করেছেন।

চিত্র—৭

কবে পৃথিবীতে প্রথম মানব সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল তার সঠিক কাল এখনও নিরূপণ করা যায়নি। অতিকথায় আট্‌লান্টিস্ নামে এক বিশাল সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশের উল্লেখ আছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশটি আতলান্তিক মহাসাগরের গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। কথিত আছে যে, ঐ ধ্বংসের প্রাক্কালে কতিপয় আটলান্টিস্‌বাসী আফ্রিকা ও ইউরোপের উপকূলে উপস্থিত হয় এবং কালক্রমে মিশর, সুমেরীয়া ও প্রাক্ আর্য ভারতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। প্রাচীন ভারত, সুমেরিয়া এবং মিশরে সভ্য মানুষের প্রাচীনতম চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্ভব।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ঐতিহ্য

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার উন্মেষকালে বর্তমান সুসভ্য আখ্যাধারী য়ুরোপীয়গণ ছিল সভ্যতার অস্তিত্বহীন অন্ধকারে। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও তক্ষশীলা প্রভৃতি প্রাচীন শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, খৃষ্টজন্মের অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হাজার বৎসর আগে থেকে মানুষ সেখানে বাস করত। উক্ত প্রাচীন শহরগুলির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আছে সুনির্মিত বাসগৃহ, স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর ধ্বংসাবশেষ। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সমৃদ্ধির অসংখ্য নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও প্রতীচ্যের বহু ঐতিহাসিক গ্রীক সভ্যতাকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা পুরাতন প্রমাণ করতে সচেষ্ট, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড-বাসী বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পোকক্ তাঁর "ইণ্ডিয়া ইন্ গ্রীস্" নামক পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় লিখেছেন এবং প্রমাণ দিয়েছেন যে সুসভ্য ভারতীয়রাই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার জনক! আমাদের প্রাক্তন ইংরাজ শাসকেরা ভারতীয় উৎকর্ষের বিষয় সব সময় স্বীকার করত না, কিন্তু ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়, দিনেমার, স্কাণ্ডিনেভীয় ও রুশিয় বহু পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা ইংরাজদের মত ভারত বিদ্বেষী মতবাদ পোষণ করতেন না। কৃষ্ণমাচারী তাঁর "এসেজ অফ এন্সিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে প্রাচীন পারসিক, গ্রীক, রোমক, স্কাণ্ডিনেভীয়, ফিনীসিয় ও ইংল্যাণ্ডের ড্রুইডগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতেন যে তাঁদের পূর্বপুরুষগণ এক প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী কোন মহাদেশ থেকে এসেছিলেন। আমেরিকার বিখ্যাত অ্যাজটেক নৃপতি মন্টিজুমাও মনে করতেন যে তাঁর পূর্বপুরুষগণ প্রাচ্য থেকে পশ্চিম গোলার্ধের আমেরিকায় এসে বসতি স্থাপন করেন।

বর্তমানে প্রচলিত পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্ম যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদী, খৃষ্ট, ইসলাম, জোরস্তারীয়, কন্ফুসীয়, সিণ্টো প্রভৃতির উৎপত্তিস্থান এশীয় মহাদেশের কোনও না কোনও স্থানে। উক্ত ধর্মসমূহ যাঁরা প্রণয়ন করেছিলেন তাঁরা কি সুসভ্য মানুষ ছিলেন না? সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে প্রতীচ্যের কোথাও কোন ধর্মের উন্মেষ হয় নি। উপরিউক্ত উদাহরণ দিয়ে কি প্রমাণিত হয় না যে প্রাচ্যের সভ্যতা প্রতীচ্যের সভ্যতার অগ্রগামী?

আজ পৃথিবীতে আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও শাখা নেই যা হিন্দু পণ্ডিতগণের অগোচরে ছিল। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ

অবিসম্বাদিত। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতীয়গণ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিলেন।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং একদা বলেছিলেন "প্রাচ্য প্রাচ্যই ও প্রতীচ্য প্রতীচ্যই, এই দুইএর কখনও মিলন হবে না।" কিন্তু আজ নভোচারণের যুগে উক্তিটি অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ঘটেছে এবং প্রতিদিন ঘনিষ্ঠতর হচ্ছে। এই মিলনের ফলে আমরা আজ বুঝতে পেরেছি যে আমরা একই মানবগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, আমাদের কৃষ্টির উৎস এক, আমাদের আশা, নিরাশা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এক। মার্কিন মণীষী ওয়েন্‌ডেল্ উইল্‌কি হয়তো "এক মানুষ এক পৃথিবীর" অনুরূপ কল্পনাই করেছিলেন।

চিকিৎসাশাস্ত্র মানবজাতির উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুকে এসেছিল। আদিম মানুষ এবং জন্তু জানোয়ার সহজাত প্রবৃত্তির বশে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের সমকালীন রোগ ও আঘাতের চিকিৎসার উপায় উদ্ভাবন করেছিল। কালক্রমে আদিম মানুষের চিন্তা যত পরিণত হতে লাগল, চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে ধর্মভীরুতা ও অলৌকিকতা প্রবেশ করল। প্রাচীন মানুষের বিশ্বাস হল যে রোগের জন্য প্রধানতঃ দায়ী ভূত, প্রেত, দৈত্য ও ডাইনীরা। মানুষের মনে ভগবতভাবের উদ্রেক হল এবং তারা সৃষ্টি করল অসংখ্য দেবতা-গোষ্ঠী। পরাক্রমশালী ব্যক্তিবিশেষকেও তারা দেবজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই দেবতারা আদিম মানুষের ভগবতগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেই চলল। বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসাবিদ্যা তখন মানুষের আয়ত্তে ছিল না।

পরবর্তীকালের হিন্দুগণের বিশ্লেষণশীল ও সৃজনকারী দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি আছেন সেই তথ্যকে বিশ্বাস করেন না। কেননা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত নিদর্শন প্রথমতঃ ছিল না। শিক্ষাগুরুর মুখনিসৃত বাণী অনুসরণ করতেন শিষ্য এবং শিষ্য থেকে শিষ্যান্তরে সেই বাণী প্রচারিত হত। আমাদের পূর্বপুরুষদের আরও একটি অসুবিধা ছিল তাঁরা চিত্রের মাধ্যমেও বিশেষ কিছু ভবিষ্যতের জন্যে রেখে যান নি। ভারতের প্রাচীনতম গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে মধ্য প্রদেশের শ্যামলা পর্বতের ধর্মগিরিতে; চিত্রটি তাম্রযুগের মানুষের আঁকা। চিত্রটিতে দেখা যায় যে তাম্রযুগের কতিপয় শিকারী একটি বন্য মহিষের

হৃদযন্ত্রের দিকে লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপরত। সুতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে তাঁরা হৃদযন্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন। আমরা উক্ত চিত্র থেকে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সেই তাম্রযুগের মানুষ মানব হৃদয়ের অবস্থান ও কার্যকারিতাও জানতেন।

চিত্র—৮

আর্যগণের ভারতে আগমণের বহু শতাব্দী পূর্বে সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদারো, চান্হুদারো, হরপ্পা, রোপার এবং গুজরাটের লোথাল নামক স্থানে এক সুসভ্য জাতি বাস করত। সেই জাতীয় লোকেরা তিগরীস্ ও অয়ফ্রাতিস্ নদীর অববাহিকায় বসবাসকারী সভ্য এলামাইট, সুমেরীয় এবং ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট দ্বীপবাসী মিনোয়ানগণের সমসাময়িক ছিলেন। সিন্ধুনদের অববাহিকার সেই সভ্য মানুষেরা খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বে যে চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসরণ করতেন সে সম্বন্ধে কোন লিখিত বা চিত্রিত প্রমাণ নেই। অবশ্য সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত বহু পাথরের মোহরের উপরে যে সমস্ত চিত্র ও লেখন খচিত আছে সেগুলি আজও সভ্য মানুষের কাছে দুর্বোধ্য। সিন্ধুনদের মানুষেরা বোধহয় ভৌতিক, ধর্মীয় ও কাল্পনিক প্রক্রিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করতেন। জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাদের যে অতি আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ধারণা ছিল সেটা বোঝা যায় তাদের তৈরী গৃহ, পথ, স্নানাগার ও পয়ঃপ্রণালীর গঠন বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তি শৈলী দেখে।

চিত্র—৯, ১০, ১১, ১২, ১৩

যখন আর্যরা সিন্ধু অববাহিকায় প্রবেশ করলেন তারা নিয়ে এলেন তাঁদের দেবতাসমষ্টি, সামাজিক নিয়মাবলী এবং প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রের বিধি ও প্রথা। ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন কৃষ্টির অনুগামী হলেও সিন্ধু সভ্যতা তাদের উপরেও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর্যদের কৃষ্টি ও চিকিৎসাশাস্ত্রে মূল সূত্র পাওয়া যায় তাদের রচিত ৪টি বেদের মধ্যে। প্রচলিত আছে যে, মানবজাতির সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা খৃষ্টজন্মের ৬০০০ বৎসর আগে তৎকালীন জ্ঞানী ব্যক্তিদের বেদশিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সেই শিক্ষা মৌখিকভাবে ভবিষ্যতে প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই অনুমান করেন যে ঋগ্‌বেদ খৃষ্টজন্মের ২০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। ঋগ্‌বেদের মধ্যেই নিহিত আছে প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসার প্রাথমিক চিন্তাধারা। সাম্‌বেদও যজুর্বেদ ও ঋগ্‌বেদের সমধর্মী। পরবর্তীকালে রচিত অথর্ববেদের মধ্যে রোগের

চিকিৎসার বহু নিয়মাবলী আছে। বেদের সংকলিত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে সংহিতা নামক বহু মহাকোষ রচিত হয়েছিল।

বর্তমানে বহু প্রচলিত আয়ুর্বেদ কথাটির অর্থ আয়ু অর্থাৎ জীবন এবং বেদ অর্থাৎ জ্ঞান, অর্থাৎ জীবনরক্ষার জ্ঞান। সরল ভাষায় আয়ুর্বেদ প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মুখ্য পুস্তক ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদে প্রচলিত চিকিৎসার বিধি কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তরোত্তর উন্নত হয়েছিল ও শিক্ষক থেকে শিষ্য এবং শিষ্য থেকে শিষ্যান্তরে প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমক চিকিৎসাবিধিও বেদোক্ত চিকিৎসাবিধির মত ভৌতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ৬০০ বৎসর পূর্বে প্রচলিত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্রহ্মা এক লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন যার মধ্যে কায়চিকিৎসা (মেডিসন) ও শল্যতন্ত্র (সার্জারী) দুটি প্রধান উপখণ্ড ছিল। ব্রহ্মা প্রথমে দক্ষ প্রজাপতিকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর সুযোগ্য ছাত্র সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমার নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়কে সেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গের ভিষক্ ছিলেন কিন্তু বেদে তার কোনও উল্লেখ নেই। সূর্য্যের প্রবল তেজ সহ্য করতে না পেরে সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা তাঁর ছায়া মূর্তিকে রেখে অশ্বীরূপ ধারণ করে উত্তর মেরুতে পলায়ন করেছিলেন। সূর্য সংজ্ঞার প্রবঞ্চনা ধরতে পেরে তাঁর সহিত মিলিত হলেন। ফলে সংজ্ঞার অশ্বিনীকুমার নামক যমজপুত্র হল। কাহিনীটি প্রাগ্ বৈদিক বা বৈদিক নয়। ঐতিহাসিকগণের মতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বিবরণী সম্ভবতঃ পৌরাণিক কল্পনা। তাঁরা যে রোগ নিরাময়কারী দেবতা তা আরও পরবর্তীকালের কল্পনা।

ঋগ্‌বেদে তাঁদের "অশ্বিদ্বয়" বা "অশ্বিনৌ" নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্‌বেদে ওঁদের আরও দুইটি নাম পাওয়া গিয়াছে যথা "দস্র" ও "নাসত্য"। ঋগ্‌বেদের দশ মণ্ডলের একশ উনত্রিশ সূক্তকে "নাসদীয় সূক্ত" বলা হয় কারণ এই খণ্ডের দ্রষ্টা নাসত্য বা অশ্বিনীকুমারদ্বয়। আচার্য আগ্রায়ন বলেন যে, অসত্য ভাষণ রহিত বলিয়া অশ্বিদ্বরের নাম নাসত্য। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র, অগ্নি ও সোমদেবতার স্তুতির পরেই অশ্বিদ্বয়ের স্থান। কথিত আছে যে, অশ্বিদ্বয়ের একজন জ্যোতির দ্বারা ও অপরজন রসের দ্বারা সর্বজগতকে পরিব্যাপ্ত করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনেল মনে করেন যে, অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি সম্ভবতঃ

প্রাক্ বৈদিক যুগে, পরবর্তীকালে তাঁরা বৈদিক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। গোল্ডষ্ট্যকের ও হপ্‌কিন্স্ মনে করেন উষার পূর্বে আলোক-অন্ধকার অবস্থা যে সময় আলোককে অন্ধকার হতে বা অন্ধকারকে আলো হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না সেই যুক্ত প্রাকৃতিক অবস্থাই অশ্বিদ্বয়। লুড্‌হিবগ্ মনে করেন যে অশ্বিদয় চন্দ্র ও সূর্য। ম্যাকসমূল্যের বলেন যে, অশ্বিদ্বয় উভয় প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল। হিবন্তেরনিৎস্ বলেন যে, অশ্বিদ্বয় অপরাপর বৈদিক দেবতাগণের ন্যায় নৈসর্গিক ঘটনা হতে উদ্ভূত। তাঁর মতে গ্রীক পুরাণে বর্ণিত জিউস্ ও এরিনিস্ কর্তৃক অশ্ব ও অশ্বী রূপ ধারণ করে এরিয়ন ও দেশপিয়ান্ নামক দুই সন্তানের জন্মদান বৈদিক রূপক থেকে গ্রীসের পুরাণে এসেছে।

অশ্বিদ্বয় যে রোগ নিরাময়কারী তার কিছু অস্পষ্ট ইঙ্গিত বৈদিক শব্দতত্ত্বে আছে। মুনিগণের মতে অশ্বিদ্বয় সর্বজন পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন এবং একজন জ্যোতির দ্বারা ও অপরজন রসের দ্বারা পরোপকার করেন। ওল্ডেনবুর্গ বলেছেন যে, পরহিতকর কার্যের জন্যই অশ্বিদ্বয়কে দেবতাদের ভিষকরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

চিত্র—১৪

কিথ্ ও ম্যাক্‌ডোনেল্ নামক পণ্ডিতদ্বয় বলেছেন যে অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয় রোগগ্রস্ত অঙ্গছেদন এবং রোগগ্রস্ত অক্ষিগোলক উৎপাটন করতে পারতেন। হুগো ভিঙ্কলের নামক প্রখ্যাত জার্মাণ প্রত্নতত্ত্ববিদ এশিয়া মাইনরের কাপ্পাদোচিয়া প্রদেশের বোঘাজ্‌কিও নামক স্থানে খনন কার্য করে মৃত্তিকা ফলকের উপর বানমুখী লিপিতে লিখিত বহু পুস্তকে বেদে উল্লিখিত ভগবানগণের নাম পেয়েছেন এবং ইহা ব্যতীত বহু ভারতীয় চিকিৎসা চিন্তাধারাও উক্ত পুস্তকসমূহে লিখিত আছে।

সুতরাং খৃষ্টজন্মের ১৬০০ বৎসর পূর্বে বোঘাজ্‌কিওতে বসবাসকারী মিতান্নী-গণও বেদের ভগবান ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ঈশ্বরকূলের প্রধান ইন্দ্রকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং অনুমান করা হয় ইন্দ্রের নিকট হতে সর্বপ্রথম ভরদ্বাজ নামক ব্যক্তি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি আত্রেয়কে

চিত্র—১৫

শিক্ষা দেন এবং অপরাপর মুনিগণকেও ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

যাঁদের মধ্যে অগ্নিবেশ আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। বিখ্যাত প্রচীন ভারতীয় ভেষজ চিকিৎসক চরক তাঁর "চরক সংহিতায়" বলেছেন যে তিনি তাঁর গুরু আত্রেয়কে সদাই অনুসরণ করেছেন।

চরক কায়চিকিৎসক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটি মৌলিক উপাদান দ্বারা (ত্রিদোষ) দেহের সমস্ত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া পরিচালিত হয়। প্রাচীন গ্রীকগণও উক্ত মতের অনুসারী ছিলেন। চরক অরণ্যচারী পশুপালকদের নিকট হতে বিভিন্ন ঔষধিগুণবিশিষ্ট লতাগুল্ম সংগ্রহ করে চিকিৎসাবিদ্যায় প্রয়োগ করতেন।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, প্রথমতঃ শিক্ষা আরম্ভ করবার পূর্বে প্রয়োজন উপযুক্ত গুরু নির্বাচন। শিক্ষার্থীকে হতে হবে ধীরচিত্ত। সুরা, নারী, পরকুৎসা, মৃগয়া, নৃত্য ও গীত প্রভৃতিতে আসক্তি থাকলে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাঘাত হবে।

চিত্র—১৬

অপর এক কিংবদন্তীতে বলা হয় যে, ইন্দ্র ধন্বন্তরী নামক ব্যক্তিকে সমগ্র আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। যিনি কাশীরাজ দীবদাস রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সুশ্রুতের শিক্ষাগুরু। অতি পরিতাপের বিষয় যে মূল আয়ুর্বেদের কোন পুস্তক আজ আর বর্তমান নেই। কিন্তু চরক ও সুশ্রুত সংহিতার মধ্য দিয়েই আমরা তার কিছু অংশের পরিচয় পাই। আনুমানিক খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর আগে ঐ সংহিতা দুটি রচিত হয়েছিল।

সুশ্রুত সংহিতা শল্যচিকিৎসাধর্মী এবং চরক সংহিতা কায় চিকিৎসাধর্মী। উভয় পুস্তকই বিজ্ঞানভিত্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তাসমৃদ্ধ। উভয় পুস্তকেরই মূল প্রণেতাগণ কুসংস্কারাবদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে চিকিৎসাবিদ্যাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন। সুশ্রুত সংহিতা বর্তমানেও প্রাচীন ভারতীয় শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে সমাদৃত। পরবর্তীকালে নাগার্জুন নামক বৌদ্ধ ভিক্ষু চিকিৎসক সুশ্রুত সংহিতার আমূল সংস্করণ ও সম্পাদনা করেন। বর্তমানে প্রচলিত সুশ্রুত সংহিতা উক্ত সংস্করণেরই প্রতিলিপি। সুশ্রুত সংহিতার সর্বপ্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত কবিরাজ কুঞ্জলাল ভিষগরত্ন ভাদুড়ী মহাশয়। গ্রন্থটি এখনও সমগ্র পৃথিবীর চিকিৎসা ঐতিহাসিকগণের মধ্যে সমাদৃত।

প্রাচীন ভারতীয়গণ ছিলেন শল্যচিকিৎসা, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান ও ভেষজশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। বিংশ শতাব্দীতে বহুল প্রচলিত শল্যচিকিৎসার দ্বারা খণ্ডিত নাসিকার পুনর্গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শল্যচিকিৎসকগণেরই অবদান। আজও উক্ত পদ্ধতি "ভারতীয় নাসিকা গঠন শল্যতন্ত্র" (ইণ্ডিয়ান রাইনোপ্লাষ্টি) নামে পরিচিত।

চিত্র—১৭

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই সর্বপ্রথম মানুষের শরীরের এক স্থান হতে অন্য স্থানে চর্ম স্থানান্তরণ ও সংযোজনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সুশ্রুত তাঁর রচিত "সুশ্রুত সংহিতা" নামক পুস্তকে শল্যচিকিৎসা, ভেষজবিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, শারীরস্থান, ধাত্রীবিদ্যা, জীববিদ্যা, চক্ষুরোগবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ মতবাদ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তিনি স্বয়ং শতাধিক শল্যচিকিৎসাযন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে বহু যন্ত্র আধুনিকযুগের শল্য যন্ত্র নির্মাণের পথ প্রদর্শক।

চিত্র—১৮

সুশ্রুত-এর কালে মানব শরীরের শারীরস্থান পাঠের জন্য এক অভিনব শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ছুরিকার দ্বারা শবব্যবচ্ছেদ না করে মৃতদেহ কুশাচ্ছাদিত করে নদীর অগভীর জলে নিমজ্জিত রাখা হত। ধীরে ধীরে শবের পচন আরম্ভ হলে অতি সহজেই চর্ম হতে স্তরে স্তরে দেহাবরণ উন্মোচন করে ছাত্ররা শারীরস্থান বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করত। সুশ্রুতই উপরিউক্ত অভিনব শবব্যবচ্ছেদ পদ্ধতির উদ্ভাবক্।

সুশ্রুত শল্যতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত করেছিলেন যথা:—(১) ছেদন (এ্যাম্‌পুটেশম্), (২) ভেদন (এক্‌শিসন্), (৩) লেখন (স্ক্রেপিং), (৪) এস্থন (প্রোবিং), (৫) আহরণ (একস্‌ট্রাক্‌শন্), (৬) বিশ্রবণ (ড্রেনেজ) এবং (৭) সীবন (স্যুচারিং)।

বৌদ্ধযুগে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁর শিষ্যরা রোগগ্রস্ত হলে পরিচর্যা করতেন। তাঁর স্বকীয় চিকিৎসক জীবক শল্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং মস্তিষ্কের শল্য চিকিৎসাও করতেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎজিং

চিত্র—১৯

বলেছেন যে, বুদ্ধদেব নিজেও চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। বৌদ্ধযুগের

চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুর্বেদ এর অনুসারী ছিল। সে যুগের চিকিৎসকেরাও আয়ুর্বেদোক্ত "ত্রিদোষ" মতবাদের ভিত্তিতে চিকিৎসা করতেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বাউয়ার মধ্য এশিয়ার কাসগড়ের এক বৌদ্ধ স্তূপে একটি গুপ্তযুগের লিপিতে লিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছিলেন। সেই লিপিতে বুদ্ধদেবকে "ভেষজগুরু" নামে চিকিৎসাশাস্ত্রের ভগবান বলে উল্লিখিত করা হয়েছে। প্রাচীন চীন দেশে তিনি "ভূ-গুরু" এবং বর্তমান জাপানেও তিনি "ইয়াকুশু নিওরাই" বা গুরুদেব নামে পরিচিত।

ইৎজিং লিখে গিয়েছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারসমূহে আয়ুর্বেদের মতবাদ অনুসারে রোগের চিকিৎসা করা হত।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র রাহুল ও তাঁর বিখ্যাত শিষ্য সম্রাট অশোক বহু আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদও সেই সমস্ত দেশে প্রচারিত হয়েছিল। দুই হাজার বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে হিন্দু কৃষ্টি ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় লিখিত এক চিকিৎসা পুস্তকে ঔষধকে বলা হয়েছে "উষদ" এবং "ত্রিদোষ" "ত্রিনাড়ী" নামে অভিহিত। চৈনিক আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বকাল পর্যন্ত তিব্বতে আয়ুর্বেদানুগ চিকিৎসা করা হত। লাসার "চাকপোরি" চিকিৎসা বিদ্যালয়ে তিব্বতী ভাষায় অনুদিত বহু সংস্কৃত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে। তন্মধ্যে "ঋগিউদ্‌বিজ" অর্থাৎ "চতুর্তন্ত্র" উল্লেখযোগ্য। পুস্তকটির আদি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির আর কোনও অস্তিত্ব নেই। তিব্বত থেকে আয়ুর্বেদ মঙ্গোলিয়া ও উত্তর পশ্চিম সাইবেরিয়া পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। চীন দেশের সিংকিয়াংএর "কুম্‌বুম্‌" বৌদ্ধবিহারে হিন্দু চিকিৎসা পদ্ধতি ভিত্তিক অনেক প্রাচীর চিত্র আছে। মঙ্গোলিয়ায় ইয়ুং হোকুং বিহারেও বহু অনুরূপ চিত্র আছে। উক্ত বিহারে প্রাচীনকালে ছাত্রগণ চীনের বেইজিং, মঙ্গোলিয়ার উগ্রা, কি আখতা ও কোবোদো, বৈকাল হ্রদের তীরবর্তী সংস্কৃত ভাষাভাষী বুরিয়াৎ দেশ, ভল্গা তীরবর্তী কালমুক্‌-দেশ, মাঞ্চুদেশের ৎসিংসিথার, কোকোনর এবং লাসা থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার মানসে আসতেন।

লেনিনগ্রাদ-এর বিখ্যাত আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসক বামায়েভ উপরিউক্ত মঙ্গোলীয় বিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত

রোগীদের মধ্যে ছিলেন বুখারিণ, রাইকোভ, আলেকৃসি টলষ্টয় এমন কি যোশেফ্ স্তালিনও।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ অভ্যুত্থান ঘটেছিল। সেই সময় বৃদ্ধ ভাগভট্ট চরক ও সুশ্রুত সংহিতার সমন্বয়ে "অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ" নামক এক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালে কনিষ্ঠ ভাগভট্ট "অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা" নামক আরও একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা ও অষ্টাঙ্গ সংগ্রহকে একত্রে "বৃদ্ধত্রয়ী" নামে অভিহিত করা হত।

অষ্টম খৃষ্টাব্দে মাধবাচার্য "নিদান" নামে সর্বপ্রথম ভারতীয় নিদানশাস্ত্র (প্যাথলজী) বিষয় পুস্তক লেখেন। চরম উৎকর্ষতার জন্য উক্ত গ্রন্থটিও

চিত্র—২০

পরম সমাদৃত হয়েছিল। বর্তমানের আয়ুর্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে মাধব নিদানশাস্ত্রে, ভাগভট বিধান-এ, সুশ্রুত শল্যতন্ত্রে এবং চরক কায়চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক এক দিক্পাল। ইন্দুকার এর পুত্র মাধব, মাধবকার বা মাধবাচার্য রোগ নিদানশাস্ত্রকে ৭৯টি অধ্যায়ভুক্ত করেছিলেন। "মসুরিকা" বা বসন্ত রোগের উপর তাঁর জ্ঞানপ্রকাশ ছিল অনবদ্য। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র "ভাবপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে "নিদান" গ্রন্থটির পুনর্সম্পাদনা করেছিলেন। উক্ত সম্পাদিত সংস্করণটি আরবীগণ "নিদান", "বদন্" ও "ইয়েদান" প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অনুবাদ করেছিল। ভাবমিশ্র বারাণসী নগরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তাঁর খ্যাতি দিকে দিকে এত ব্যাপ্ত হয়েছিল যে তাঁকে তৎকালীন চিকিৎসা জগতের মধ্যমণি বলা হত।

চিত্র—২১ ও ২২

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন চৈনিকগণ খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব হতেই চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। সেনন্যুং (৩০০০ খৃঃ পূঃ) নামক চৈনিক নৃপতি অবসর বিনোদনের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রাভ্যাস করতেন। "পেন্ সাউ" নামক বৃহৎ গ্রন্থে তিনি বহু ঔষধের ব্যবহারবিধি লিখে গিয়েছেন। খৃঃ পূঃ ২৬৫০ অব্দে হোয়াংতি নামক অপর এক চৈনিক নৃপতি "নাইচিং" নামক একখানি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। উইলিয়াম হার্ভের জন্মের বহু পূর্বেই হোয়াংতি লিখে

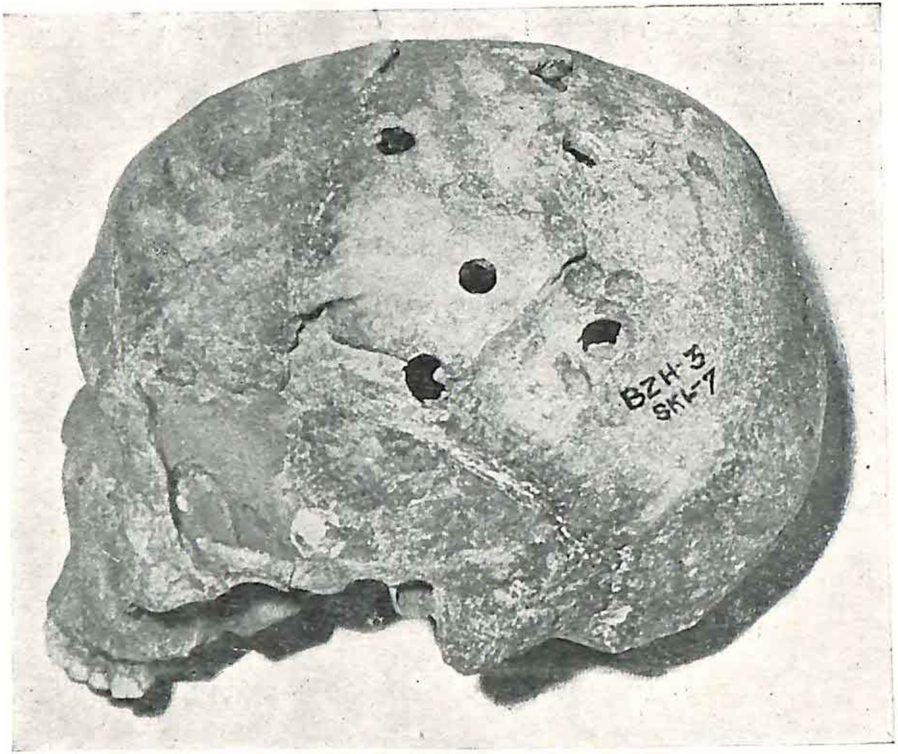

চিত্র ৫— ভারতের বুর্জাহোম-এ প্রাপ্ত সছিদ্র করোটি (আনুমানিক ২৩৭৫ খৃঃ পূঃ—ভারতীয় নৃতত্ত্ব সংস্থার সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

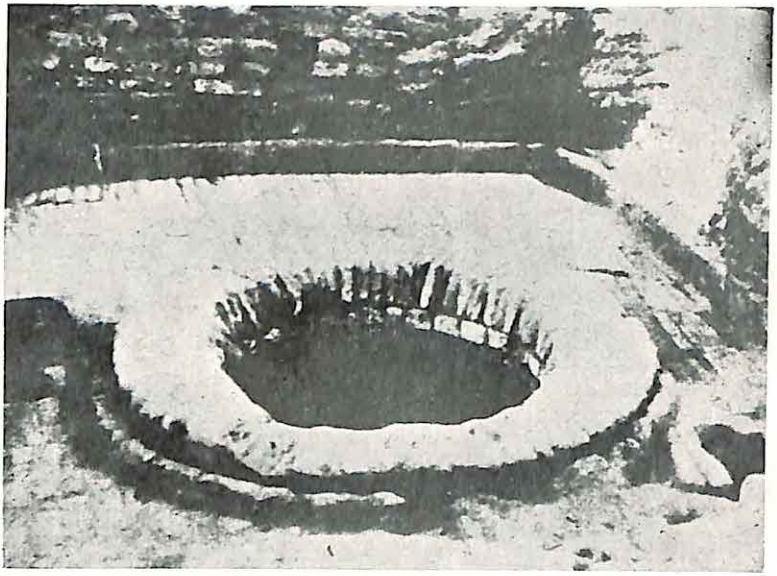

চিত্র ৯—মহেঞ্জোদারো-এর কূপ।

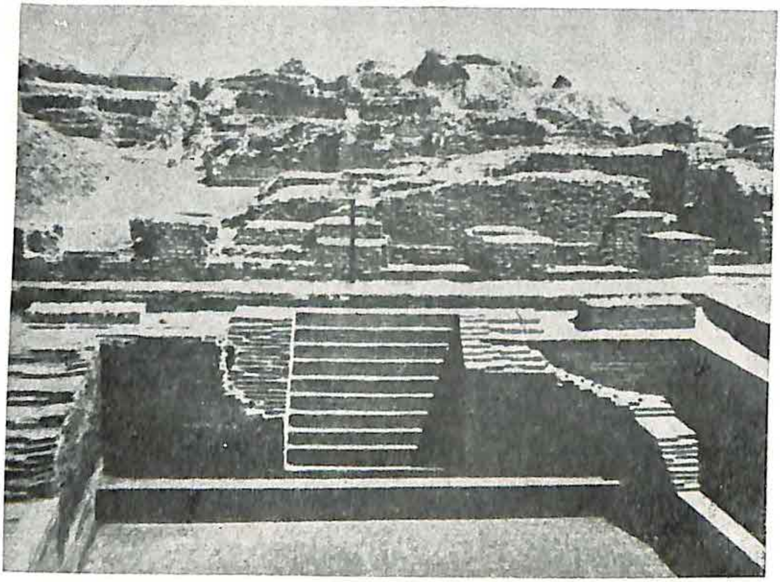

চিত্র ১০—মহেঞ্জোদারো-এর জনসাধারণের স্নানাগার।

গিয়েছেন যে, শরীরের সমস্ত রক্ত হৃদ্‌যন্ত্র দ্বারা চক্রাকারে সঞ্চালিত হয়। কিন্‌ল্যুং নামক অপর এক নৃপতি ৪০ খণ্ডে বিভক্ত এক অতি বৃহৎ চিকিৎসা সংকলন রচনা করেছিলেন। আয়ুর্বেদের পঞ্চভূতের ন্যায় তিনি বলতেন যে, মানবশরীর মৃত্তিকা, অগ্নি, জল, কাষ্ঠ ও ধাতু এই পাঁচটি উপাদান দ্বারা গঠিত।

একথা অবিসংবাদিত যে, বৌদ্ধযুগে প্রচলিত প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রকে প্রভাবান্বিত করেছিল। বৌদ্ধ তীর্থঙ্কর বা ধর্ম প্রচারকেরা ধর্ম প্রচারের মানসে দুর্গম হিমালয়ের গিরিবর্ত্ম পরিক্রমা করে তিব্বতে যান ও তিব্বতের সংলগ্ন চীন ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম সমগ্র চীন, মঙ্গোলিয়া ও কোরিয়া দেশে প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে উহা জাপানেও প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে অপরাপর ভারতীয় শাস্ত্রসমূহও উক্ত দেশসমূহে প্রবর্তিত হয়। চৈনিক প্রাচীন ধারার চিকিৎসা-শাস্ত্রে সেইজন্য এখনও আয়ুর্বেদের লক্ষণ বিদ্যমান।

বর্তমান জগতের চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুল প্রচলিত সূচিকাবিদ্ধকরণ (এ্যাকুপাংচার, সংস্কৃত : অকুশ, অঙ্কুশ=সূচিকা ; লাতিন : অ্যাকুশ= সূচিকা) প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের অতি বিশিষ্ট অবদান। সূচিকাবিদ্ধ-করণ দ্বারা শরীরের বিভিন্ন স্থানে অবসাদ ঘটানো যায় এবং সেই সকল স্থানে বেদনা নিরোধিত হয়। সূচিকাবিদ্ধকরণ দ্বারা বিনা বেদনায় অস্ত্রোপচার করা সম্ভব। সূচিকাবিদ্ধকরণ করলে কেন অবসাদ হয় সে সম্বন্ধে বহু গবেষণার পর মেল্‌জাক্ ও ওয়াল্ নামক দুই শারীরবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত সূচিকাবিদ্ধণের ফলে সাময়িকভাবে মেরুমজ্জার মধ্যে অবস্থিত স্নায়ু সংযোগস্থলে কপাটিকা বন্ধ হওয়ার মত এক ঘটনা ঘটে (গেট কণ্ট্রোল)। উক্ত ঘটনার ফলে বেদনার অনুভূতি স্নায়ুরজ্জুর মধ্য দিয়ে মেরুমজ্জার মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে না এবং রোগীর বেদনার অনুভূতি বিলুপ্ত হয়।

জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্র থেকেই প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু জাপানীগণের বহুকাল ধরে অজ্ঞাতবাসের ফলে প্রাচীন জাপানী চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। ১৮ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ জাপানী শল্যচিকিৎসকের নাম সেইস্যু হানাওকা (১৭৬০—১৮৩৫)।

তিনি হিরায়ামা শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা তথাকথিত এক প্রতীচ্য শল্যচিকিৎসাবিদ ছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে সেইস্থ কিয়োতো শহরে

চিত্র—২৩

চৈনিক চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন ও তৎপর প্রকৃত প্রতীচ্য শল্যবিদ্যাভ্যাস করেন। সেইস্থর জীবৎকালে ওলন্দাজ ছাড়া কোনও য়ুরোপীয়কে জাপানে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। প্রতীচ্য শিক্ষা ওলন্দাজদের মাধ্যমে নাগাসাকি বন্দরের পথে জাপানে প্রবেশ করেছিল। ওলন্দাজগণ কর্তৃক প্রবর্তিত চিকিৎসা-শাস্ত্রকে "রাঙ্গাকু" নামে অভিহিত করা হত।

সমসাময়িক কালের "রাঙ্গাকু" পদ্ধতিতে শিক্ষিত অপর দুই পণ্ডিতের নাম ছিল যথাক্রমে গেনপাকু স্থগিতা ও রিয়োতাকু মাইনো। রাঙ্গাকু চিকিৎসাবিদ্যা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও মৌলিক চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রই জাপানে পরম সমাদৃত ছিল। প্রতীচ্য চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত বহু জাপানী চিকিৎসকও চৈনিক চিকিৎসাবিধি অনুসরণ করতেন। সেইস্থর ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি সর্বপ্রথম চৈনিক শল্যশাস্ত্রজ্ঞ হুয়া তো-এর ঘনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন এবং স্বীয় উদ্ভাবিত এক প্রকার অবচেতক ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীর দেহে দুরূহ অস্ত্রোপচার করতেন। সেই বিখ্যাত ও ফলদায়ী অবচেতক ঔষধের নাম"ৎস্থসেন্‌সান্"। ঔষধটি **দাতুরা, এ্যাকোনাইট, আংগেলিকা দাহুরিয়া, আংগেলিকা দেকুরসিভা, লিগুইসটিকুম্ ওয়াল্লিচি** ও **আরিসেইমা জাপানিকুম্** প্রভৃতি ভেষজের এক সংমিশ্রণ। বর্তমানে উক্ত সমস্ত ভেষজের গুণাবলী ভেষজ বিজ্ঞানে সুপরিজ্ঞাত।

চৈনিক স্থচিকা চিকিৎসার অনুকরণে প্রাচীন জাপানে "মোস্কা" নামক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। উক্ত চিকিৎসায় স্থচিকাবিদ্ধনের পরিবর্তে বেদনা উপশমের জন্য শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে অগ্নিদ্বারা ফোস্কা স্বষ্টি করা হত। ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও প্রচলিত "গুল" দেওয়া বা ফোস্কা চিকিৎসা প্রচলিত। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের মতে উক্ত চিকিৎসা "কাউণ্টার ইরিটেশান্ থেরাপি" ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বর্তমানকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জাপানীদের উৎকর্ষ দেখে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। এ্যাডমিরাল পেরী নামক মার্কিণ নাবিক পৃথিবীর কাছে জাপানকে উন্মুক্ত করেন এবং জাপানীগণ উত্তরোত্তর চিকিৎসাবিজ্ঞান তথা বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে অভুতপূর্ব পারদর্শিতা অর্জন করেন। আজকের

পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষে জাপান আমেরিকা, জার্মাণী ও অপরাপর উন্নত দেশগুলি অপেক্ষা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নতিশীল এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন জটিল যন্ত্র নির্মাণে জাপানের কুশলতা আশ্চর্যজনক। আজকের জাপান পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনেও পৃথিবীতে অগ্রগণ্য।

প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

বর্তমান থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশের চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সিমোঁ ছ লা লুব্রে নামক ফরাসী রাজদূতের লিখন থেকে জানা যায়। তিনি তৎকালীন থাই রাজধানী 'আয়ুথায়া' বা অযোধ্যা নগরীতে বসবাস করতেন। তিনি লিখেছেন যে, প্রাচীনতম শ্যামদেশীয় চিকিৎসা পুস্তক সপ্তদশ শতকে সংকলিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মত প্রাচীন শ্যামদেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা গুরুর মুখ নিঃসৃত বাণী থেকে শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত হত। কালক্রমে উক্ত বিদ্যাধারার কিয়দংশ খমের ও পালি ভাষায় তালপত্রে লিখিত হয়। পরবর্তী-কালে ঐগুলি মূল থাই ভাষাতেও অনূদিত হয়। য়ুরোপীয়দের মধ্যে প্রচলিত লাতিন ভাষার ন্যায় থাইদেশে পালি ও সংস্কৃত ভাষা পরম সমাদৃত ছিল। থাইভাষার চিকিৎসা পুস্তকে ভগবানবুদ্ধের চিকিৎসক জীবক "জীবক কোমারবচ্চ" নামে পরিচিত। প্রাচীন থাই চিকিৎসাবিদ্যাও ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অনুকরণ মাত্র।

বর্তমান থাইল্যাণ্ডে প্রতীচ্য চিকিৎশাস্ত্রের প্রবর্তন করেন সম্রাট চুলালঙ্করণ। তিনি অতি প্রগতিপন্থী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রতীচ্যের এবং মার্কিন দেশের বহু চিকিৎসককে তিনি থাইল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ করে আনেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। রাজকোষপুষ্ট আধুনিক থাই চিকিৎসাবিধি অতি উচ্চমানের।

সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

সুমেরীয়গণের রাজধানী ছিল অয়ফ্রাতিস্ নদীর তীরবর্তী উর নামক নগরে। খৃষ্টজন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে সুমেরীয় সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে। সুমেরীয় সভ্যতা আসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন। উর নগরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় বহু বানমুখী লিপিতে লিখিত মৃত্তিকাফলক

চিত্র—২৪

আবিষ্কৃত হয়। উক্ত ফলকসমূহের কিয়দংশে সুমেরীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের বিশদ বিবরণ আছে। বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় নৃপতি হাম্মুরাবী (১৯৪৮-১৯০৫ খৃঃ পূঃ) তাঁর শাসনকালে প্রচলিত চিকিৎসাবিধি ও সামাজিক নিয়মাবলী প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। উক্ত নিয়মাবলী পরবর্তীকালে "হাম্মুরাবীর নির্দেশ" নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। একটি লিপিতে তিনি ধনাঢ্য রোগীর চিকিৎসার ব্যয় এবং দরিদ্রের চিকিৎসার ব্যয়ের পরিমাণও স্থির করে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চিকিৎসকের অসাবধানতায় রোগীর শারীরিক ক্ষতি হলে অভিযুক্ত চিকিৎসকের হস্তচ্ছেদন করা হত। হেরোডোটুস্ বলেছেন যে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয়গণ চিকিৎসা-ব্যবসা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসুক ও সচেতন ছিলেন। অনেক সময় তাঁরা অজ্ঞাত বা অসহায় রোগীকে শহরের জনাকীর্ণ স্থানে এনে রাখতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, কোন পরিব্রাজক চিকিৎসক রোগীটিকে লক্ষ্য করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রাচীন ব্যাবিলনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণও চিকিৎসা করতেন।

চিত্র—২৫ ও ২৬

প্রাচীন মিশরীয় চিকিৎসাশাস্ত্র

মিশরের ফেরোদের রাজত্বকালে সাধারণতঃ পুরোহিতগণ চিকিৎসা-ব্যবসা করতেন। ইমহোটেপ্ নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক মিশরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একাধারে ছিলেন চিকিৎসক ও স্থাপত্যবিদ্যাবিদ্।

চিত্র—২৭

সাকারা-এর বিখ্যাত পিরামিড নির্মাণে তিনি সহায়তা করেছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ দাবী করেন যে, গ্রীক চিকিৎসা দেবতা ইস্কুলাপিউস্ ও ইমহোটেপ্ অভিন্ন ব্যক্তি।

প্রাচীন মিশরীয়গণ মনে করতেন যে, কোন এক অদৃশ্য শত্রুর প্রভাবে রোগ মানবশরীরে প্রবেশ করে। ক্রমে ক্রমে শরীরের অস্থি, মজ্জা ও মাংস ক্ষয় করে সেই রোগ রোগীকে হত্যা করে। এডুইন স্মিথ্ ও এবেরস্ কর্তৃক ব্যাখ্যাকৃত প্রাচীন মিশরীয় ভূর্জ্জপত্র লিখনে অহিফেন্, হেমলক্, তাম্রঘটিত লবণ ও এরণ্ড তৈলের ব্যবহারবিধি লিখিত আছে। খৃষ্টপূর্ব ৫২৫ শতকে পারসিকগণ মিশর দেশ অধিকার করেন এবং দক্ষিণ মিশরের সাইস্ নামক স্থানে একটি বৃহৎ চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। হেরোডোটুস্ উক্ত বিদ্যালয়ের

ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পারসিকদের পরবর্তীকালে মাসিডোনিয়ার আলেকজাণ্ডার মিশর অধিকার করেন এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরী স্থাপন করেন। তাঁর পরবর্তীকালে গ্রীক পণ্ডিতগণ প্রাচীন মিশরীয় চিত্রলিপি পঠনে সক্ষম হন। এক গ্রীক পণ্ডিত কর্তৃক লিখিত প্রস্তরলিপির সাহায্যে পরবর্তীকালে মিশরীয় লিপি পঠনের সুবিধা হয়। উক্ত প্রস্তরলিপি নীলনদের মোহনার নিকটবর্তী রোজেট্টা নামক স্থানে এক ফরাসী সৈন্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছিল। উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার না হলে আজ মহেঞ্জোদারো লিপির মত মিশরীয় লিপির অর্থও আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেত। ইসলামধর্ম

চিত্র—২৮

প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবীগণ ক্রমাগত মিশর আক্রমণ করতে থাকেন এবং সমগ্র মিশর ও উত্তর আফ্রিকা তাঁদের কুক্ষিগত হয়। কালক্রমে প্রাচীন মিশরীয় হামিট্ সভ্যতার অবলুপ্তি ঘটে এবং প্রাচীন মিশরে আরবী সভ্যতার প্রবর্তন হয়। সেই সঙ্গে তৎকালীন আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রও মিশরে প্রবর্তিত হয়।

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র

প্রাচীন ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় চিকিৎসকগণের আহৃত জ্ঞানের সমন্বয়ে গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞান সমৃদ্ধ। ক্রীট বা ক্যাণ্ডিয়াদ্বীপবাসী সুসভ্য মিনোয়ানগণ এবং স্মিডিয়বাসীগণের নিকট তাঁরা এই বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসকারী প্রাক্ আর্যগণের মত মিনোয়ানগণও ছিলেন নির্মাণকুশলী। তাঁরা পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ প্রণালী এবং স্নানাগার নির্মাণ প্রভৃতি জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় অতি পারদর্শী ছিলেন।

খৃষ্টজন্মের প্রায় হাজার বছর আগে গ্রীকগণ মিনোয়ানদের সুরম্য ট্রয় নগরী ধ্বংস করেন। পরাজিত মিনোয়ানগণের সান্নিধ্যে এসে গ্রীকগণ শিক্ষা করেন বহু নতুন নতুন চিকিৎসাবিধি। ক্ষুদ্র এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনকারী ভারতীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়গণের সংস্পর্শে এসে তাঁরা চিকিৎসাজ্ঞান আহরণ করেছিলেন। প্রবাদ আছে যে, গ্রীক বীর এ্যাপোলো ছিলেন চিকিৎসাজ্ঞানী। তিনি এক বিচক্ষণ নরাশ্ব (সেনতাউর) চিরণকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। পোকক্-এর মতে এই নরাশ্বরা মানুষ ছিলেন এবং অত্যন্ত অশ্বারোহণ প্রিয় ছিলেন বলে কল্পনা করা হত যে তাঁরা নর ও অশ্বের সম্মিলিত

এক অদ্ভুত জীব। তিনি আরও বলেছেন যে উক্ত নরাশ্বদের পূর্বপুরুষেরা বর্তমান আফগানীস্থানের কান্দাহার বা প্রাচীন গান্ধার দেশ থেকে জীবিকা-নির্বাহের উদ্দেশ্যে গ্রীকদেশে গিয়েছিলেন। "সেনতাউর", শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পোকক্ আরও বলেছেন যে ঐ শব্দটি মূলতঃ 'কান্তাউর' বা "কান্দাহার" শব্দটির অপভ্রংশ।

চিরণ নামক নরাশ্ব এ্যাপোলোর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ইয়াসাং, এ্যাকিলেস ও ইস্কুলাপিউস্‌কে শল্য চিকিৎসা শিক্ষা দেন। বার্লিন মিউজিয়ামে

চিত্র ২৯ ও ৩০

রক্ষিত একটি গ্রীক চিত্রে দেখা যায় যে আকিলিস তাঁর সহযোগী পাত্রোক্ল্‌স-এর বাম হস্তের ক্ষতের চিকিৎসা করছেন। খৃষ্টজন্মের ৪৯০ বৎসর পূর্বে

চিত্র ৩১

ইউফ্রোনিয়স নামক চিত্রকর ঐ চিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন। আকিলিস-এর সহযোগী ইস্কুলাপিউসও চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি পারদর্শী ছিলেন। গ্রীক দেবতা প্লুটো ঈর্ষাবশতঃ আকিলিস্‌কে হত্যা করেন। গ্রীকগণ ইস্কুলাপিউসকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে "আস্কেলেপিয়া"

চিত্র—৩২

নামক বহু প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছিলেন। গ্রীকদেশের এপিডাউরুস্ নগরে এখনও একটি আস্কেলেপিয়ার ধ্বংসাবশেষ আছে।

আস্কেলেপিয়াগুলিতে পরিমিত আহার্য, অঙ্গ সঞ্চালন ও শরীর মর্দন প্রভৃতি সরল প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করা হত। উপস্থিত রোগীগণ স্নান করে পরিচ্ছন্ন হয়ে ইস্কুলাপিউসের উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করত এবং চিকিৎসার জন্য নাট মন্দিরে শয্যা গ্রহণ করত। চিকিৎসকগণ তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের দ্বারা রোগীর শরীরের অবস্থা নির্ণয় করে চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ করতেন। মন্দিরে বহু বিষহীন সর্প প্রতিপালিত হত এবং সেই সর্পদ্বারা

চিত্র—৩৩ ও ৩৪

চক্ষুরোগগ্রস্তের চক্ষু লেহন করানো হত। রোগীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য নাটমন্দিরে নৃত্য ও গীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। এখনও উক্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সিসিলির পালের্মো, ইতালীর নেপ্‌লস্, সার্দিনিয়ার ক্যাল্‌গারী ও অষ্ট্রিয়ার ষ্টিরিয়া প্রভৃতি স্থানে। মন্দিরগুলি ছিল সাধারণতঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় পার্বত্যস্থানে। মন্দিরে কোন অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ও

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 16-4-87
Acc. No. 3944

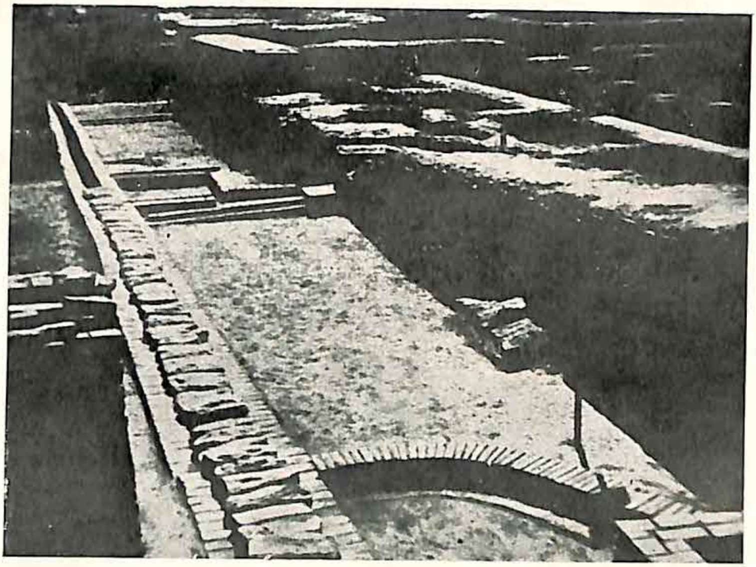

চিত্র ১১—মহেঞ্জোদারো-এর পয়ঃপ্রাণালী।

চিত্র ১২ মহেঞ্জোদারো-এর শৌচাগার।

S.C.E.R.T., West Bengal
Library

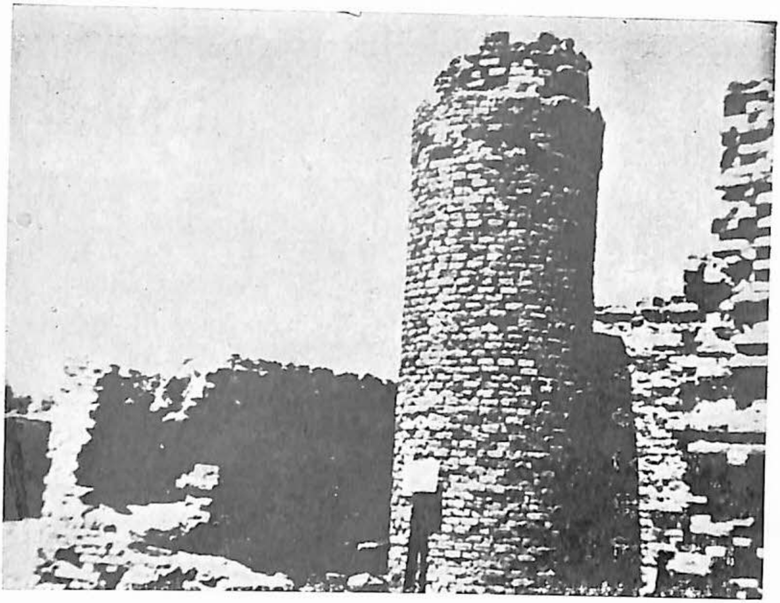

চিত্র ১৩—মহেঞ্জোদারো-এর উচ্চ জলাধার।

চিত্র ১৪—অশ্বিনী-কুমারদ্বয় (চিদাম্বরম্ ১৩শ শতক)।

চিত্র ১৫—আত্রেয় (লালগুড়ি, ১১শ শতক)

চিত্র ১৬—ধন্বন্তরি।

চিত্র ১৭—ভারতীয় নাসিকা পুর্নগঠন শৈলী

মরণাপন্ন রোগীকে স্থান দেওয়া হত না। বর্তমানকালে ভিসি, কার্লোভিভারী, বাদগাষ্টাইন ও লুর্দ প্রভৃতি স্বাস্থ্যনিবাসেও অনুরূপ বিধিনিষেধ মেনে চলা হয়। তৎকালীন চিকিৎসকগণ স্বপ্ন ও মনঃসমীক্ষায় পারদর্শী ছিলেন এবং উক্ত সমীক্ষা দ্বারা মানসিক রোগীর চিকিৎসা করতেন। বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডও স্বপ্নসমীক্ষার দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করতেন।

গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রে ইরোফিলোস্ বা হেরোফিলোস্-এর নাম অতি বিখ্যাত। খৃষ্টজন্মের ৩০০ বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "স্বাস্থ্য ভাল না থাকিলে বিজ্ঞান, শৌর্য, ঐশ্বর্য এবং বাগ্মিতা সবই ব্যর্থ"। গ্রীক চিকিৎসকগণ রোগলক্ষণ নির্ণয় না করে কখনও রোগীর চিকিৎসা করতেন না। তাঁরা আনুমানিক সিদ্ধান্তের (থিয়োরী) উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। বর্তমানে প্রচলিত "ফিজিসিয়ান" (কায়চিকিৎসক) শব্দটি গ্রীক "ফুসিস্" অর্থাৎ নিসর্গতত্ত্ববিদ থেকে উদ্ভূত।

প্রাচীন গ্রীক চিকিসাশাস্ত্রে বহু নিদর্শন আছে যে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলবাসী এশিয়দের নিকট হতে গ্রীক চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। ভারতে জাত কতকগুলি উদ্ভিদ যথা, কারদামম্ (এলাচ্) এবং সিসেম্ (তিল) গ্রীক চিকিৎসকগণ কর্তৃক সদাই ব্যবহৃত হত।

প্রাচীন য়ুরোপের সংলগ্ন এশিয় ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম চিকিৎসাবিদ্যালয় কাপ্পাদেচিয়ার স্নিডিয়া নামক স্থানে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্নিডিয়া শহরে ল্যাসিডেমেনিয়ানদের এক বসতি ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে স্নিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে

চিত্র—৩৫

মিতান্নীগণ প্রবর্তিত চিকিৎসা শৈলী শিক্ষা দেওয়া হত। সুতরাং সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপ্পোক্রাতেস মিতান্নী প্রবর্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা হিপ্পোক্রাতেস স্নিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ে কিছুকাল চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন।

কোসদ্বীপের চিকিৎসা বিদ্যালয় স্নিডিয় চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুকাল পরে স্থাপিত হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ শতকে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

চিত্র—৩৬ ও ৩৭

কবি হোমার প্রণীত "ইলিয়াড" কাব্যের ট্রোয়ান যুদ্ধের বিবরণীতে আছে যে, ১৪৭ জন আহত সৈন্যের মধ্যে ১০৬ জন বর্শাবিদ্ধ হয় এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিল। সে যুগের চিকিৎসকগণের অধিকাংশই অশিক্ষিত কারিগর শ্রেণী হতে উদ্ভূত। সাধারণতঃ পিতা বা পিতৃব্যের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে তারা বিভিন্ন শহর ঘুরে বেড়াতেন এবং কিছুকাল বিনামূল্যে চিকিৎসা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতেন। খ্যাতিলাভ করবার পর চিকিৎসার বিনিময়ে তারা উচ্চ পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। জনসাধারণ চিকিৎসকগণকে যথেষ্ট সম্মান করত কিন্তু বিদ্বান সমাজে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেকালে চিকিৎসক চুরির মত একটা উপভোগ্য ব্যাপার চলত। এক শহরের চিকিৎসক সুনাম অর্জন করলে নিকটস্থ নগরীর বাসিন্দাগণ পারিতোষিক দ্বারা তাকে প্রলুব্ধ করে নিজ নগরীতে নিয়ে যেত। অনেক সময় রোগমুক্ত ব্যক্তি কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিকিৎসকের নাম নগরের প্রকাশ্য স্থানে প্রস্তর ফলকের উপর উৎকীর্ণ করে দিত।

আথেন্স শহরের বহু লজ্জাশীলা রোগাক্রান্তা গ্রীক নারী, পুরুষ চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসা না করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন। আগ্নোডিস নামক এক স্ত্রীলোক তাঁদের দুঃখে বিগলিত হয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে চিকিৎসাশিক্ষা লাভ করেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষ চিকিৎসকদের দৃষ্টির অগোচরে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা করতেন।

পিথাগোরাস্, এ্যালেক্‌মেয়ন ও এম্পিডোক্লেস্ দার্শনিক হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত চিকিৎসাবিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পিথাগোরাস্ (৫৮০-৪৯৮ খৃঃ পূঃ) ছিলেন একাধারে দার্শনিক, অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ ও চিকিৎসক। গ্রীসের সামোস্ শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দক্ষিণ ইতালীর ক্রোটনে বসবাস করতেন। পোকক্-এর মতে তাঁর প্রকৃত নাম ছিল "বুদ্ধগুরু" বা মহাজ্ঞানী। কথিত আছে যে, তিনি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য ভারতও পরিভ্রমণ করেছিলেন। মনুষ্যেতর পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ক্রোটনের এ্যালেক্‌মেয়ন্ (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫০০) শিরা ও ধমনীর প্রভেদ বিচার করেছিলেন এবং চক্ষু, স্নায়ু ও কর্ণ প্রণালী বা "ইউষ্টাখিয়ান" নলও তাঁর আবিষ্কার। তিনি বলতেন যে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি ও জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। এম্পিডোক্লেস একটি বদ্ধ

জলাশয়ের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে একবার মহামারী রোগ নিরোধ করেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। এম্পিডোক্লেস মনোবিকারগ্রস্ত হয়ে সিসিলির এট্না আগ্নেয়গিরির গহ্বরে লম্ফন করে আত্মহত্যা করেন।

গ্রীক চিকিৎসাজগতের স্বর্ণযুগের প্রবর্তনকারী ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত ইপ্পোক্রাতেস ইরাক্লিদে বা ইপ্পোক্রাতেস ই কোস্ অর্থাৎ কোস দ্বীপের ইপ্পোক্রাতেস বা বহুজন পরিচিত হিপ্পোক্রাতেস। তাঁকে আজও প্রতীচ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক মনে করা হয়। তাঁর জন্ম হয় এক চিকিৎসক পরিবারে এবং তিনি চিকিৎসক পিতার নিকট প্রাথমিক চিকিৎসাশিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তিনি স্নিডিয়া, থ্রেস, থেসালী, ম্যাসিডোনিয়া ও আথেন্স প্রভৃতি স্থানেও শিক্ষালাভ করেন। কোস দ্বীপে অবস্থিত আস্কেলেপিয়ার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উক্ত দ্বীপের এক প্রাচীন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন।

চিত্র—৩৮ ও ৩৯

উক্ত বৃক্ষের অধস্তন বংশধর আজও বর্তমান। হিপ্পোক্রাতেস লিখিত পুস্তকের শতাধিক অনুলিপি এখনও পৃথিবীতে পাওয়া যায়। তিনি রোগের অলৌকিকতা অগ্রাহ্য করে চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুসংস্কারমুক্ত করেছিলেন। তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যময় এবং তিনি প্রাকৃতিক চিকিৎসার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের ও খনিজ পদার্থ বহুল প্রস্রবণে স্নান করতে উপদেশ দিতেন। বর্তমানকালে নল সাহায্যে পাকস্থলী থেকে অর্ধপাচ্য খাদ্য বের করে যেভাবে পরীক্ষা করা হয় তদনুরূপে হিপ্পোক্রাতেস রোগীকে বমন করিয়ে অর্ধপাচ্য খাদ্য পরীক্ষা করতেন।

হিপ্পোক্রাতেসের সমগ্র মতধারা সংকলিত হয় "করপুস্ হিপ্পোক্রাতিকুম্" নামে। সংকলনটি ৬০-৭০টি খণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন কালে লিখিত। মনে হয় ঐগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি হিপ্পোক্রাতেস কর্তৃক স্বহস্তে লিখিত। হিপ্পোক্রাতেসের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। তাঁর কার্যকাল ৪০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের অধিকাংশ সময়ে ব্যপ্ত ছিল। তিনিও প্রাচীনকালের চিকিৎসকগণের মত এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করতেন। তিনি থ্রেস, আব্দেরা, দেলোস্, প্রপনটিস্, লারিসা, মেলিবোইয়া এবং আথেন্স প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যপদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ৩৭৭ খৃঃ পূঃ লারিসা

শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বহু ছাত্র ছিল যার মধ্যে তাঁর দুই পুত্র থেসালুস ও ড্রেকন এবং জামাতা পলিবুসও চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করেন এবং তাঁরাও এক শহর থেকে অন্য শহরে চিকিৎসাবিদ্যা লাভ করার জন্য পরিভ্রমণ করেন। গ্রীক দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অ্যারিস্টটল্ তাঁদের সম্বন্ধে এবং এ্যাপোলোনিউস্, দেখিপ্পুস ও প্রাখাগোরাস নামক আরও তিনজন চিকিৎসকের সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন।

চিত্র—৪০ ও ৪১

হিপ্পোক্রাতেসের ছাত্রগণকে শিক্ষা সমাপনের পর নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করতে হত: "আমি এ্যাপোলো, ইস্কুলাপিউস, স্বাস্থ্য এবং ভগবানকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি যে, আমি প্রতিজ্ঞাগুলি পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

আমি গুরু ও পিতামাতাকে পালন করব ও তাঁদের ঋণ শোধ করব।

গুরুপুত্রগণকে নিজের ভ্রাতা জ্ঞানে স্নেহ করবো এবং যদি তাঁরা চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করেন তাহলে তাঁদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দিব। আমার অভিজ্ঞতা নিজপুত্র, গুরুপুত্র ও শিষ্যগণ ব্যতীত আর কারও কাছে প্রকাশ করব না।

আমি রোগীকে যথাসাধ্য সাহায্য করব, কখনও তার ক্ষতি করব না।

আমি কাহাকেও বিষপান করতে দেব না বা পান করতে আদেশও করব না। আমি কোনও নারীর গর্ভপাত করাব না।

আমি পাথুরীর জন্য অস্ত্রোপচার করব না। যাঁরা উক্ত চিকিৎসায় পারদর্শী তাঁদের নিকট পাথুরীগ্রস্ত রোগীকে প্রেরণ করব।

আমি রোগীর-গৃহে গিয়ে তার মঙ্গলের চেষ্টা করব, কোনও অনিষ্ট চিন্তা করব না। রোগী গৃহের কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনক্রিয়া করব না।

কোন রোগীর গোপন বিষয় ও রোগের বিষয় কারও নিকট প্রকাশ করব না।

যদি আমি শপথ বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি, তাহলে ঈশ্বর আমার মঙ্গলসাধন করবেন, অন্যথায় আমার সর্বনাশ হউক।"

উক্ত শপথবাক্যগুলি আরবী, ইহুদী এবং খৃষ্টীয় জগতেও পরম সমাদৃত ছিল এবং যে কোনও ধর্মাবলম্বী প্রাচীন চিকিৎসকগণ শপথানুগ আচরণ করতেন। কিন্তু ভারতে উক্ত শপথবাক্য কখনই পাঠ করান হয় না।

হিপ্পোক্রাতেসের উপদেশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে যে, "সিথিয়গণের ধারণা অনুযায়ী বিকলাঙ্গতা ঈশ্বর প্রদত্ত, কিন্তু আমি সেরূপ মনে করি না"।

হিপ্পোক্রাতেস কর্তৃক মৃতপ্রায় রোগীর মুখাবয়বের অপূর্ব বর্ণনা আজও পৃথিবীতে "হিপ্পোক্রাতিক্ ফেসিস্" নামে সুপ্রচলিত। তিনি বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "মৃতপ্রায় রোগীর নাসিকা অতি তীক্ষ্ণ, চক্ষু কোটরাগত, করোটির পার্শ্ববর্তী মাংসপেশী সঙ্কুচিত, কর্ণ অতি শীতল এবং কুঞ্চিত। ইহা ব্যতীত কপালের চর্ম শুষ্ক এবং সমগ্র মুখের বর্ণ হরিতাভ ও বিষণ্ণ"।

হিপ্পোক্রাতেসের দেহ বিজ্ঞান, নিদানতত্ত্ব এবং শারীরস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসকগণেরও উক্ত জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। হিপ্পোক্রাতেস মনে করতেন যে, শরীরের সুস্থতা চারি প্রকার মৌলিক পদার্থ যথা, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি ও জলের মিশ্রণ সাম্যের উপর নির্ভর করে। হিপ্পোক্রাতেসের উক্ত ধারণা প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের "পঞ্চভূত"-এর অনুরূপ। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাধারা "ত্রিদোষ"-এর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের শরীরের তিনটি প্রধান রস আছে যথা রক্ত, কফ এবং পিত্ত। তিনি বলতেন যে, রোগীকে সুস্থ করতে হলে উপরিউক্ত চারটি মৌলিক পদার্থ এবং ঐ "ত্রিরস"-এর সাম্য ঘটাতে হবে। এই সামান্য লিখনের মধ্যে হিপ্পোক্রাতেসের সম্পূর্ণ জ্ঞানের বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

শল্য চিকিৎসা সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থে হিপ্পোক্রাতেস লিখেছেন যে, শল্য-চিকিৎসা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ঠ সংখ্যক সহকারী, শল্যযন্ত্রাদি ও উপযুক্ত আলোকের প্রয়োজন। তিনি বলতেন, রোগের চরম অবস্থায় রোগীকে অত্যধিক ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করা অনুচিত। বৃদ্ধগণ অনশন সহ্য করতে পারেন কিন্তু প্রাণোচ্ছল শিশুদের অনশনে রাখলে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। কতকগুলি রোগের প্রাদুর্ভাব ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন শীত ঋতুতে ফুসফুসের ঝিল্লিপ্রদাহ, সর্দি, গলপ্রদাহ, প্রভৃতি রোগের আধিক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ ১৮ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই যক্ষ্মারোগ বেশী হয়। তিনি একটি জ্বরগ্রস্তা রোগিনীর রোগের দৈনিক ধারা বিবরণী রেখে গিয়েছেন। আজ হাজার হাজার বছরের ব্যবধানে তা থেকে জানা যায় যে উক্ত রোগীণী ছিল আন্ত্রিক জরাক্রান্তা (টাইফয়েড্)।

হিপ্পোক্রাতেসের জীবনকালেই তৎকালীন পুরোহিত চিকিৎসকগণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণে তৎপর হয়ে ওঠে। তাঁর মৃত্যুর পর আরিষ্টটল-এর (৩৮৪-৩২২

খৃঃ পূঃ) মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। তিনি নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন
চিত্র—৪২
না, কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের উপর তাঁর অসামান্য দখল ছিল এবং বহু পশুর শব ব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান পাঠে উদ্যোগী হয়েছিলেন। নরদেহের ক্রিয়া-কলাপ রক্ত, শ্লেষ্মা, পীতপিত্ত ও কৃষ্ণপিত্ত নামক চারিরসের সমন্বয়ে পরিচালিত হয় এবং উক্ত রসের কোনও একটি দূষিত হলে শরীরে রোগলক্ষণ দেখা দেয় বলে তিনি মনে করতেন।

আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসাশাস্ত্র

আলেকজান্দার জীবিত ছিলেন মাত্র ৩৩ বৎসর। মৃত্যুর প্রায় একবৎসর আগে নীলনদের উর্বর বদ্বীপে তিনি ভবিষ্যত আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্যভার গ্রহণ করেন সৈন্যাধ্যক্ষ টলেমি সোটের (৩২৩ - ২৮৫ খৃঃ পূ:)। টলেমি ছিলেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী এবং তিনি য়ুরোপের বহু গুণীজনকে আলেকজান্দ্রিয়ায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। আলেকজান্দ্রিয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শারীরস্থান বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন হেরোফিলুস (ইরোফিলুস্) ও এরাসিস্ত্রাতুস। হেরোফিলুস জনসমক্ষে মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। তাঁর মতে মস্তিষ্ক মানবদেহের গতি সঞ্চালন, স্পর্শচেতনা, বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতির কেন্দ্রস্থল। তিনি মস্তিষ্ককে বৃহৎ মস্তিষ্ক (সেরিব্রাম্) ও ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক (সেরিবেলাম্) এই দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করেন। তাঁর আবিষ্কৃত মস্তিষ্কের শিরাচক্র (টরকিউলার হেরোফিলি) আজও শারীরস্থান শাস্ত্রে সুপরিচিত। এরাসিস্ত্রাতুস ছিলেন মস্তিষ্কের গঠন ও কার্য-কারিতা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু। তিনি মনে করতেন মানব মস্তিষ্কের গঠন মনুষ্যেতর প্রাণীর মস্তিষ্ক থেকে ভিন্ন এবং মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠের আভ্যন্তরীণ "মস্তিষ্ক বারি" (সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড্) স্নায়ু-রজ্জুর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে পেশী সঙ্কুচিত করে। প্রায় দুই শতাব্দী পরে রোমানরা আলেকজান্দ্রিয়া অধিকারের পর (৫০ খৃঃ পূঃ) উক্ত চিকিৎসাধারায় পরিসমাপ্তি ঘটে।

রোমক চিকিৎসাশাস্ত্র

রোমানরা প্রধানতঃ গ্রীক ও মিশরীয়গণের কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে। প্রাচীন রোমে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠ

করতেন না। রোম শহরের জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত থাকায় শহরের অধিকাংশ স্থানে ছিল সুনির্মিত পয়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল সরবরাহের (এ্যাকুয়াডাকট্) ব্যবস্থা এবং দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ছিল রাজকোষে নিযুক্ত চিকিৎসক। খৃষ্টজন্মের ২৯৩ বৎসর আগে রোমে ব্যাপক মহামারী দেখা দেওয়ায় নিরুপায় রোমানরা এপিডাউরুশবাসী গ্রীক চিকিৎসকগণের শরণাপন্ন হয়। তারা গ্রীকদের কাছ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রতীক স্বরূপ একটি পবিত্র সর্প টাইবার নদীমধ্যস্থ সেণ্ট বার্থোলামিউ দ্বীপে এনে রেখে দেয়। ঐ দ্বীপে ছিল একটি আরোগ্যশালা। আরোগ্যশালার সন্নিহিত গির্জার রাহেরে নামক এক সাধু লণ্ডনের প্রাচীনতম সেণ্ট বার্থোলামিউ হাসপাতাল স্থাপনা করেছিলেন। রোমক সৈন্যদলের চিকিৎসকগণ দেশের বহুস্থানে আরোগ্যশালা স্থাপন করে। জার্মানীর ডুসেলডর্ফ শহরের নিকটে একটি রোমক জঙ্গী হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। নেপ্‌ল্‌স্‌-এর নিকটবর্তী পম্পেই শহরেও অনুরূপ হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ আছে। ডিওস্কোরিডেস নামক এক গ্রীক উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রোমক ভেষজ বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি করেন। রোমক চিকিৎসা জগতের যুগান্ত আনয়নকারী গ্যালেন ছিলেন গ্রীক বংশোদ্ভব। ক্ষুদ্র এশিয়ার পেরগামুম্ শহরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে, চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের

চিত্র—৪৩

জন্য তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় যান এবং ২৮ বৎসর বয়সে এক পেশাদার মল্ল-যোদ্ধাদলের চিকিৎসক হিসাবে জীবনারম্ভ করেন। কিছুকাল পরে তিনি রোম শহরে বসবাস আরম্ভ করলে সমব্যবসায়ীদের চক্রান্তে তাঁকে স্বল্পকালের জন্য রোম পরিত্যাগ করতে হয়। রোম সম্রাট মার্কুস আউরেলিয়ুস তাঁকে সসম্মানে রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। গ্যালেন শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে বহু মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর কার্যকালে রোম সাম্রাজ্যে মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকায় বার্বারী-বানর প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তিনি জ্ঞান লাভ করেন। হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে শরীরের অভ্যন্তরে চাপের তারতম্য সৃষ্টি হয় এবং তার ফলেই রক্ত সঞ্চালিত হয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি আরও বিশ্বাস করতেন যে, রক্ত হৃৎপিণ্ডের প্রাকারের মধ্য দিয়ে প্রকোষ্ঠ পরিবর্তন করে এবং শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করায় সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করে। তাঁর রচিত ৫০০টি গ্রন্থের মধ্যে প্রায় ৮০ খানির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। গ্যালেনও বিশ্বাস করতেন যে,

শরীরের আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া চারিটি মুখ্য রস দ্বারা পরিচালিত। প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করলেও তিনি কোনও শিষ্য গ্রহণ করেন নি। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক হতে রোম সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ৫৪২ খৃঃ অব্দে মহামারী রোগে রোমক সাম্রাজ্যের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় জনবলহীন রোম সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। এখনও ইংল্যাণ্ডের নর্থাম্বিয়া, কোলোনের নিকটবর্তী নোভেসিউম্ ও ভিয়েনার নিকটবর্তী কারনুণ্টম্ নামক স্থানে প্রাচীন রোমক চিকিৎসালয় বা "ভ্যালেটুডিনারিয়া"র ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইহুদি চিকিৎসাশাস্ত্র

বাইবেলের পুরাতন অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে রোগযন্ত্রণা ঈশ্বরের অভিশাপ মাত্র। প্রাচীন ইহুদি দেশে রোগীর চিকিৎসার জন্য জনসাধারণ পুরোহিতদের শরণাপন্ন হতেন। পুরোহিত চিকিৎসকগণ বলতেন যে মুসার নির্দেশ মেনে চললে মানুষ কখনই রোগগ্রস্ত হবে না। ইহুদি পুরোহিতগণ মহামারীর চিকিৎসায় সুদক্ষ ছিলেন এবং জনস্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থায় সচেতন ছিলেন। ইহুদি পুরোহিত চিকিৎসকগণের আদেশক্রমে পুরুষ শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই তার শিশ্নের চর্মছেদন করা হত। কালক্রমে উক্ত প্রথা মুসলমানগণের মধ্যেও প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের নিদানতাত্ত্বিকগণের মতে শিশ্নের চর্মচ্ছেদন করলে শিশ্নের মুণ্ডে কর্কটরোগ হয় না। সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, ইহুদি ও মুসলমানগণের মধ্যে শিশ্নের কর্কটরোগ অতি বিরল। লেভিটিকাস্-এর পুস্তকে দূষিত খাদ্য, অপবিত্র দ্রব্যাদি, প্রসব ব্যবস্থা, ঋতুস্রাব ও সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে। শূকরের মাংস হতে অন্ত্রে ও দেহে ভয়াবহ কৃমি রোগ হয়, এজন্য উক্ত পুস্তকে ইহুদিদের পক্ষে শূকরের মাংস গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মুসলমান ধর্মেও উক্ত নিয়ম আজও অনুসরণ করা হয়। ইহুদি চিকিৎসকগণ কুষ্ঠ ও অপরাপর ছোঁয়াচে রোগীকে সুস্থ জনসাধারণের নিকট হতে দূরে বাস করতে বাধ্য করতেন। ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ "তালমুদ"-এ বহু চিকিৎসা ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। মধ্য যুগের খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ইহুদিগণকে হেয়জ্ঞান করলেও রোগগ্রস্ত হ'লে গোপনে তাঁদের শরণাপন্ন হতেন। বহু খৃষ্টীয় ধর্ম সংস্থার অভ্যন্তরে এক বা একাধিক ইহুদি চিকিৎসক গোপনে বাস করে ধর্মযাজকদের চিকিৎসা করতেন।

মধ্য যুগের ইহুদি চিকিৎসকগণের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন মোসেস্

চিত্র—৪৪

বেন্ মাইমন্ বা মেমোনাইদ। তিনি ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে স্পেনের কর্দোভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তৎদেশে প্রচলিত আরবী ভাষায় তাঁর নাম ছিল আবু ইম্‌রান্ মুসা ইমন্ মাইমুন ইবন্ উবাইদ আল্লাহ্। তিনি একাধারে ছিলেন দার্শনিক, আইনজ্ঞ ও চিকিৎসক। প্রায় ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি ইহুদি পরিচয় গোপন করে মুসলমান শাসিত স্পেনে বাস করেছিলেন। ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে পিতামাতাসহ তিনি মরকৃকোদেশের ফেজ শহরে বসবাস আরম্ভ করেন এবং তত্রস্থ ইহুদি পুরোহিতদের কাছ থেকে গ্রীকদর্শন ও চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে স্বল্পকালের জন্য তিনি ফিলিস্তিন্‌বাসী হয়েছিলেন এবং তৎপরবর্তীকালে মিশরে যান ও মিশরে তুর্কী স্থলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসকপদে নিযুক্ত হন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারা থেকে ইহুদি দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর পুস্তকাদি পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

প্রাচীন আরবী চিকিসাশাস্ত্র

হিপ্পোক্রাতেসের মৃত্যুর ১০০০ বৎসর পর ও গ্যালেনের মৃত্যুর ৪০০ বৎসর পর বর্তমান স্থসভ্য আরব জাতির অভ্যুত্থান হয়। অনুর্বর উষর মরুভূমির যাযাবর বেদুইনদের ক্লেশসাধ্য জীবনে হজরত মহম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্তন করে নতুন আশার সঞ্চার করেন। পৌত্তলিক আরবীগণ একেশ্বরবাদী হয় এবং ধীরে ধীরে আরবী উপদ্বীপের উর্বরা উত্তরাংশের দিকে প্রব্রজন করতে আরম্ভ করেন এবং গৃহনির্মাণ করে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করেন। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ভাষা তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যে বহুল প্রচলিত গ্রীক ভাষাকে স্থানচ্যুত করে। ক্রমে ক্রমে গ্রীকভাষায় লিখিত বহু চিকিৎসাপুস্তক আরবী ভাষান্তরিত হয় এবং সাধারণ মানুষের পাঠ্য হয়। ঐতিহাসিকদের মতে বর্তমান আরবী সভ্যতার স্থচনা হয়েছিল ৬২২ খৃষ্টাব্দে এবং ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মূর শাসিত স্পেনের গ্রানাডা নগরীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সেই সভ্যতার উৎকর্ষ নিম্নাভিমুখী হয়। মৌলিক আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রের স্থবর্ণযুগ তিন শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়েছিল।

হুনাইন ইবন্ ইসাক্ আরবী ভাষায় গ্রীক চিকিৎসাপুস্তক প্রথমে অনুবাদ

করে সেই যুগের সূচনা করেন এবং ক্রেমোনাবাসী জেরার্ডো কর্তক আরবী পুস্তক লাতিন ভাষায় অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের অবসান হয়েছিল (১৮৭০ খৃঃ—১১৭০ খৃঃ)।

ইতিহাস গত বিচারে আরবী চিকিৎসাশাস্ত্র প্রাচীন মিশরীয়, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে এক সংযোজক বিশেষ।

আরবী চিকিৎসা পুস্তকাবলী

হুনাইন ইবন্ ইসাক্ (৭৯২-৮৭৩ খৃঃ) সর্বসাকুল্যে ১২৮টি গ্রীক চিকিৎসা-পুস্তক আরবী ভাষান্তরিত করেছিলেন। পরবর্তী লেখকের নাম করতে গেলে

চিত্র—৪৫

আর্‌রাজী বা রাহজেস্ এর নাম উল্লেখযোগ্য (৮৪১ খৃঃ—৯৩০ খৃঃ)। তিনি পারস্য দেশের তেহরাণ শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৩০ খণ্ডে বিভক্ত "আল্‌হাভী" নামক চিকিৎসা মহাকোষ রচনা করেন। ত্রয়োদশ শতকে সেটি লাতিন ভাষায় "কন্‌টিয়েনট্‌স্" নামে অনুদিত হয় এবং য়ুরোপীয় চিকিৎসক সমাজে পরম সমাদৃত হয়। তাঁর অপর বিখ্যাত পুস্তকের নাম "আল্ জুদারী বাল্ হাস্‌বা"। পুস্তকটিতে বসন্তরোগ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। ঐ পুস্তকটি ৭ বার লাতিন ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ফরাসী (১৭৬২ খৃঃ), ইংরাজী (১৮৪১ খৃঃ), গ্রীক ও পারসিক ভাষান্তরিত হয়। এছাড়া তিনি শিশুরোগ সম্বন্ধে একটি পুস্তক লিখেছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে ঐটি পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শিশুরোগ চিকিৎসাপুস্তক।

ইবন্ আল্ জাজ্জার (৯০০-৯৬১ খৃঃ) জনসাধারণের বোধগম্য "জাদ্ আল্ মুসফির" ও "তিব্ আল্ ফাক্‌রা বাল্ মাসাকিন্" নামে দুটি পুস্তক লিখেছিলেন। পুস্তক দুটি লাতিন ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

আলী ইবন্ আব্বাস্ (-৯৯৪ খৃঃ) বা হালী আব্বাস সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক লেখেন। পুস্তকটির নাম ছিল "কানিল্ আল্‌সিন্‌আ আল্ তিব্বিয়া" অথবা "আল্ মালাকি"। পুস্তকটি "লিবের রেগিউস" নামে লাতিন ভাষায় দুইবার প্রকাশিত হয়েছিল।

খৃষ্টজন্মের এক সহস্র বৎসর পরে আরব কুলোদ্ভব মূর চিকিৎসক আবুল কাশিম খালাফ্ ইবন্ আব্বাস আজজারাভী (-১০১৪ খৃঃ) স্পেন দেশের

চিত্র—৪৬

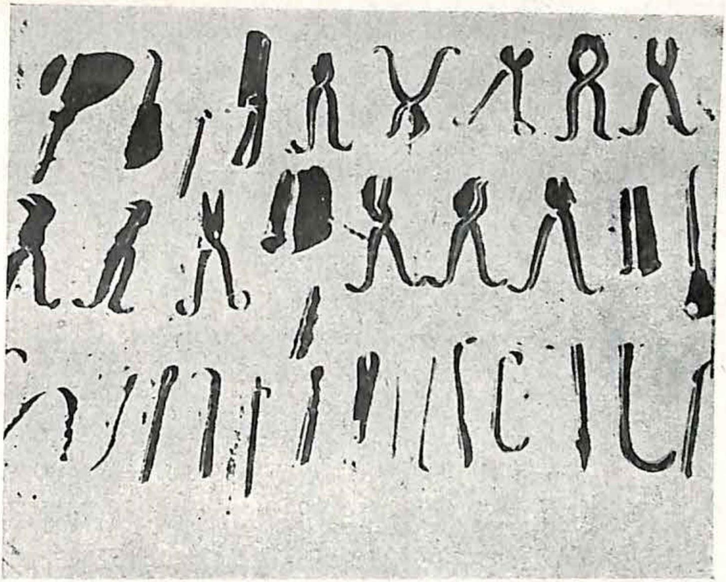

চিত্র ১৮—সুশ্রুত কর্তৃক ব্যবহৃত কতিপয় শল্য যন্ত্র।

চিত্র ১৯—বুদ্ধদেবের চিকিৎসা রত জীবক।

চিত্র ২০—প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণেতা মাধবাচার্য (হাম্পি)।

চিত্র ২১—প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক-প্রবর চরক।

চিত্র ২২—ভারতে সন্তান প্রসবের প্রাচীন শিলাচিত্র (হাঙ্গল, ১২ শতক)।

চিত্র ২৩—জাপানের বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক সেইস্থ হানাওকা (১৭৬০-১৮৩৫)।

চিত্র ২৪—পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসা পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা
(হাম্মুরাবী, সুমেরীয়)।

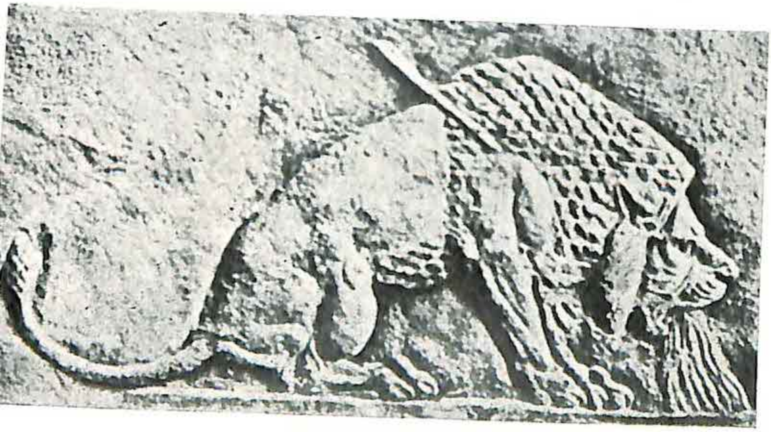

চিত্র ২৫—ফুসফুসে শরবিদ্ধ সিংহের রক্তবমন (সুমেরীয়)।

করদোভা শহরে বাস করতেন। য়ুরোপে তিনি "আলবুকাসিস্" নামে সমধিক পরিচিত। তাঁর রচিত "আলতস্রিফ্ লিমান্ আজিজা আন্ আল্ তালিফ্" নামক বিখ্যাত পুস্তকের মধ্যে তিনি জন্মগত রক্তক্ষরণ রোগ (হিমোফিলিয়া)-এর সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছিলেন। পুস্তকটি ৩০ খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং পুস্তকটির মধ্যে দ্বিশতাধিক শল্য যন্ত্রের চিত্র ছিল এবং যন্ত্রগুলির যথাযোগ্য প্রয়োগ বিধিও চিত্রিত ছিল। তিনি বলেছিলেন যে, পড়ে যাওয়া দাঁত পুর্নসংস্থাপিত করা সম্ভব। তিনি দন্তের পংক্তি বৈকল্য ও মেরুদণ্ডের ক্ষয়রোগজনিত পক্ষাঘাত সম্বন্ধেও লিখে গিয়েছেন। তিনি শল্যচিকিৎসায় সীবনের জন্য কার্পাসের সূতা এবং জান্তবতন্তুও ব্যবহার করতেন। প্রসঙ্গতঃ ইংরাজী "কটন্" শব্দটি আরবী "কুতুন" থেকে উদ্ভুত। তিনি মূত্রনালীর পাথ্‌রীর উপর অস্ত্রোপচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ভগনালীর মধ্য দিয়ে মূত্রাশয়ের পাথ্‌রী অপসারণের এক উপায় উদ্ভাবন করেন।

তিনি মৃদু ও প্রাণনাশকারী অর্বুদের প্রভেদ জানতেন। স্তনের কর্কট রোগের চিকিৎসায় তিনি দাহক যন্ত্রের (কটারী) সাহায্যে রোগগ্রস্ত স্তনচ্ছেদন অনুমোদন করতেন। জরায়ুর বাহিরে গর্ভাধান এবং জরায়ুকুসুম উৎপাটন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। শ্বাসকষ্টের চিকিৎসায় শ্বাসনালী

চিত্র—৪৭

ছিদ্রনের (ট্রাকিয়ষ্টমী) প্রথার তিনিই প্রবর্তক। নিম্নাঙ্গের শিরাস্ফীতি (ভেরিকোজ ভেন্) রোগের বিষয় তাঁর জ্ঞান ছিল। স্কন্ধের সন্ধিচ্যুতি নিরসনের জন্য তিনি যে পদ্ধতি প্রচলিত করেছিলেন সেটা ঠিক বর্তমানে সুপরিচিত সুইজারল্যাণ্ডবাসী ডঃ থেয়োডোর কোখের উদ্ভাবিত প্রথার অনুরূপ।

আল্‌বুকাসিস্‌এর "তসরীফ্" পুস্তকটি লাতিন, ফরাসী, স্পেনীয়, হিব্রু এবং আরও বহুভাষায় অনুদিত হয়েছে। তাঁর মূল পুস্তকের ৪২টি আরবী পাণ্ডুলিপি অকস্‌ফোর্ডের বেদেলিয়ান লাইব্রেরী, ভিয়েনার নাৎশিওনাল বিব্‌লিওথেক্, মিউনিখের জার্মান জাতীয় লাইব্রেরী, ইয়েল্ মেডিকেল লাইব্রেরী, পাটনাস্থিত খুদাবকস্ ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরী এবং নিউইয়র্ক এ্যাকাডেমী অব্ মেডিসিন ইত্যাদি স্থানে বিক্ষিপ্তভাগে সংরক্ষিত আছে। বর্তমান য়ুরোপের শল্য চিকিৎসকগণ স্বীকার করতে বাধ্য যে তাঁরা এখনও আল্‌বুকাসিস্ প্রবর্তিত বহু বিধি অনুসরণ করে চলেছেন।

আল্‌বুকাসিসের সমকালে পারস্যদেশে এক বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। তাঁর নাম আবু আলি হুসাইন ইবন্ আবদাল্লা ইবন্‌সিনা, সংক্ষেপে

চিত্র—৪৮

"ইব্‌নেসিনা" (৯৮০—১০৩৬ খৃঃ)। তিনি সারাবিশ্বে বর্তমানে "অভিসেন্না" নামে সমধিক পরিচিত। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে বোখারার সন্নিকটস্থ আফ্‌সানা নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তিনি জাতিস্মর ছিলেন এবং অতি শৈশবে সমগ্র কোরাণ আবৃত্তি করতে পারতেন। তিনি পানীয় জল শোধনের উপর জোর দিতেন। তিনি রোগের উপর জলবায়ুর প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং রোগীর খাদ্য ও অনুপান সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মূত্রনালী এবং ভগের অভ্যন্তরে ভেষজ প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রচলিত করেন। তিনি যক্ষারোগ ও "অগ্নিব্রণ" বা "পৃষ্ঠব্রণ" (এ্যানথ্রাকস্) সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানগর্ভ মতবাদ প্রকাশ করেছেন। মস্তিষ্কের অর্বুদরোগ, মস্তিষ্কের ঝিল্লীপ্রদাহ (মেনিনজাইটিস্) এবং প্রলাপ-বিকারী (ডিলিরিয়াম) রোগসমূহের উপর সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করে গিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম মহাধমনীর কপাটিকার কর্মহীনতা জনিত হৃদরোগ নিরূপণ করেন। মস্তিষ্কের রোগগ্রস্তের মাথায় বরফের প্রয়োগ তাঁরই উদ্ভাবিত। তিনিই সর্বপ্রথম বলেছিলেন যে, মনোবৈকল্য রোগীকে জ্বরগ্রস্ত করতে পারলে মানসিক রোগের উপশম হয়। তাঁর পন্থা অনুসরণ করে ভিয়েনাবাসী স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ ডঃ য়ুলিউস্ হ্বাগ্‌নার ফন্ ইয়াউরেগ্ ম্যালেরিয়া জ্বরের দ্বারা উপদংশঘটিত মানসিক রোগীর চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। মধ্যযুগের বিখ্যাত চিকিৎসক প্যারাসেলসুসের মত অভিসেন্নাও এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিভ্রমণ করে করে চিকিৎসা করতেন। তিনি জন্মস্থান আফ্‌সানা থেকে তারিয়ান, দাঘীস্থান, জেবাল্, রায়ি, কোয়াৎজুইন্, হামাদান ও ইস্পাহান হয়ে সর্বশেষে আবার হামাদান শহরে আসেন এবং মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তক দুটির নাম "কিতাব আল্ কানুন্" ও "আল্‌উর্‌জুজা"। প্রথমটির লাতিন অনুবাদের নাম "ক্যাননস্ অব অভিসেন্না" এবং দ্বিতীয়টি লাতিন ভাষায় "কান্‌টিকা" নামে সুপরিচিত। ঐ পুস্তকদুটি সমকালীন বিখ্যাত য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল। ফরাসী দেশের মঁপেলিয়ে এবং বেলজিয়াম দেশের লুভেঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত

পুস্তক দুটি বিশেষ সমাদৃত ছিল। অভিসেন্নার জীবনকালে পারস্য ও ভারতের মধ্যে বহু পাণ্ডিত্যের আদান-প্রদান হয়েছিল। সুতরাং স্বতঃই বোঝা যায় যে তিনিও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।

ইবন্ বুতলান্ (?—১০৫৫) এবং ইবন্ জাজ্‌লা (?—১০৯৯) উভয়েই সারণী বা ট্যাবুলার ধরনের নূতন দুটি চিকিৎসাপুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। পুস্তক দুটির নাম যথাক্রমে "তাকিন্ আল্ সিহা" ও "তাকিন্ আল্ আব্‌দান্"। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে উভয় পুস্তকই লাতিন ও জার্মান ভাষায় ষ্ট্রাস্‌বুর্গ শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ আরবী অবদান

শারীরস্থান বিদ্যা (এ্যানাটমি) - আরবদেশে সর্বপ্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন ইউহান্না ইবন্ মাসাওয়াই। তিনি আফ্রিকার নুবিয়া দেশ থেকে

চিত্র—৪৯

আনীত বেবুন জাতীয় প্রাণীর শব ব্যবচ্ছেদ করে মানুষের শারীরস্থান বিদ্যার উপর অনেক আলোকপাত করেন।

স্পর্শলোপ (এ্যানেস্থেসিয়া)—অভিসেন্না স্পর্শলোপকারী ভেষজাদির আহার প্রবর্তন করেন। আরবীগণই সর্বপ্রথম নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে স্পর্শ-লোপকারী ঔষধি আঘ্রাণের প্রথারও প্রবর্তক। তাঁরা জলশোষক সামুদ্রিক উদ্ভিদ বা স্পঞ্জ স্পর্শলোপকারী ঔষধে সিক্ত করে রোগীর নাসারন্ধ্রের কাছে ধরতেন এবং রোগীর বেদনার অনুভূতি অবলুপ্ত হত।

ইবন্ নাফিস নামক এক আরবী চিকিৎসক ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রক্ত পরিশোধনের বিষয় প্রথম অবগত হন এবং বলেন যে গ্যালেন প্রবর্তিত রক্ত সঞ্চালনের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, গ্যালেন বলেছিলেন শরীরের এক পার্শ্বের রক্ত হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ প্রাকারের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে অপর পার্শ্বে প্রবাহিত হয়। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ভেসালিউস্ কর্তৃক প্রকাশিত "দে করপোরী হুমানিস্" নামক গ্রন্থে লিখিত রক্ত সঞ্চালনবিধি ইবন্ নাফিসের মতের হুবহু অনুকরণ মাত্র। শারীরস্থান বিষয়ক অপর আরবী অবদানসমূহের মধ্যে আররাজী কর্তৃক স্বরযন্ত্রের স্নায়ু আবিষ্কার, আলি আব্বাস বা হালী কর্তৃক কৈশিকা শিরা ও ধমনী আবিষ্কার এবং অভিসেন্না কর্তৃক অক্ষিগোলকের সঞ্চালক পেশীর সন্নিবেশন নিরূপণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবু মার্ভান্ মালিক্ আবিল্ আলা ইবন্ ঝুর নামক মূর চিকিৎসক অতি বিখ্যাত। তিনি ইবন্ ঝুর বা "অ্যাভেন্জোয়ার" নামে সমধিক পরিচিত।

চিত্র—৫০

তাঁর জন্ম হয়েছিল স্পেনের সেভিলা শহরে। তিনি সর্বপ্রথম অন্ননালী ও মলান্ত্রের মধ্যে নল প্রবেশ করিয়ে রোগীকে পথ্য দেবার বিধি প্রবর্তন করেন। তিনি বিশদভাবে হৃদঝিল্লীপ্রদাহ, বক্ষমধ্যস্থানপ্রদাহ এবং গলবিল-এর পক্ষাঘাত সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলেন। পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রণ ও মানসিক রোগচিকিৎসার ভেষজাদির এক তালিকা প্রস্তুত করেন। কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে দ্রাক্ষাসারযুক্ত সুমিষ্ট "জুলেপ" বা জোলাপের প্রয়োগ করতেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত পুস্তকের নাম "আত্তেইসির্"। পুস্তকটি লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। ভিলা নোভার বিখ্যাত চিকিৎসক আরনল্ড, লাঙ্গে ও সাইডেনহাম্ও পুস্তকটি অনুসরণ করতেন।

চিত্র—৫১

কায়চিকিৎসা

ইউহান্না ইবন্ মাসাওয়াই কুষ্ঠ রোগ ও যক্ষ্মারোগের সংক্রমণ প্রবণতা প্রথমে উপলব্ধি করেছিলেন।

চিত্র—৫২

আরবী চিকিৎসক প্রবর আরবাজী বা "রাহাজেস্" মস্তিষ্কোদক (হাইড্রোকেফালস্), জন্মগত রোগ সংক্রমণ, জটিল যকৃৎ ও বৃক্করোগ, মধ্যকর্ণপ্রদাহজনিত মস্তিষ্কের স্ফোটক, বিকাররোগ বিশ্লেষণ, মেরুমজ্জার অর্বুদ-

চিত্র—৫৩

জনিত মূত্রাশয়ের পক্ষাঘাত এবং মুষ্কত্বকের পচন প্রভৃতি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলেন।

চিত্র—৫৪

ভেষজবিজ্ঞান ও ফার্মাকোলজি শাস্ত্রে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সুরাসার বা "আল্ কোহল্" পরিস্রবণ। তারাই অভিষব বা কিন্ব সহযোগে শর্করা পদার্থ ও দ্রাক্ষারসের মাতন করে সুরাসার প্রস্তুত করেন। ভেষজবিজ্ঞানে অতি প্রচলিত শব্দ "জুলেপ" সুমিষ্ট পানীয়, আরবী "জুলাব" বা পারসিক "গুলাব" শব্দ থেকে উদ্ভূত। তদনুরূপ ইংরাজী "সিরাপ" কথাটিও আরবী "সরাব্" থেকে রূপান্তরিত।

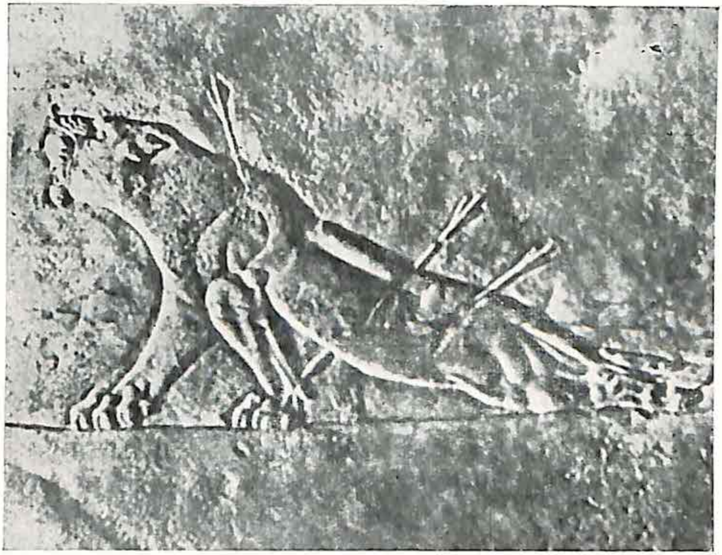

চিত্র ২৬—মেরুমজ্জায় শরবিদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্তা সিংহী (সুমেরীয়)।

চিত্র ২৭—প্রাচীন মিশরের স্থপতি ও চিকিৎসক ইমহোটেপ্।

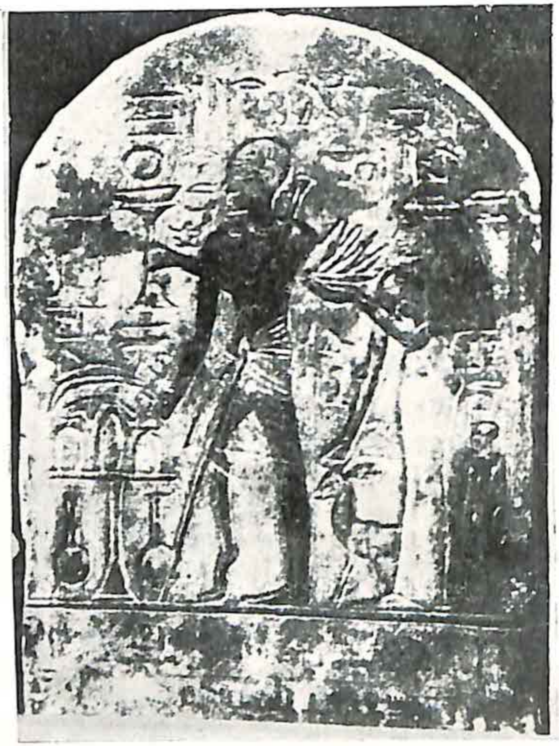

চিত্র ২৮ - প্রাচীনতম পোলিওগ্রস্থ রোগী (প্রাচীন মিশরীয় শিলাচিত্র)।

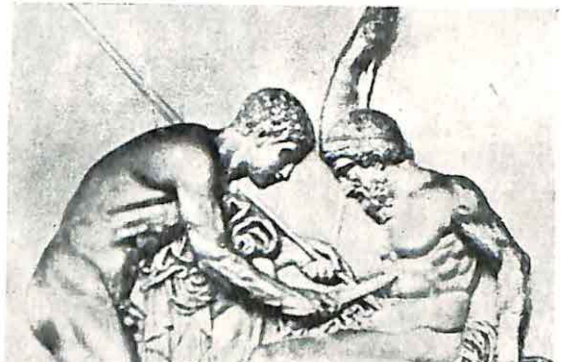

চিত্র ২৯—যুদ্ধে আহতকে চিকিৎসা রত আখিলিস্।

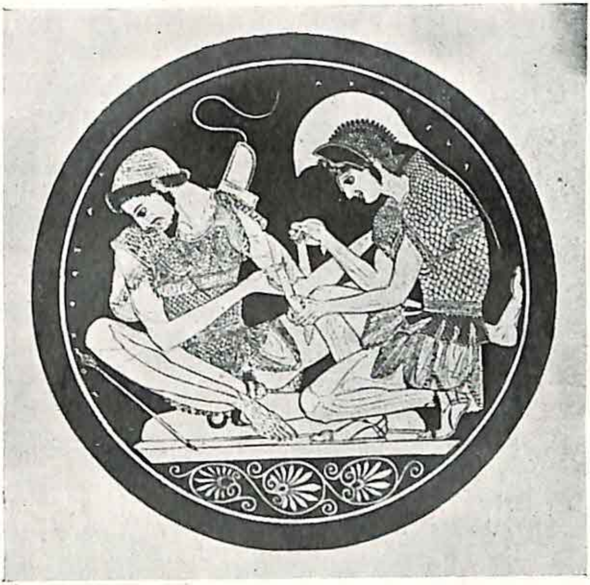

চিত্র ৩০—আখিলিশ দ্বারা প্রাত্রক্লোস-এর ক্ষত বন্ধন।

চিত্র ৩১—খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০শ শতকের একটি গ্রীক আরোগ্যশালার বহির্বিভাগ।

চিত্র ৩২—ইস্কুলাপিউস।

চিত্র ৩৩—মাতৃ-উদর ভেদন দ্বারা ইস্কুলাপিউস এর জন্ম।

এক কথায় বলতে গেলে প্রাচীন আরবী চিকিৎসাবিজ্ঞানশাস্ত্র যতই পাঠ করা যায় ততই বিস্মিত হতে হয়। বর্তমান বিলাসপ্রিয় ও বহুবিবাহ প্রিয় এবং অতি সমৃদ্ধ আরবীদের জীবনধারণের সঙ্গে প্রাচীন সুসভ্য আরবীগণের কোন সাদৃশ্য নেই। অতি পরিতাপের বিষয় যে অবক্ষয়মান ভারতীয়গণের মত আরবীগণকেও আজ প্রতীচ্য প্রবর্তিত চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু বর্তমান চিকিৎসাপ্রথা অনুসরণকারীদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, প্রতীচ্যের ঐ চিকিৎসাশাস্ত্রের বুনিয়াদ প্রাচ্যের লব্ধজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতীয় প্রভাব

হজরত মহম্মদ কর্তৃক ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের বহু পূর্ব হতে ভারতের সঙ্গে আরবদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী আরবদেশের মধ্য দিয়ে য়ুরোপ পরিক্রমা করতেন। উত্তর পশ্চিম ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের পর ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম প্রচারকগণ পারস্য ও আরব দেশেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইসলামের প্রধান ধর্মগ্রন্থ কোরাণের মধ্যে কয়েকটি বিকৃত সংস্কৃত শব্দ পরিলক্ষিত হয় যথা: "কাফুর" (কর্পূর-সংস্কৃত) এবং "জান্‌যাবিল্" (শৃঙ্গভের অর্থাৎ আদ্রক-সংস্কৃত)। জান্‌যাবিল্ থেকেই লাতিন্ 'জিন্‌জিবেরিস্' ও ইংরাজী 'জিন্‌জারের' উৎপত্তি। আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের নিকট হতে লব্ধজ্ঞান অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু আরবী ব্যবসায়ী স্থল ও জলপথে ভারতে আসতে শুরু করেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পশ্চিম ভারতে উপকূলবর্তী সহরসমূহে বসতি স্থাপন করেছিল। সর্বাধিক আরবী বসতি ছিল সিন্ধু, গুজরাট ও কেরালার উপকূলে। বহু ভারতীয়গণকে হজরত মহম্মদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও দেখা গিয়েছিল। তারা কালক্রমে সাত্-এল্-আরব নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে ও অববাহিকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আরবের উমাইয়াদ্ রাজ্য বিস্তৃত হয়। সিন্ধুদেশে বসবাসীকারী বহু আরবী ভারতের তৎকালীন উন্নত সমাজব্যবস্থা ও কৃষ্টির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন। আব্বাসিদ রাজত্বকালে আরবীগণ ভারতীয় সাধারণ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তকাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। সেই সমস্ত অনুবাদ পাঠ করে হিজিরা তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের আরবী পণ্ডিতগণ অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বস্‌রা নগরবাসী সমসাময়িক

পণ্ডিত আমর বিন্ বাহ্‌র আল জাহিজ্ লিখেছিলেন যে, ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যন্ত উন্নতমানের এবং ভারতীয় চিকিৎসকেরা বিষক্রিয়া এবং নানাপ্রকার ব্যথা ও বেদনার সুচিকিৎসা জানতেন। তাঁরা ভেষজজাত ধূম্রের সাহায্যে জীবাণু ধ্বংস করতেন (ফিউমিগেসান্)। নবম শতকের আরবী ঐতিহাসিক আল্ ইয়াকুবী বলেছেন, ভারতীয় চিকিৎসকদের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রক্রিয়া সমকালীন আরবী চিকিৎসকদের সার্বিক উন্নতি করেছিল।

সংস্কৃত থেকে আরবী ভাষায় অনুদিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পুস্তকগুলির বিষয় না লিখলে এই বিবরণী অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবীতে অনুদিত চরক সংহিতা "শারাক্", শুশ্রুত সংহিতা "সস্রদ্" অথবা "শুশ্রুদ" নামে পরিচিত ছিল। কনিষ্ঠ ভাগভট কর্তৃক প্রণীত অষ্টাঙ্গ হৃদয়গ্রন্থ আরবীতে অনুদিত হয়ে "অস্তঙ্কার", "অস্তাগার" এবং "অসঙ্কর" নামে প্রচলিত হয়েছিল। মাধবাচার্যের নিদান্ আরবী ভাষায় "নিদান" "বদন" এবং "ইয়েদান" প্রভৃতি নামে প্রচলিত ছিল। সিদ্ধযোগ গ্রন্থটিও ইবন্ ধন্ আরবীভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। তার আরবী নামকরণ হয়েছিল "সিন্ধাস্তাক্" বা "সিদ্ধসান্"। স্ত্রীরোগ সম্বন্ধীয় অজ্ঞাতনামা একটি সংস্কৃত পুস্তক আরবী ভাষায় "রুশা" নামে পরিচিত ছিল।

নবম শতাব্দীর অপর বিশিষ্ট আরবী জ্ঞানবেত্তা আবু মাস্হর্ আল্ বালখী বলেছেন যে, ভারতীয়রা অতি উন্নত জাতি এবং তাঁদের বিচারবুদ্ধি ও শাসন ক্ষমতাও অতিশয় উন্নত।

দ্বিতীয় আব্বাসিদ্ খলিফা আল্ মন্সুরের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ থেকে তাঁর রাজসভায় রাজদূত পাঠানো হয়েছিল। সেই রাজদূতের সঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিতও গিয়েছিলেন এবং খলিফাকে দুইখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত জ্যোতির্বিদার পুস্তক উপহার দিয়েছিলেন। খলিফা হারুণ আল্ রসিদের সভায় কয়েকজন "বার্মাক" নামধারী সভাসদ্ ছিলেন। তাঁরা হলেন বল্লীক দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী বংশধর। আরবী-ভাষায় তাদের বলা হত "বার্মাক"। বার্মাক কথাটা সংস্কৃত "প্রমুখ" অর্থাৎ প্রধান থেকে উদ্ভুত, কেননা আরবীভাষা "প" শব্দবিহীন। খালিদ্ নামক বার্মাকের পিতা চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বার্মাক বংশোদ্ভুত বহু পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদি আরবী ভাষায় অনুবাদ করে গিয়েছেন। খলিফা হারুণ আল্ রসিদ্ একবার দুরুহ রোগাক্রান্ত হলে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক সে রোগ নিরূপণ

করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। অতঃপর "মান্‌কা" বা মাণিক্য নামক এক ভারতীয় সভাসদ চিকিৎসক খলিফাকে রোগমুক্ত করেন।

মান্‌কা চিকিৎসা বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য বিজ্ঞানেও পারদর্শী ছিলেন এবং সংস্কৃত ও পহ্লভী ভাষার উপর তাঁর প্রচুর দখল ছিল। ভারত পরিব্রাজক অল্‌বেরুণীও সংস্কৃত এবং পহ্লভী ভাষার মাধ্যমে আরব দেশে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ প্রচারিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবন্ ধন্ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ দেখা যায়, যিনি সম্ভবতঃ ধনপতি বংশোদ্ভব ছিলেন (অথবা নামটা ধন্য, ধনিন বা ধন্বন্তরি থেকে উদ্ভূত) এবং বাগ্‌দাদে চিকিৎসা ব্যবসা করতেন। শালীহ্ বিন্ ভেল্ নামক অপর এক ভারতীয় চিকিৎসকও বাগ্‌দাদ শহরে বাস করতেন। মনে হয় তাঁর প্রকৃত নাম "শালী" যা আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে শালীহ্ হয়েছিল। তিনি সম্ভবতঃ 'ভেল সংহিতা'র রচয়িতা ভেল নামক ভারতীয় চিকিৎসকের বংশোদ্ভব। তিনি অল্ রসিদের ভ্রাতা ইব্রাহিমের মৃগীরোগের চিকিৎসা করে খলিফার ব্যক্তিগত গ্রীক চিকিৎসক গ্যাব্রিয়েলের বিদ্বেষভাজন হয়েছিলেন। ইবন্ আল নাদিম্ 'বাখর' বা 'বাইহর' (ভাস্কর) নামক এক ভারতীয় চিকিৎসকের উল্লেখ করেছেন ; তিনি নিশ্চয়ই "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" প্রণেতা ভাস্কর নন, কেননা তিনি নাদিম-এর দুই শতক পরে জন্মেছিলেন।

আরও কয়েকজন ভারতীয় চিকিৎসক আরবীগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছিলেন। "কঙ্ক" বা কনকায়ন ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও চিকিৎসক। "সাঙ্কাল", "সান্দালিয়া" বা "শাণ্ডিল্য" অথবা "সান্যাল" নামধারী আরও একজন ছিলেন একাধারে চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদ্। "শানক" বা "শৌনক" অথবা "চাণক্য" নামে এক বিখ্যাত চিকিৎসক এবং "যৌধর" বা "যশোধর" নামক এক দার্শনিক চিকিৎসকও বাগদাদে বসবাস করতেন। কঙ্ক বহু পুস্তক রচনা করেছিলেন যার মধ্যে "কিতাব উন্ ফিৎ তাউয়াহুন" পুস্তকটি মানসিক রোগ সম্বন্ধীয়। আলি ইবন্ রব্বান্ আৎ তাহরী "ফির্‌দৌস্ এল্ হিক্‌মৎ" নামে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের এক সংকলন রচনা করেছিলেন। উক্ত পুস্তকে চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা, নিদান স্থান এবং অষ্টাঙ্গহৃদয় পুস্তকসমূহের বিশেষ বিশেষ অংশের উদ্ধৃতি ছিল। রব্বানের ছাত্র ছিলেন বিখ্যাত "আর্‌রাজী বা "রাহজেস্" যাঁর সম্পূর্ণ আরবী নাম আবু বকর্ মুহম্মদ ইবন্ জাকারিয়া। তিনি আরবী চিকিৎসকগণের মধ্যে অতিশয় খ্যাত ছিলেন।

তাঁর রচিত "আল্‌হাভী" নামক পুস্তকের তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহের সারাংশ উদ্ধৃত হয়েছিল। আল্ হারীৎ ইবন্ কালদা নামক এক চিকিৎসক মক্কা শহর থেকে পারস্য দেশ পরিক্রমা করেছিলেন। তিনি বলতেন, "অতি সুদক্ষ পাচক এবং সুন্দরী কামাতুরা পত্নী বৃদ্ধদের পক্ষে পরম অনিষ্টকারী"।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে আরবী চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাবিধি অপেক্ষা গ্রীক চিকিৎসাবিধির উপর বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপ্পোক্রাতেস্‌কেও ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যা প্রভাবিত করেছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে কোসদ্বীপবাসী হিপ্পোক্রাতেস্ পশ্চিম এশিয়া মাইনর-এর স্মির্দিয়া শহরের চিকিৎসা বিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন। স্মির্দিয়া সংলগ্ন কাপ্পাদোচীয় নগর বোগ্‌হাজকিওতে মিতান্নীদের রাজধানী ছিল। জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ হুগো হ্বিঙ্কলের বোগ্‌হাজকিওতে খনন কার্য চালিয়ে বহু সংস্কৃত চিকিৎসা পুস্তকের নিদর্শন পেয়েছেন। সুতরাং স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে উক্ত শহরের সংলগ্ন স্মির্দিয়া নগরীর চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার দ্বারা নিজেরা প্রভাবিত হয়ে হিপ্পোক্রাতেস্‌কেও প্রভাবিত করেছিলেন।

প্রাচীন তুরস্কের চিকিৎসাশাস্ত্র

ত্রয়োদশ শতকে ইসলামী দুনিয়ার বহু আরোগ্যশালা মিশর, সিরীয়া এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাঁচশত বৎসরের প্রাগ্-ঐসলামিক চিকিৎসাবিদ্যার আরবী অভিজ্ঞতা ইস্‌লামী যুগের চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছিল। উক্ত প্রাগ্-ঐসলামিক আরবী অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষ, চীন এবং গ্রীক দেশ থেকে আহৃত হয়েছিল।

ত্রয়োদশ শতকের প্রসিদ্ধ তুর্কী যুবক সুলতান প্রথম কাইকাভুস্ ১২১৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের সিভাস্ শহরে এক বৃহৎ আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তৎকালীন তুর্কী কৃষ্টিধারাকে "সেল্‌চুক্" কৃষ্টি নামে অভিহিত করা হত। সেলচুক্ যুগের শেষাংশে (অটোমান্ বা ওস্‌মানী যুগের অব্যবহিত পূর্বে) তুরস্কের আনাতোলিয়ায় আরও বহু আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। বাইজানটাইন বা বৈজয়ন্তী সাম্রাজ্যের পতনের নয় শতাব্দী পরে তুরস্কের

টোকাত্ (১২৭৫), দ্ভীরিক্ (১২২৮), আমাসিয়া (১৩০১) প্রভৃতি স্থানে আরোগ্যশালা ছিল। ঐ গুলির প্রতিটি আজও বিদ্যমান। কোনিয়া (১২১৯-১৩৩১), কাষ্টামনু (১২৭২) এবং সান্কিরি (১২৩৫) আরোগ্যশালাগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখা যায়। সেল্চুক্ যুগের কারস্, কাইসেরী এবং সিভাসে প্রতিষ্ঠিত আরোগ্যশালাগুলিও বর্তমানে বিদ্যমান। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কাইসেরী আরোগ্যশালার ৭৫০ তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপিত হয়েছে। আরোগ্যশালাটির পুরাতন রোগীগৃহসমূহ সংস্কৃত করে একটি সমাজকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়েছে। সিভাসের আরোগ্যশালাটির প্রস্তর নির্মিত তোরণের গায়ে লেখা আছে যে "৬১৪ অব্দে কেইহুস্রেভ-এর পুত্র এবুলফাত্ কাইকাভুস্ কর্তৃক আরোগ্যশালাটি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহা একান্তই ঈশ্বরের ইচ্ছানুগ।" সিভাসের আরোগ্যশালাটি কাইসেরী আরোগ্যশালার দ্বিগুণ। উক্ত আরোগ্যশালার প্রাঙ্গণেই কাইকাভুস্কে সমাহিত করা হয়েছে। আরোগ্যশালায় আরবী ভাষায় অনূদিত ভারতীয় এবং গ্রীক চিকিৎসা পুস্তকসমূহের সাহায্যে চিকিৎসা করা হত। প্রাচীন সেল্চুক্ চিকিৎসকেরা পারস্যদেশে চিকিৎসা শিক্ষালাভ করতেন। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তুরস্কের তরুণ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থীরা প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সহকারীরূপে কাজ করে শিক্ষালাভ করতেন। সেল্চুক যুগে লিখিত বহু চিকিৎসা পুস্তক এখনও বিদ্যমান। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত পুস্তকগুলি আরবী ও পারসিক ভাষায় লিখিত হত। অতঃপর ক্রমে ক্রমে তুর্কীভাষায় লিখিত পুস্তক প্রবর্তিত হয়েছিল।

তুরস্কের ভাকাফ্ (ওয়াকফ্) দপ্তরে সংরক্ষিত স্থলতান কাইকাভুসের ১২২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত ইষ্টিপত্রে উল্লিখিত আছে যে তিনি সিভাস-এর সংস্থাটির পরিচালনার জন্য প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং পরিচালনার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছিলেন। উক্ত যুগের ওইটিই একমাত্র সংরক্ষিত দলিল। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে আরোগ্যশালাটির ৭৫০ বৎসর পূর্তির উৎসব যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপিত হয়েছে।

য়ুনানী চিকিৎসাশাস্ত্র

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র যখন উৎকর্ষের উচ্চতম শিখরে (খৃঃ ১০ শতকে) তখন ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। দলে দলে আক্রমণকারীরা আফগানীস্থান ও পারস্যদেশ থেকে ভারতের ধনরাশি লুণ্ঠনের মানসে আসতে

থাকে এবং সেই সঙ্গে ভারতে প্রবেশ করে তাদের কৃষ্টি, জীবনধারা ও চিকিৎসাশাস্ত্র। গ্রীক ও আরবীদের সংমিশ্রিত চিকিৎসাশাস্ত্রকে ভারতে "য়ুনানী" চিকিৎসাশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। আরবী ভাষায় গ্রীক দেশকে 'য়ুনান" বলা হয়। প্রথমতঃ আয়ুর্বেদের উৎকর্ষতার জন্য এবং ভারতীয়দের সংস্কারের জন্য য়ুনানী চিকিৎসাবিধি ভারতীয়রা সহজে গ্রহণ করে নি। কিন্তু কালক্রমে য়ুনানী চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসার এক সমন্বয় ঘটে। সেই সম্মিলিত চিকিৎসাবিধিকে ভারতে 'য়ুনানীতিব্' বা "তিব্বি" চিকিৎসাশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। মুসলমান আক্রমণের পর থেকে ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে এক হতাশার ভাব দেখা যায় এবং ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে অবক্ষয়-এর সূচনা হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণ রক্ত, পুঁজ ও মৃতদেহের সংস্পর্শ বর্জন করায় শল্যচিকিৎসা ক্রমে ক্রমে অন্ত্যজগণের আওতায় আসে। ক্ষৌরকারেরা শল্যচিকিৎসার অধিকারী হয় এমন কি পশুপালকেরাও অস্থিভঙ্গের চিকিৎসা আরম্ভ করেন। মধ্যযুগীয় ইংলণ্ডেও ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকেরা প্রাধান্য লাভ করেছিলেন এবং উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিরা শল্য চিকিৎসা ব্যবসা করতেন না।

হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞানের "পঞ্চভূত"-এর মত য়ুনানী চিকিৎসকেরা শরীরের প্রধান উপাদানকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করেন, যথা : (১) আর্কান্ (২) মিজাজ্ (৩) আখ্লাত্ (৪) আজা (৫) আর্ভা (৬) কুভা এবং (৭; অফাল্। উক্ত উপাদানসমূহকে বলা হত "উম্ উর ই তাবিয়া"। তাঁরা বলতেন যে, মানুষের সুস্থতা খাদ্য, পানীয়, পেশীসঞ্চালন, বিশ্রাম, নিদ্রা, জাগরণ, মলত্যাগ, ধারণ ও কাম প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে।

জিয়া উল্ দিন্ বারাণী নামক ঐতিহাসিক ফিরোজ শাহ্ তুঘলক-এর রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮) একটি ইতিহাস রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থে সর্বপ্রথম য়ুনানী চিকিৎসক মৌলানা বদর্ উল্ দিন্ দিমিস্কি-এর নাম উল্লিখিত আছে। এ ছাড়া মহাচন্দ্র তাবিব্ ও জাজা নামক দুইজন হিন্দু য়ূনানী চিকিৎসকের নামও পুস্তকটিতে দেখা যায়। মুহম্মদ তুঘলক-এর রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫৫) দিল্লীতে ৭০টি আরোগ্যশালা ছিল এবং ১২০০ য়ূনানী চিকিৎসক সেইগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খাজা সামস্ উল্ দিন প্রণীত "মাজমু এ সাম্সী" নামক পুস্তকে নাগার্জুন ও যোগীশ্বর-এর কথাও উল্লেখ আছে। ফিরোজ শাহ তুঘলক্ নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং

ভগ্ন অস্থি পুনর্সংস্থাপন করতে পারতেন। চক্ষুরোগ সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল অপরিসীম এবং তিনি চক্ষুপ্রদাহের জন্য এক প্রকার প্রলেপ তৈয়ারী করে ছিলেন। প্রলেপটির নাম ছিল "কুল এ ফিরোজশাহী"। তাঁর আদেশে "তিব্ এ ফিরোজশাহী" নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৮ ও ১৩৯৯ খৃঃ অব্দে ভারত আক্রমণ করেছিলেন এবং আদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর অধিকৃত এলাকার প্রতিটি শহরে একটি মসজিদ, একটি মখ্তব একটি মুসাফিরখানা ও একটি দাওয়াখানা স্থাপনা করতে হবে। কাশ্মীরের স্থলতান জৈন্থল আবেদিন-এর রাজত্বকালে (১৪২২-১৪৭২) মন্‌স্থর নামক চিকিৎসক দুইখানি চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। উক্ত রাজসভায় শ্রীভাট্ নামক এক হিন্দু চিকিৎসকও ছিলেন।

বাহ্মনী স্থলতান দ্বিতীয় আলাউদ্দিন আহ্মদ তাঁর রাজত্বকালে রাজ্যের সর্বত্র আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন। তাঁর পায়ের একটি দুরুহ ক্ষতের চিকিৎসা করে নৃসিংহ সরস্বতী নামক চিকিৎসক খ্যাতি লাভ করেন।

গুজরাটের স্থলতান মাহমুদ শাহ্ (১৪৫৮-১৫১১) রাজসভার পণ্ডিতদের সাহায্যে ভাগভটের "অষ্টাঙ্গহৃদয়" গ্রন্থটি পারসিক ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পারসিক ভাষায় লিখিত চিকিৎসা পুস্তকসমূহের মধ্যে "তারিখ্ এ ইবন্ এ খাল্লিকান্", "মিশকাত্ শরিফ", "তিব্ এ মাহ্মুদী" ও "সিফা এ মাহ্মুদী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ফিরিস্তা (১৫৭০-১৬১১) নামক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, স্থলতান মাহমুদ খালজী সাহিবাবাদ (বর্তমান মধ্য প্রদেশের মাণ্ডু) শহরে একটি আরোগ্যশালা স্থাপনা করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠানটির ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে মিঁয়া ভাউয়া বা বেহ্ওয়া বিন্ খারাশ খান্ একটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুগ পারসী পুস্তক লিখেছিলেন।

বিজাপুরের স্থলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল্ শাহ্-এর রাজত্বকালে পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক ফিরিস্তা ১৫৯০ খৃঃ অব্দে "দস্তর উল্ আতিব্বা" অথবা "ইখ্তিয়ারত্ এ কালিমি" নামক এক পুস্তক রচনা করেন। বিজাপুরের স্থলতানের সভা-শল্যচিকিৎসক সম্বন্ধে ইতালীয় ভারত পরিব্রাজক মানুচ্চি (১৬৫৩-১৭০৮) ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। উক্ত চিকিৎসক দ্বারা কর্তিত নাসিকার পুনর্গঠন সম্বন্ধীয় ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

১৪৮৭ খৃ অব্দে আহ্মেদনগর-এ নিজামশাহী রাজ্য স্থাপিত হয়। নবাব

বুরহান নিজামশাহ্, হাকিম ওয়ালী নামক চিকিৎসক দ্বারা "তাকিম্ উল্ আব্দান", "রিসালা এ হিপজ্ এ সিহাত্ এবং "তাকিম্ উল্ আম্রাজ" নামক তিনিটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করান। মুর্তাজা নিজাম শাহ্-এর রাজত্বকালে রুস্তম জুর্জানী "দাখিরা এ নিজাম্শাহী" নামক চিকিৎসা পুস্তক রচনা করেন।

গোলকুণ্ডার সুলতান কুলী কুতব্ শাহ্ এর রাজত্বকালে (১৫৮১-১৬১১) মীর মোমিন নামক পণ্ডিত দুটি চিকিৎসা পুস্তক রচনা করেছিলেন। উক্ত রাজ্যে দরিদ্রগণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হত এবং শয্যাবিশিষ্ট আরোগ্যশালায় রোগীর চিকিৎসা করা হত। সেই সকল আরোগ্যশালায় ছাত্রগণ হাতে কলমে শিক্ষালাভ করত।

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর (১৫২৬-১৫৩০) দিল্লী এবং তাঁর রাজ্যের অন্যান্য শহরে মাসিক বেতনভোগী চিকিৎসক দ্বারা আরোগ্যশালা পরিচালনা করতেন। তিনি নিজে চিকিৎসাবিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁর পুত্র হুমায়ুনের রাজত্বকালে (১৫৩০-১৫৫৬) ইউসুফ বিন্ মোহাম্মদ বিন্ ইউসুফ নামক পণ্ডিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা করেছিলেন এবং আয়ুর্বেদ থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসার নিয়মাবলী, রোগের তালিকা, রোগ নির্ণয় পদ্ধতি এবং প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ সম্বন্ধে এক সংকলন প্রণয়ন করেন। উক্ত পণ্ডিতকেই গ্রীক আরবী ও ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির প্রকৃত সমন্বয়কারী বলে অভিহিত করা হয়। হুমায়ুনের সভাসদ মৌলানা মহম্মদ ফজল্ ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে "হুমায়ুনী" শীর্ষক একটি মহাকোষ রচনা করেছিলেন যার মধ্যে চিকিৎসা বিষয়ক একটি খণ্ড ছিল। গ্রন্থটিতে উল্লিখিত আছে যে, ১৫৪২ খৃঃ অব্দে বিচারকের ভুলক্রমে শাস্তিস্বরূপ হুসেন নামক এক ব্যক্তির কর্ণ কর্তিত করা হয় পরে সেই ভুল প্রমাণিত হওয়ায় অনুতপ্ত সম্রাট নিজ তত্ত্বাবধানে বিচক্ষণ শল্যচিকিৎসকের দ্বারা কর্তিত কর্ণটি পুনঃনির্মাণ করিয়ে দেন। ভারতীয় "গাঠনিক শল্যতন্ত্র" বা প্লাষ্টিক সার্জারীর ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনা প্রাচীনতম বলে মনে করা হয়।

হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র আকবর সিংহাসনে আরোহন করেন (১৫৫৫-১৬০৫)। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি শিশুর মানসিক গঠনের উপর মাতৃবাক্যের প্রভাব নিয়ে এক অভিনব কিন্তু নির্মম গবেষণা করেছিলেন। কতকগুলি মাতৃহীন শিশুকে পরিচারিকার অধীনে রাখা হয় এবং পরিচারিকাগণকে শিশুদের সঙ্গে আবোলতাবোল বাক্যালাপে

বিরত করা হয় ; ফলে কিছুকালের মধ্যেই অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হয় এবং যে কয়েকটি মাত্র জীবিত ছিল তারা মূক হয়ে যায়। জার্মানীর কাইজার দ্বিতীয় ফ্রেডেরিখ্‌ও অনুরূপ এক গবেষণা করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, জন্মের পর হতে শিশুর কর্ণে যে ভাষা প্রবিষ্ট হয়, শিশু সেই ভাষাতেই বাক্যারম্ভ করে। আকবরের "নবরত্নের" অন্যতম ছিলেন ঐতিহাসিক আবুল্ ফজল্। তিনি ২৯ জন হিন্দু ও মুসলমান চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবিচন্দ্র, বিদ্যারাজা, তোডরমল্ল ও নীলকণ্ঠ। আকবর বহু আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তৎকালে বহু চিকিৎসক স্বগৃহেও চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। সেই সময় পারস্যের জিলানী নগর থেকে হাকিম্ আলী জিলানী নামক এক বিখ্যাত চিকিৎসক এসেছিলেন এবং কালক্রমে তিনি সম্রাটের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিচক্ষণতার জন্য তাঁকে "জালিনুস্ এ জামান্" বা সেই যুগের "গ্যালেন" নাম দেওয়া হয়েছিল। তিনি হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতা ও হৃদয়ের কপাটিকার উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে ১৫৯৩ খৃঃ অব্দে লাহোরে এবং ১৬০৭ খৃঃ অব্দে আগ্রা শহরে দুটি সংরক্ষিত পানীয় জলাধার খনন করা হয়েছিল। আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু হাকিম হুমাম্ তাঁর হারেমের রমণীদের চিকিৎসা করতেন। শুষ্ক তাম্রকুটের ধূম্রপান করলে যে শ্বাসযন্ত্রের রোগ হয় এ কথা সর্বপ্রথম বলেন হাকিম জিলানী এবং তিনি তাম্রকুটধূম্র সুশীতল জলের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করে ধূম্রপানের অনুমোদন করেন। বর্তমান কালের কর্কটরোগ বিশেষজ্ঞগণও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। (১৬০৫-১৬২৭)। তিনি সম্রাট হয়েই এক বারদফা কর্মসূচী প্রচার করেন। যার মধ্যে একটি ছিল বড় বড় সহরে আরোগ্যশালা স্থাপনা ও রাজকোষপুষ্ট চিকিৎসক দ্বারা সাধারণের চিকিৎসা। তাঁর রাজত্বকালে প্রকাশিত "তুজুক্ এ জাহাঙ্গীরি" নামক পুস্তকে জলাতঙ্ক রোগ ও মহামারী সম্বন্ধে সুলিখিত নিবন্ধ ছিল। জাহাঙ্গীর একটি মৃত নেকড়ে বাঘ-এর শবব্যবচ্ছেদ করে শারীরস্থান জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তাঁর আদেশে একটি চর্মহীন মেষের শবদেহ আহমদাবাদের একস্থানে ও অপর একটি মাহমুদাবাদ শহরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সাত ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে আহমদাবাদের শবটিতে পচন

আদেশ করেন। পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার বহু যাজক চিকিৎসককে ধর্মীয় সংস্থা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। যাজক চিকিৎসকরা মুর্খ জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রকে পুনরায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলেন। মধ্যযুগের চিকিৎসাগ্রন্থে দেখা যায় যে যাজক চিকিৎসকগণ বলতেন, সেণ্ট ব্লেজ কণ্ঠনালীর, সেণ্ট এ্যাপোলোনিয়া দন্তের, সেণ্ট বের্নাডিন শ্বাসনালীর, সেণ্ট লরেন্স পৃষ্ঠের ও সেণ্ট এরাস্‌মুস উদরের অধিদেবতা। স্বল্প শিক্ষিত বা প্রায় নিরক্ষর যাজকগণ উক্ত বিষয়ে আস্থা স্থাপন করে শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগের চিকিৎসায় উক্ত অধিদেবতাগণের উদ্দেশ্যে পূজা দিতেন। সেণ্ট গালেন শহরের ক্যারোলিনগিয়ান মঠে একটি উন্নত আরোগ্যশালা ছিল। দ্বাদশ শতকে কোলোনের এক গির্জার যাজকগণ প্রচার করেন যে, তাঁরা খৃষ্টজন্ম নিরীক্ষণকারী পবিত্র প্রাচ্য পুরুষত্রয়ের সংগৃহীত করোটি স্পর্শে রোগ নিরাময় করে থাকেন। সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে রোগী গির্জায় উপস্থিত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়। রোগীরা মধ্যযুগে রাজনানুগ্রহ লাভের জন্য রাজসমীপে যেত। রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করে আশীর্বাদ করতেন ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ড দি কন্‌ফেসর। ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই প্রায় দুই তিন সহস্র রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন। স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লস ও রাণী এ্যান্‌ও অনুরূপ বিশ্বাস করতেন।

মধ্যযুগে তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে যাজকগণ পথিপার্শ্বে নির্মাণ করেন "হস্‌পিতালিয়া" নামক অতিথিশালা। কালক্রমে অনাথ বালক বালিকা ও কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও উক্ত সংস্থাগুলিতে বাস করতে দেওয়া হত। পুরাকালে য়ুরোপে কুষ্ঠব্যাধি ছিল না। প্রাচ্য হতে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহের মধ্য দিয়ে য়ুরোপে কুষ্ঠ ব্যাপ্ত হয়েছিল। য়ুরোপে কুষ্ঠরোগীদের শহরের সীমানার বাইরে বাস করতে বাধ্য করা হত। মধ্যযুগের য়ুরোপে প্রায়ই প্লেগ মহামারী দেখা দিত।

সে সময় প্লেগের নাম ছিল "কৃষ্ণ মৃত্যু"। চতুর্দশ শতকে য়ুরোপের প্রায় এক চতুর্থাংশ অধিবাসী প্লেগ রোগে প্রাণ হারান। য়ুরোপের মূল ভূখণ্ডের কনস্তান্তিনোপল্‌ ও গ্রীস দেশে ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্লেগ দেখা যায়। অতঃপর স্পেন, উত্তর ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে প্লেগ বিস্তার লাভ করে। যোহানেস্‌ নোহ্‌ল্‌ বলেছেন যে, প্লেগ রোগ সুদূর চীন দেশ থেকে রুশিয়া, পারস্য ও তুরস্কের বাণিজ্যপথ ধরে য়ুরোপে প্রবেশ করেছিল।

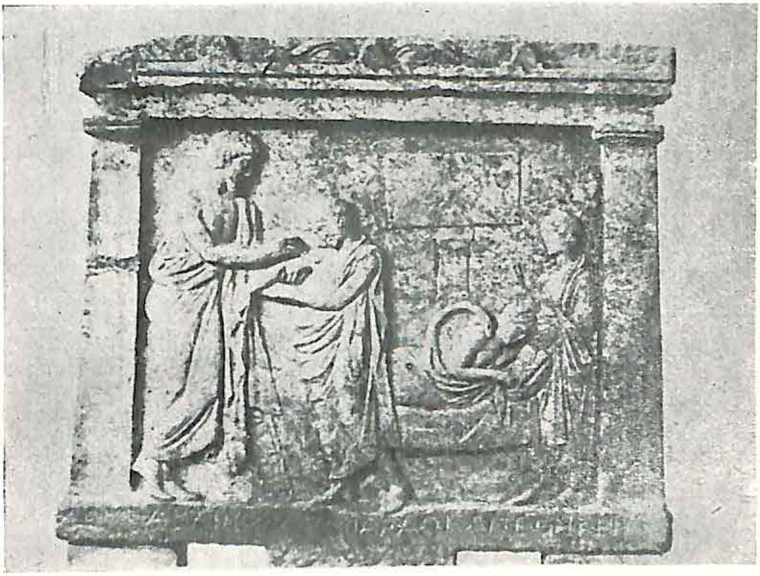

চিত্র ৩৪—ইস্কুলাপিউস কর্তৃক রোগীর চিকিৎসা।

চিত্র ৩৫—ইস্কুলাপিউস কর্তৃক ব্যবহৃত শল্যযন্ত্র।

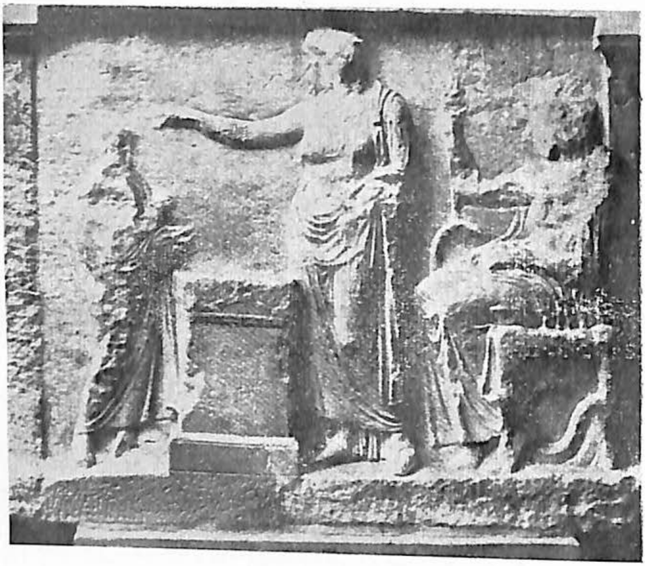

চিত্র ৩৬—ইস্কুলাপিউস, হাইজিয়া ও বিষহীন সর্প।

চিত্র ৩৭—হাইজিয়া ও বিষহীন সর্প।

চিত্র ৩৮—প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক ইয়াসন কর্তৃক এক শিশুর উদর পরীক্ষা।

চিত্র ৩৯—প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসক কর্তৃক মুত্র পরীক্ষা।

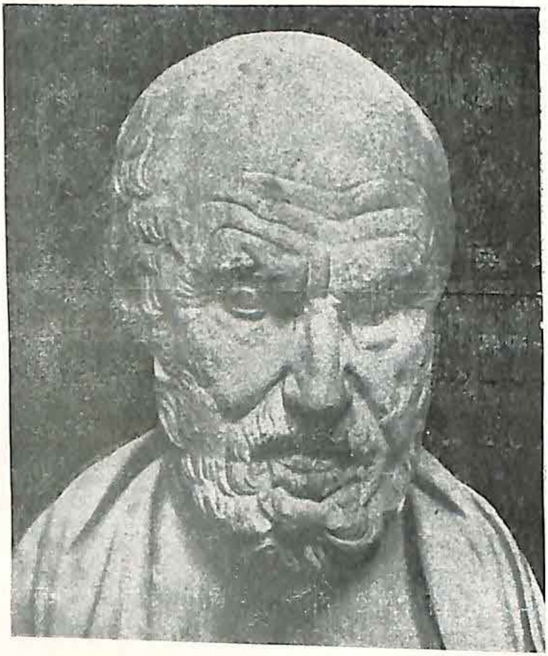

চিত্র ৪০—পাশ্চাত্যচিকিৎসা ধারার প্রবর্তক হিপ্পোক্রাতেস্ হেরাক্লিদে।

চিত্র ৪১—এই বৃক্ষের এক পূর্বপুরুষের ছত্রছায়ে হিপ্পোক্রাতেস্ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন (ডঃ উইল্‌ডার পেন্‌ফিল্ড-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)।

ফ্রান্সিস্কান যাজক মিথাইল লিখেছেন যে, ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে বারোটি জাহাজ ভর্তি প্লেগাক্রান্ত জেনোয়াবাসী নাবিক সিসিলির মেসিনা বন্দরে অবতরণ করে সমগ্র সিসিলিতে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে দেয়। প্লেগ হতে কারও নিস্তার ছিল না। রোগের সূচনায় রোগীর দেহে বিস্ফোটক দেখা দিত এবং রোগী প্রবল জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে রক্তবমণ করতে করতে মারা যেত। রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকায় সুস্থ মেসিনাবাসীরা শহর পরিত্যাগ করে বনে পলায়ন করে এবং কেউ কেউ ইতালীর মূল ভূখণ্ডে চলে যায়। উক্ত পলাতক মেসিনাবাসী-গণের মাধ্যমে প্লেগ ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইতালীতে ছড়িয়ে পড়ে।

মধ্যযুগীয় চিকিৎসকগণ প্লেগ রোগের কারণ এবং চিকিৎসা উভয় বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন। গী ছ শালিয়াক্ বলেছেন যে তাঁরা প্লেগের প্রতিষেধক হিসেবে অতিরিক্ত জলীয় খাদ্য পান, মাংস ভক্ষণ ও মদ্য পান নিষিদ্ধ করতেন এবং বারনারী সম্ভোগও নিষিদ্ধ ছিল। বায়ুর সঙ্গে প্লেগ রোগ বিস্তৃতি লাভ করে—এই ধারণায় চিকিৎসকগণ রোগীগৃহে যাওয়ার আগে মুখোস, আলখিল্লা ও দস্তানা পরিধান করতেন। দূষিত বায়ু পরিশোধনের জন্য রোগীগৃহে দুর্গন্ধ-যুক্ত ছাগ রাখা হত এবং রোগীর দেহে বহু প্রকার তাবিজ ও মাদুলী বাঁধা থাকত। ১৩৭৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীর রেজিও শহরে প্লেগ দেখা দেয় এবং শহরের শাসক ভিস্কম্তে বেরনারো রোগীদের শহরের বাইরে বহিষ্কৃত করেন এবং শুশ্রূষাকারীগণকে সুস্থ ব্যক্তিগণের সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেন।

কিন্তু বেরনারোর শত চেষ্টা সত্ত্বেও ইঁদুরের সাহায্যে সংক্রামিত "বাগী প্লেগ" (বিউবোনিক প্লেগ) এর কোনও উপশম হয় নি। সিসিলির রাগুসা বন্দরের নিকট একটি রোগাবাস নির্মিত করা হয়েছিল। রাগুসা বন্দরে আগমনকারী সমস্ত জাহাজযাত্রীদের ৩০ থেকে ৪০ দিন ছিল উক্ত আবাসে বাধ্যতামূলক ভাবে বসবাস করতে হত। ইতালীয় ভাষায় ঐ প্রথাকে বলা হয় "কোয়ারেন্তা জিওর্নি" অর্থাৎ 'নিরোধক দিবস"। পৃথিবীতে অধুনা সুপ্রচলিত "কোয়ারেণ্টাইন" পদ্ধতি "কোয়ারেন্তা জিওর্নি"র আধুনিক রূপান্তর মাত্র।

জার্মানরা ইতালীয় রোগনিরোধক প্রথার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাদের দেশে ঐ চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। জার্মানীতে বিধিভঙ্গকারীদের নির্মম শাস্তি দেওয়া হত। ক্যোনিগস্‌বের্গের বারবারা থ্‌্যটিন নাম্নি এক গৃহ পরিচারিকা এক প্লেগরোগীর ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ নিয়ে আসায় থ্যটিন ও তার প্রভু উভয়েই প্লেগ রোগে মারা যায়। শহরের বিধিভঙ্গকারীদের মধ্যে

ভীতিসঞ্চারের জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ থ্যুটিন এর মৃতদেহটি প্রকাশ্য স্থানে ঝুলিয়ে রেখে ছিল।

মধ্যযুগের যাজকগণ মনে করতেন যে বাইবেলে বর্ণিত অশ্বারোহী চতুষ্টয়ের (ফোর হর্সমেন অব দি এ্যাপোকালিপ্সে) দ্বারা প্লেগ রোগ ব্যপ্ত হয়। স্পেনদেশীয় যাজকগণ বলতেন যে, প্লেগ অত্যধিক নাট্যাভিনয়ের ফল। ফরাসী সম্রাট ফিলিপের পুত্ররা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল, রাজবংশের ধর্মগুরুর মতে উক্ত সামাজিক অনাচারই প্লেগের কারণ। দেশের এ চরম দুর্দিনে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিতগণ জনসাধারণগণকে বিভ্রান্ত করতেন অলীক কল্পনার দ্বারা। ক্যাপুচিন ও নির্বোধের দল (কম্প্যানিস্ অব দি ফুলস্) নামক যাজকগোষ্ঠীর সাধুরা প্লেগ রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্লেগ রোগের ক্রমবর্ধমান আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ ইহুদীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং বহু নিরপরাধ ইহুদিকে লোকসমক্ষে জীবন্ত দগ্ধ করে।

রোম সাম্রাজ্যের পতনের সমসাময়িক কালে নেপ্‌লস্ শহরের দক্ষিণে ছিল সালের্নো নামক এক স্বাস্থ্যাবাস। নবম শতাব্দীতে ঐ স্থানে একটি বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ্যালয় এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট সার্লেমান ঐ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। আবার কারও মতে ইহুদি এলিনুস, গ্রীক পণ্টুস, আরবীয় আদ্‌আলী ও রোমক সালের্নুস নামক চারজন চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ঐটি প্রতিষ্ঠিত। জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে কোন পুরুষ এমন কি স্ত্রীলোকও ঐ স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত। সালের্নো বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ পাঠাভ্যাস করতেন ক্যাসিনোতে অবস্থিত ধর্মীয় পুস্তকাগারে। সালের্নো থেকে পাঠ সমাপ্তির পর সকল ছাত্রদের উপাধি দেওয়া হত। খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী বহু আহত যোদ্ধা সালের্নোতে চিকিৎসা করিয়েছিলেন! ইংলণ্ডেশ্বর বিজয়ী উইলিয়ামের জ্যেষ্ঠপুত্র রবার্ট চিকিৎসা ব্যপদেশে বহুদিন সালের্নোতে বাস করেন। সেই সুযোগে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় উইলিয়াম ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ডঃ হেসের তাঁর "লেরবুখ্ দেস্ গেশিখ্‌তে দের মেদিৎসিন" গ্রন্থে লিখেছেন যে, সালের্নোতে শিক্ষাপ্রাপ্তা পাঁচজন স্ত্রীচিকিৎসকের মধ্যে কনস্তান্তিয়া কালেন্দার অতিশয় খ্যাতিলাভ করেন। ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে সাধু রুডলফ্ সালের্নো পরিদর্শনে গিয়ে টরটুল্লা নাম্নী এক বিচক্ষণা চিকিৎসকের

সংস্পর্শে আসেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সিচেলগার্তা নামক এক বিষবিজ্ঞানে (টক্সিকোলজি) পারদর্শিনী মহিলা চিকিৎসক হিংসাপরায়ণা হয়ে তাঁর স্বামী ডিউক রবার্ত গিস্কর্দিকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। ইংল্যাণ্ডে স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা শাস্ত্র পাঠ করতে দেওয়া হয় আজ থেকে মাত্র দুই শতাব্দী আগে থেকে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, সালের্নোর অধ্যাপকগণ ছিলেন নারী প্রগতিপন্থী।

সালের্নোর খ্যাতি ম্লান হবার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী দেশের দক্ষিণে মঁপেলিয়ের ও উত্তর পূর্ব ইতালীর বোলোনিয়া ও পাডুয়া নামক দুটি স্থানে চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। মঁপেলিয়ের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ভিলানোভা শহরবাসী আর্নল্ড নামক এক পর্তুগীজ চিকিৎসক। তিনি ধর্মতত্ত্ব, আইন শাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সুহৃদ পোপ অষ্টম বনিফেসের অনুরোধে তিনি কেবলমাত্র চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। তিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দ্রাক্ষারস (অ্যালকোহল) সাহায্যে ভেষজ নির্যাস প্রস্তুত কারক। পূর্বে উল্লিখিত গী দ্য শালিয়াক্ মঁপেলিয়ের ও বোলোনিয়াতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পোপ ষষ্ঠ ক্লেমেণ্ট-এর সভা চিকিৎসক এবং 'চিরুরগী ম্যাগনা' নামক একটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা। গিলবার্ট এ্যাঙ্গেলিকুস্ ও জন্ নামক দুজন ইংরাজও শিক্ষালাভ করেন মঁপেলিয়েরে। জেওফ্রে চসার প্রণীত "ক্যাণ্টারবারি কাহিনী" পুস্তকে জন্এর নাম উল্লেখ আছে। তিনি এডওয়ার্ডের পুত্রকে বসন্ত রোগ হতে রক্ষা করেন। "শরীরের ইতিহাস" নামক পুস্তকে ফ্রেণ্ড নামক এক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, জন্ ভেষজ সাহায্যে মূত্রাশয়ের পাথুরী দ্রবীভূত করতেন ও প্রলেপ দ্বারা বাতের চিকিৎসা করতেন।

মঁপেলিয়ের-এর খ্যাতি সালের্নো অপেক্ষা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিদ্যা লাভের জন্য ছাত্রগণ প্যারী ও পাডুয়া যেত। প্যারীবাসী ইংরাজ ফ্রান্সিস্কান যাজক রোজার বেকন (১২১৪-১২৯৪) এবং জার্মান ডোমিনিকান যাজক আলবের্টুস মাগনুস (১১৯২-১২৮০) ছিলেন প্যারীর চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লিপ্ত থাকায় এবং ধর্মচর্চায় অবহেলা করবার অপরাধে বেকন ফ্রান্সিস্কান যাজক সম্প্রদায় হতে বহিষ্কৃত হন।

S.C.E.R.T., West Bengal Library

রেনেসাঁস যুগে চিকিৎসাশাস্ত্র

মধ্যযুগের পরবর্তীকালে য়ুরোপের শিল্প ও সাহিত্যের পুনরভ্যুদয়ের যুগকে বলা হয় রেনেসাঁস যুগ। মধ্যযুগীয় বর্বরতার অবসানে, মধ্যয়ুরোপের টিউটনিকেরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে শিল্প ও সাহিত্যের পুনরুন্মেষের জন্য সচেষ্ট হয়। এই যুগের শিল্পীদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং আলব্রেখট্ ড্যুরের এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এক সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক। তিনি মৃত মানুষের শব ব্যবচ্ছেদ করে গ্যালেন প্রবর্তিত শারীরস্থান তথ্যের বহু ভুল নির্ণয় করেন। এই যুগে, বেলজিয়মের ব্রুসেলস্ শহরে বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ আঁদ্রিয়া ভেসালিউসের (ভেসাল) জন্ম হয়েছিল। তিনি লুভেঁ, প্যারী ও পাডুয়াতে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর

চিত্র ৫৭

পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হয়ে সমগ্র য়ুরোপের ছাত্রমণ্ডলী তাঁর নিকট সমবেত হত। পাঁচ বৎসর শিক্ষকতা করবার পর তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দে করপোরী হুমানিস্" বা "নরদেহের গঠন"। গ্রন্থটি চিত্রিত করেছিলেন বিখ্যাত ইতালীয় শিল্পী টিজিয়ানো ভেচেল্লিও বা টিটিয়ান। পুস্তকটি প্রকাশের পর ভেসালিউসকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক ইয়াকোবুস্ সিল্‌ভিয়ুস্ এবং প্রিয় ছাত্র কলমুস্ প্রকাশ্যে তাঁকে অপমান করতেও বিরত থাকেন নি। নিরুৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি দগ্ধ করেন। ভেসালিউসের কৃতিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংলণ্ডে আইন দ্বারা ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণকে বৎসরে চারটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির শব ব্যবচ্ছেদ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। পাডুয়া হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ ডঃ জন কেয়ুস ১৫৪৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের ক্ষৌরকার শল্য সংস্থার (বার্বার সার্জনস্ গিল্ড) শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে পাডুয়াতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অপর এক বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজের নাম উইলিয়ম হার্ভে যিনি মানুষের শরীরের রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন।

চিত্র ৫৮

রেনেসাঁস যুগের অপর এক বিখ্যাত চিকিৎসকের নাম ফিলিপ্পুস আউরিয়ালিউস্ থিওফ্রাষ্টুস্ ফন্ হোহেনহাইম্। সংক্ষেপে "পারাসেলসুস" অর্থাৎ সেলসুস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই নামে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডের

চিত্র ৪২—আরিষ্টটল্

চিত্র ৪৩—গ্যালেন

চিত্র ৪৮—ইবনেসিনা বা অভিসেন্না।

আইন্‌সিদেলেন্ শহরের বোমবাষ্ট বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে মাতৃহীন হওয়ায় পিতার সঙ্গে অষ্ট্রিয়ার কারিন্থিয়া প্রদেশের ভিলাখ্ শহরে বাস করতেন। তাঁর পিতা ভিলাখ্ শহরে চিকিৎসাব্যবসায় করতেন। তিনি পুত্রকে প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দেন। তারপর প্যারাসেলসুস্ স্বোয়াৎস্ শহরের জিগ্‌মুণ্ড ফুগের এর নিকট রসায়ন শাস্ত্র ও অপরসায়নশাস্ত্র (আরবী-আল খেমি) শিক্ষা করেন। তিনি ভিয়েনা চিকিৎসা বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি দেশে স্নাতকোত্তর শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সালৎস্‌বুর্গ শহরে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করলে নাগরিকগণের চক্রান্তে তাঁকে ঐ শহর পরিত্যাগ করতে হয়। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে স্থইজারল্যাণ্ডের বাজেল শহরবাসী মানবতাত্ত্বিক (হিউম্যানিষ্ট) পণ্ডিত ফ্রোবেন অসুস্থ হন এবং প্যারাসেল্‌সুস্ কর্তৃক চিকিৎসিত হয়ে আরোগ্যলাভ করেন। ফ্রোবেন-এর প্রচেষ্টায় প্যারাসেল্‌সুস্ বাজেল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাপক ও শহরের পৌরচিকিৎসকের পদ লাভ করেন। তিনি লাতিন ভাষার পরিবর্তে তাঁর মাতৃভাষা জার্মানে বক্তৃতা দিতেন। দুই বৎসর পর তিনি বাজেল ত্যাগ করে কোলমার ও সেণ্টেগালেন শহরে চিকিৎসা শুরু করেন। প্যারাসেলসুস্ বলতেন, "জ্ঞান কেবলমাত্র বই-এর পাতায় নিবদ্ধ থাকে না। চিকিৎসা ও বিজ্ঞান পাঠ করতে গেলে সর্বপ্রথম দর্শনশাস্ত্র পাঠ করা উচিত। চিকিৎসককে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থ হতে হবে এবং চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলে দিবারাত্র রোগীর বিষয় চিন্তা করতে হবে।"

১৫১০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশের লাভাল শহরে এক ক্ষৌরকারের গৃহে বিখ্যাত আঁব্রয়ে পারের জন্ম হয়। জেষ্ঠ্য, ভ্রাতা ও খুল্লতাতের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্রের

চিত্র—৫৯

প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করবার পর তিনি প্যারীর বিখ্যাত ওতেল্ দীউ নামক চিকিৎসালয়ে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হন। লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যে অনভিজ্ঞ হওয়ার জন্য তাঁকে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি। তিনি হিপ্পোক্রাতেসের ন্যায় প্রকৃতি বিদ্যা চর্চা করে রোগ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে রক্তক্ষরণ বন্ধ করবার জন্য ধমনীবন্ধন (লিগেচার) প্রথার প্রবর্তন করেন এবং গর্ভপথে আবদ্ধ শিশুকে ঘুরিয়ে প্রসব সুসাধ্য করার পথ আবিষ্কার করেন। অঙ্গহীন ও বিকলাঙ্গের জন্য তিনি নানা প্রকার কৃত্রিম

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভাবন করেছিলেন। ফরাসীদেশের ক্যাথলিক ও হুজেন্‌ট্‌গণের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় সৈন্যাধ্যক্ষ মারেশাল্‌ দ্য মতেয়ার অধীনে তিনি সৈন্য-বাহিনীর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর ধরে কৃতিত্ব প্রদর্শনের পর পারে প্যারীর সেণ্টকোম চিকিৎসা বিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলীর স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সুদীর্ঘ ৮০ বৎসরকাল বৈচিত্র্যময় জীবন যাপন করে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। প্যারীর সেণ্ট আঁদ্রে দেস আর্তস্‌ গীর্জার প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধি আজও বিদ্যমান।

রেনেসাঁস যুগের ইংরাজ চিকিৎসকগণের মধ্যে টমাস্‌ লিন্‌একার-এর (১৪৬০—১৫২৪) নামও উল্লেখযোগ্য। লিন্‌একার ক্যাণ্টারবারী শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি অকস্‌ফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সপ্তম হেনরী কর্তৃক সভা চিকিৎসক নিযুক্ত হন। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে তাঁর উদ্যোগে লণ্ডনে রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিদ্যালয় বা রয়্যাল কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্‌ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই তার প্রথম সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেন। পূর্বে উল্লিখিত জন কেয়ুজ পাডুয়া শহরে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে ইংল্যাণ্ডের নরউইচে চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন এবং অষ্টম হেনরী, ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, রাণী মেরী ও রাণী প্রথমা এলিজাবেথের অধীনেও চাকুরী করেন। লিন্‌একারের পর তিনি রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি হন।

রেনেসাঁস যুগে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল—যথা, ভেষজ শাস্ত্রজ্ঞ, ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসক (বার্বার সার্জনস্‌) ও ভেষজ ব্যবসায়ী (এ্যাপোথেকারী)। ফরাসীদেশে ভেষজ শাস্ত্রজ্ঞদের "গ্রাঁদবুর্জোয়া" বা উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর এবং ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণকে "পেতি বুর্জোয়া" নিম্ন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হত। ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকগণ সমাজের উচ্চস্তরে মেলামেশা করবার সুযোগ পেতেন না। ষোড়শ শতকে ফরাসী ক্ষৌরকার শল্য চিকিৎসকেরা একত্রিত হয়ে এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। চিকিৎসাবিদ্যার বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও ইংলণ্ডে শল্য চিকিৎসা ব্যবসায় করা যেত। সেই সকল শল্য চিকিৎসকগণ পরিচিত ছিলেন, "মাষ্টার" বা ওস্তাদ নামে। পরবর্তীকালে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরাজ শল্য চিকিৎসকগণ মাষ্টারের পরিবর্তে "মিষ্টার"-এ পরিণত হয়। ইংলণ্ডে শিক্ষিত বহু ভারতীয় শল্য চিকিৎসকও "মিষ্টার" বলে সম্বোধিত হতে পছন্দ করতে। বিখ্যাত বাঙ্গালী শল্য চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় "মিষ্টার ব্যানার্জী"

নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ভেষজ ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ অন্য চিকিৎসকের নির্দেশে ঔষধ প্রস্তুত করতেন কিন্তু সুযোগ পেলে নিজেরাও রোগী পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের প্লেগ মহামারীর সময় তাঁরা চিকিৎসা করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরাও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সংস্থা (রয়েল সোসাইটি অব্ এ্যাপোথেকারীস্) নামে একটি সংস্থা স্থাপন করে সমিতিবদ্ধ হন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

সপ্তদশ শতকে য়ুরোপে বিজ্ঞান চর্চা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই শতকের বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে আছেন উইলিয়াম হার্ভে, ফ্রান্সিস্ বেকন, যোহানেস্ কেপ্‌লের, গ্যালিলিও গ্যালিলেই, রেনে দেকার্ত, ব্লেস্ পাস্‌কাল্, রবার্ট বয়েল, আইজ্যাক নিউটন, জন লক্, বেনেডিকটুস্ স্পিনোজা ও গটফ্রিদ্ হ্বিল্‌হেল্‌ম্ লাইবনিৎস্ এবং আরও অনেকে। গ্যালিলিও এক সরল অনুবীক্ষণ যন্ত্র অবিষ্কার করেছিলেন। ভবিষ্যৎ চিকিৎসাশাস্ত্রে তারই উন্নত সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছিল। সাংটোরিয়ুস নামক পাডুয়াবাসী বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর মতবাদ অনুসরণ করে সর্বপ্রথম একটি তাপমানযন্ত্র (থার্মোমিটার) আবিষ্কার করেন। রবার্ট বয়েলের ছাত্র জন্ মেয়ো অম্লজান বাষ্প প্রস্তুতে সমর্থ হন। কালক্রমে অম্লজান বাষ্প পরিণত হয় চিকিৎসার এক অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে। স্যর রবার্ট সিবাল্ড নামক এক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে এডিনবরার রাজকীয় ভেষজশাস্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আর্চিবল্ড পিটকেয়ার্ন নামক অপর এক স্কট্ চিকিৎসক উক্ত সংস্থার প্রধান সদস্য পদ লাভ করেছিলেন। তাঁরা ছাত্র জন মর্গ্যান আমেরিকার সর্বপ্রাচীন চিকিৎসা বিদ্যালয় পেন্‌সিল্‌ভ্যানিয়া স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষ্ঠাতা। বিজ্ঞানের এই সুবর্ণযুগে ইংলণ্ডে উইলিয়ামে হার্ভে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে কেম্ব্রিজ ও পরে পাডুয়ায় শিক্ষালাভ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি লণ্ডনের সেন্ট বার্থোলামিউ হাসপাতালে শল্যচিকিৎসা ও শারীরস্থান শাস্ত্রের অধ্যাপনা করতেন। পাডুয়ার অধ্যাপক ফাব্রিসিউস্-এর গবেষণায় অনুপ্রাণিত

চিত্র—৬০

হয়ে তিনি শারীরস্থান শাস্ত্রে গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। চতুর্দশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি মানব শরীরে রক্ত সঞ্চালনের চক্রবৃত্তগতি

আবিষ্কারে সমর্থ হন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর উক্ত তথ্য বিদ্বজ্জন সমক্ষে প্রচারিত হয়। প্রথমতঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও কালক্রমে তাঁর মতবাদই সত্য বলে পরিগণিত হয়। হার্ভের সমসাময়িককালে ইংলণ্ডের অপর বিখ্যাত চিকিৎসক টমাস্ সাইডেনহাম্ (১৬২৪-১৬৮৯) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অলিভার ক্রমওয়েলের সৈন্য বাহিনীতে চাকুরী করতেন। বাইশ বৎসর বয়সে চাকুরী পরিত্যাগ করে অক্সফোর্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি দিবারাত্র রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসে রোগের প্রতিটি লক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি রোগনির্ণয় শাস্ত্র বা ক্লিনিকাল ডায়াগ্নোসটিক্ মেডিসিন-এর প্রবর্তক। রক্তাল্পতা রোগের চিকিৎসায় লৌহঘটিত লবণ প্রয়োগ, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় সিনকোনা বল্কল চূর্ণ প্রয়োগ ও উপদংশের চিকিৎসায় পারদ ঘটিত লবণ প্রয়োগ বিধিও তাঁর অমূল্য অবদান। জীবৎকালে তিনি য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে খ্যাতিলাভ করেন।

গ্যালিলিও কর্তৃক আবিষ্কৃত অনুবীক্ষণ যন্ত্র সরল পরকলা (লেন্স) দ্বারা গঠিত। যৌগিক পরকলা (কম্পাউণ্ড লেন্স) উদ্ভাবনের বহু পূর্বে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মারচেল্লো ম্যালপিঘি ও ওলন্দাজ আন্তনি ভান লেউভেনহোক্ সরল পরকলার সাহায্যে বহু অদৃশ্য বস্তু দর্শন করেছিলেন। ম্যালপিঘি (১৬২৮-১৬৯৪) ছিলেন ইতালীর বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি জীবন্ত ব্যাঙের ফুসফুস পরকলার সাহায্যে পরীক্ষা করে কৈশিকা শিরা ও কৈশিকা ধমনীর (ক্যাপিলারিস্) মধ্যে রক্ত সঞ্চালন রহস্য উদ্ঘাটন করেন। ভ্রূণাবস্থায় রক্ত সঞ্চালন ও স্নায়ুতন্ত্রের গঠন সম্বন্ধে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছিলেন।

লেউভেন্হোক্ ছিলেন হল্যাণ্ডের ডেল্ফ্ট্ শহরে বস্ত্র ব্যবসায়ী। অবসর সময়ে তিনি স্ফটিক থেকে বিভিন্ন মানের পরকলা তৈরী করতেন এবং প্রায় দ্বিশতাধিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করেন। তাঁর অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অদৃশ্য বস্তুকে প্রায় ১৬০ গুণ বর্ধিত আকারে দেখা যেত। নিজের দন্তের মধ্য হতে সামান্য ময়লা নিয়ে তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তার মধ্যে জীবাণু দেখতে সমর্থ হন। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে। তাঁর আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যত উন্নতির প্রধান কারণ।

সপ্তদশ শতকের পূর্বে রোগনিদানতত্ত্ব (প্যাথলজি) সম্বন্ধে চিকিৎসকদের

বিশেষ জ্ঞান ছিল না। জিওভান্নি বাতিস্তা মরগান্নি নামক ইতালীয় বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, প্রতিটি রোগ শরীরের অভ্যন্তরে বিশেষ ধরণের পরিবর্তন সাধন করে। মরগান্নি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে ইতালীর ফোর্লি শহরে জন্মগ্রহণ করে ম্যালপিঝির শিষ্য আলবার্টিনি ও ভাল্‌সাল্‌ভা-এর অধীনে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। পাড়ুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যপনাকালে তিনি রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে রোগ কেন্দ্র নির্ণয় করতেন। উক্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথাকে তিনি "নিদান তাত্ত্বিক শারীরস্থান শাস্ত্র" (প্যাথোলজিক্যাল এ্যানাটমি) নামে অভিহিত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভিয়েনাবাসী অধ্যাপক কার্ল ফ্রেইহের ফন্ রোকীটান্‌স্কী মরগান্নি প্রবর্তিত শাস্ত্রের আরো উন্নতি সাধন করেছিলেন।

নিউটনের মৃত্যুর পরবর্তীকালে শারীরবৃত্ত, আপেক্ষিক শারীরস্থানতত্ত্ব (কম্পারেটিভ্ এ্যানাটমি) ও অনুবীক্ষণ শাস্ত্রের (মাইক্রোস্কোপি) উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটে। য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে হল্যাণ্ডের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা করা হত। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে হেরমান্ ব্যোরহাভে লেইডেনের ভেষজশাস্ত্র বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁর নিকট ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করতে আসতেন য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে। তিনি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন মৃত রোগীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে। ব্যোরহাভে এর ছাত্রগণের মধ্যে বার্ণের আলব্রেখট্ ফন্ হালের ও ভিয়েনার গেরহার্ড ভান্ স্থইটেন এর নাম পৃথিবীখ্যাত।

ব্যোরহাভে বলতেন যে, সকল চিকিৎসককে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে চলতে হবে। এক দেশের আবিষ্কার অন্য দেশের চিকিৎসকগণের সুবিধার্থে যথাসত্বর জানাতে হবে। অষ্টম হেনরীর রাজত্বের শেষকালে চেম্বারলেন (শাঁবেরলাঁ) নামক এক ফরাসী চিকিৎসক ইংলণ্ডে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র প্রসব ব্যবস্থা সরল করবার জন্য "প্রসব-সাঁড়াশী" (অবস্টেট্রিক্যাল্ ফরসেপস্) উদ্ভাবন করেন। বংশানুক্রমে তাঁরা উক্ত যন্ত্রের বিষয় বংশধরদের মধ্যে গোপন রেখেছিলেন। স্বার্থপর চেম্বারলেন বংশের শেষ চিকিৎসক ডঃ হিউ চেম্বারলেনেব মৃত্যুর পর (১৭২৮ খৃঃ) য়ুরোপের চিকিৎসকমণ্ডলী সাঁড়াশীটির বিষয় অবগত হন এবং ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

অষ্টাদশ শতকে ইংরাজ যাজক বৈজ্ঞানিক যোসেফ প্রিষ্ট্‌লি প্রমাণ করেন যে প্রশ্বাসিত দূষিত বায়ু জীবন্ত উদ্ভিদের সংস্পর্শে রাখলে পুনরায় দোষমুক্ত হয়।

আঁতোয়া লাভোসিয়ে নামক ফরাসী রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ প্রমাণ করেন যে, বায়ুর মধ্যস্থ অম্লজান বাষ্প ফুসফুসের মধ্যে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারাম্লজান বাষ্পে পরিণত হয়। ষ্টিফেন্ হালেস্ নামক ইংরাজ যাজক-বৈজ্ঞানিক রক্তের চাপ নির্ণয় করতে সমর্থ হন।

এই যুগে মানুষের পাচন ক্রিয়ার উপর অনেক গবেষণা হয়। ইতালীয় ধর্মযাজক আবে স্পালানজানী বলতেন যে, পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন ও সম্প্রসারণ দ্বারা খাদ্য মণ্ডে পরিণত হয় এবং পাচিত হয়। উইলিয়াম প্রাউট নামক ইংরাজ পাকস্থলীর অম্লের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেণ্ট মার্টিন নামক একটি কানাডীয় সৈন্যের উদরে বন্দুকের গুলীর আঘাতে একটি ক্ষত হয়। ক্ষতটি ক্রমে ক্রমে ভগন্দরে (ফিস্চুলা) রূপান্তরিত হয়। উইলিয়ম বোমণ্ট নামক এক মার্কিন চিকিৎসক উক্ত ভগন্দরের মধ্য দিয়ে পাচক রস সংগ্রহ করেন। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা বোমণ্ট প্রতিপন্ন করেন যে উক্ত রসে অম্ল ও অপর একটি অজ্ঞাত পদার্থ থাকে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে থেয়োডোর স্বোয়ান নামক জার্মাণ বৈজ্ঞানিক উক্ত অজ্ঞাত পদার্থের নামকরণ করেন, "পেপ্‌সিন্"। বোমণ্টের পরীক্ষার প্রায় শতবর্ষ পরে রুশ বৈজ্ঞানিক ইভান্ পেত্রোভিচ্ পাভ্‌লভ্ অস্ত্রোপচার দ্বারা কুকুরের পাকস্থলীতে ভগন্দর সৃষ্টি করে পাচকরস নিঃসরণ ও পাচন প্রক্রিয়ার উপর নতুন গবেষণা করেন এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে লুইজি গ্যাল্‌ভানি নামক বোলোনিয়াবাসী বৈজ্ঞানিক বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে একটি ব্যাঙের স্নায়ু রজ্জুতে প্রাণোন্মেষ করতে সমর্থ হন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পাভিয়া শহরের বৈজ্ঞানিক আলেসান্দ্রো ভোণ্টা অধিকতর শক্তিশালী বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যে মাংসপেশী সঙ্কুচিত করেন। প্রায় এক শতাব্দী পরে জার্মান শারীরবৃত্তজ্ঞ দ্যু বোয়া রেমঁ। প্রমাণ করেন যে, মানব শরীরে স্নায়ুর ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যুৎতরঙ্গ দ্বারা উন্মেষিত হয়। উক্ত স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্যুৎতরঙ্গ রেখাঙ্কিত করে আজ "হৃৎবিদ্যুৎ লেখন" (ইলেক্‌ট্রো কার্ডিওগ্রাফী) ও "মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ লেখন" (ইলেক্‌ট্রো এন-সেফালোগ্রাফী) করা হয়।

এই শতকে ইংলণ্ডে উইলিয়ম ও জন হাণ্টার নামক ভ্রাতৃদ্বয় সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। জন হাণ্টার উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর কৃতবিদ্য ছিলেন। উইলিয়ম প্রথমে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের চিকিৎসক। কালক্রমে লণ্ডনে ভাগ্যান্বেষণে এসে তিনি ডঃ জেমস্ ডগ্‌লাস্ নামক বিখ্যাত শারীরস্থানবিদ্-এর সান্নিধ্য লাভ

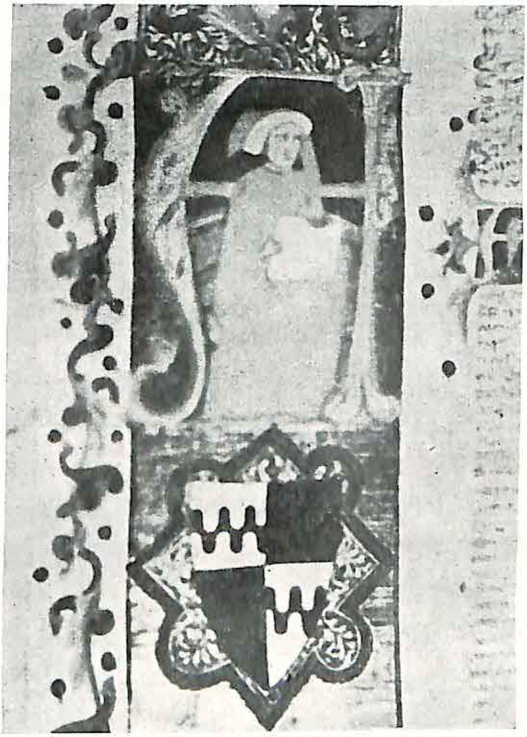

চিত্র ১৯—ইউহান্না ইবন্ মাসাওয়াই।

চিত্র ৫০—
ইবন্‌ঝুর।

চিত্র ৫১—ঔষধ প্রদানরত এক পারসিক চিকিৎসক।

চিত্র ৫২—উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা উপদংশ ক্ষত শোধন (পারস্য)।

চিত্র ৫৩—প্রাচীন পারস্যে শব ব্যবচ্ছেদ।

চিত্র ৫৪—প্রাচীন আরবে ঔষধ প্রস্তুত করণ।

চিত্র ৫৫—মুঘল আমলের প্রখ্যাত চিকিৎসক হাকিম সাদ্‌রা।

করেন। ডগলাসের মৃত্যুর পর উইলিয়ম লেইডেনে শারীরস্থান শাস্ত্র-পাঠ করেন ও লণ্ডনে ফিরে একটি শারীরস্থান বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জন হাণ্টার (১৭২৮-১৭৯৩) উইলিয়মের নিকট শারীরস্থান তত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন। তিনি লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ডঃ চেসেলডেন ও সেণ্ট বার্থোলামিউ হাসপাতালে ডঃ পার্সিভ্যাল পট্ এর নিকট শল্যচিকিৎসা শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে তিনি কিছুকাল পর্তুগালে ছিলেন। পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করে শারীরতাত্ত্বিক গবেষণায় আত্মনিয়োজিত করেন। উইলিয়ম ধমনীস্ফীতি (এ্যানিউরিজ্‌ম্) রোগের চিকিৎসার এক নতুন সীবন পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি লণ্ডনের লিষ্টার স্কোয়ারে যে বৃহৎ নিদানতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা (প্যাথোলজিক্যাল মিউজিয়াম) স্থাপনা করেছিলেন বর্তমানে সেই সংগ্রহশালাটি রাজকীয় শল্যচিকিৎসক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

জন অত্যন্ত দুঃসাহসী ছিলেন এবং দুঃসাহসিকতার জন্যই তিনি অকালে প্রাণত্যাগ করেন। প্রমেহ ও উপদংশ রোগের প্রভেদ বিচারের জন্য তিনি এক যৌন ব্যাধিগ্রস্থের ক্ষত থেকে পূঁজ নিয়ে নিজের শরীরে টিকা দেন এবং উপদংশ রোগাক্রান্ত হন। উপদংশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাঁর হৃদযন্ত্রের "মুকুট ধমনী" (করোনারী আর্টারী) অপরিসর হয়ে যায় এবং সেজন্য তিনি প্রায়ই হৃদিশূল (এ্যানজিনা পেক্‌টোরিস) বেদনায় কষ্ট পেতেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট জর্জ হাসপাতালে কর্মরত অবস্থায় হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে। জন হাণ্টার এর ন্যায় চিন্তাশীল, বিচক্ষণ ও অনুসন্ধিৎসু চিকিৎসক আজও বিরল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে পরিগণিত হন।

বসন্ত রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

খৃষ্টীয় ধর্মযুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যগণ ফিলিস্তিন থেকে বসন্ত রোগ য়ুরোপে আনেন। সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের বাসিন্দাদের প্রায় এক চতুর্থাংশ বসন্ত রোগে অকালে প্রাণত্যাগ করত। রাণী দ্বিতীয়া মেরীও বসন্ত রোগে মারা গিয়েছিলেন।

স্পেন থেকে অভিযাত্রীগণ কর্তৃক বসন্ত রোগ আমেরিকায় বিস্তৃত হয়েছিল। আমেরিকায় রোগটি মহামারীরূপে দেখা দেয়। বসন্তের কারণ বা চিকিৎসা উভয়ের সম্বন্ধেই চিকিৎসকগণ অজ্ঞ ছিলেন। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের ইংরাজ

রাজদূতের পত্নী লেডী মেরী অর্টলি মণ্টেগু তাঁর এক বান্ধবীকে লিখেছিলেন যে, তুরস্কে বসন্তের প্রতিষেধের জন্যে বসন্ত রোগীর মারী গুটিকা থেকে লসিকা নিয়ে সুস্থ বালক বালিকার দেহে সূচিকা সাহায্যে টিকা দেওয়া হয়। টীকা দেওয়ার পর শিশুদের দেহে স্বল্প পরিমাণে গুটিকা নির্গত হয় ও জ্বরভাব হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুগণ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ দেহে পরবর্তী জীবনযাপন করে। ইংলণ্ডে উক্ত প্রতিষেধক প্রথার প্রবর্তনের জন্য লেডী মণ্টেগু এককভাবে আন্দোলন করেছিলেন এবং রবার্ট সাটন নামক এক ভদ্রলোক লেডী মেরীর আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে অতি সতর্কতার সঙ্গে এসেক্স এর ইন্‌গেট্‌স্টোন শহরের প্রায় সতেরো হাজার ব্যক্তিকে টিকা দেন। মাত্র পাঁচ ব্যক্তি উক্ত টিকার বিষক্রিয়ায় প্রাণ হারান কিন্তু অপর সকলেই ভবিষ্যতে বসন্ত রোগের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। কটন মাথের নামক ব্যক্তি মার্কিন দেশে টিকা পদ্ধতির প্রবর্তক। মনুষ্যদেহের বসন্ত গুটিকা লসিকার বিকল্পের জন্য মানুষ আরও নিরাপদ প্রতিষেধকের অনুসন্ধান শুরু করল। ইংলণ্ডের গ্লষ্টারশায়ারবাসী ডঃ এডওয়ার্ড জেনার (১৭৪৯-১৮২৩) বাল্যকালে শুনেছিলেন যে, গো-দেহের মারী গুটিকাক্রান্তা গোয়ালীনিদের বসন্ত রোগ হয় না। তাঁর পরম সুহৃদ ডঃ জন হাণ্টার উক্ত বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য জেনারকে গবেষণা করতে অনুরোধ করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে জেনার গো দেহের মারী গুটিকার লসিকার দ্বারা একটি বালকের বাহুতে টিকা দেন। প্রায় দু মাস পরে, মানুষের বসন্ত গুটিকার লসিকা দিয়ে বালকটিকে আবার টিকা দেওয়া হয়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে বালকটির আর বসন্ত হয় না। টিকার এই অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পর জেনার টিকা ব্যবস্থার বহুল প্রচারে সচেষ্ট হলেন। জেনারের সুনামে ঈর্ষান্বিত বেঞ্জামিন জেষ্টি নামক একজন কৃষক লোকসমক্ষে প্রচার করতে লাগলেন যে জেনার কর্তৃক টিকা দেওয়ার প্রথা আবিষ্কারের বহু পূর্বে তিনি গো-বসন্ত লসিকা দ্বারা তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণকে টিকা দিয়েছেন। জনমত সংগ্রহ করে তিনি তাঁর দাবী পার্লামেণ্টে উত্থাপন করেন। অবশেষে তাঁকে অর্থ ও সম্মান প্রদর্শন করে শান্ত করা হয়। জেনারও পুরস্কারস্বরূপ রাজকোষ থেকে দশ সহস্র পাউণ্ড লাভ করেন এবং রুশিয়ার জার তাঁকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন।

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষার সময় আঙুলের সাহায্যে বুকে আঘাত করে বুকে শব্দ করেন ও সর্বশেষে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে বুক পরীক্ষা করেন।

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রের এই দুই অত্যাবশ্যক পরীক্ষাবিধিও অষ্টাদশ শতকের অবদান। লিওপোল্ড আউয়েনব্রুগের নামক এক চিকিৎসক ভিয়েনার স্পেনীয় সামরিক হাসপাতালে চাকুরী করতেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, মদ্য

চিত্র—৬১

ব্যবসায়ীরা মদের পিপার বাহিরে আঘাত করে পিপার অভ্যন্তরে মদ্যের পরিমাণ বুঝতে পারে। তাঁর মনে হয় যে, অসুস্থ মানুষের বক্ষপিঞ্জর বা উদরের উপর আঘাত করলেও হয় তো আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝা যাবে। তাঁর অনুমান প্রকৃতই সত্য হয়। তাঁর উক্ত "সংঘট্ট বিধি" (পার্কাসান্) আজও রোগ নির্ণয় শাস্ত্রের এক অবশ্য করণীয় ব্যবস্থা। ষ্টেথোস্কোপ আবিস্কার করেন এক ফরাসী চিকিৎসক ; তাঁর নাম রেণে থিয়োফিল্ হিয়াসিন্তে লেনেক্। উক্ত দীর্ঘ নাম ধারী ছিলেন এক অতি শীর্ণ ব্যক্তি। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিটানীতে জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন প্যারীর এ্যকোল দ্য মেদেসিন্-এ ডঃ কর্ভিসার্ত ও ডঃ বেইলে-এর অধীনে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জুর্ণাল দ্য মেদেসিন-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন ও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্যারীর লোপিতাল্ নেকার-এর পরিদর্শক চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। একদিন তিনি দেখতে পান যে, ক্রীড়ারত দুটি শিশু একটি কাষ্ঠ খণ্ডের দুটি প্রান্তে কান লাগিয়ে শব্দ করে একে অন্যের শব্দ শুনছে। লেনেক্-এর মনে হল হয়তো অনুরূপ উপায়ে রোগীর হৃৎস্পন্দন বা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও

চিত্র—৬২

শোনা যাবে। এক অতি স্থূলকায়া রোগিণীকে পরীক্ষার সময় একটি কাগজের নলের সাহায্যে আশাতীত ভাল ভাবে রোগিণীর হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ তিনি শুনতে পান। উক্ত কাগজের নল থেকেই উদ্ভূত হল বর্তমান চিকিৎসকের নিত্যসঙ্গী "ষ্টেথোস্কোপ্"। অষ্টাদশ শতকের চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাসে এক অদ্ভুত চরিত্র ডঃ ফ্রানৎস্ আন্তোন মেসমের। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনা থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কল্পনা করতেন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকাসমূহ মানুষের মনকে প্রভাবিত করে। প্রফেসর হেহ্‌ল্ নামক এক যেসুইট্ পুরোহিত মেসমেরকে কয়েক খণ্ড চুম্বক দেন। মেসমের দাবী করেন যে তিনি এক হৃদ্‌রোগীর দেহে চুম্বক

চিত্র—৬৩

স্পর্শ করে আশাতীত ফল লাভ করেছেন।

ক্রমে ক্রমে তাঁর ধারণা হল যে, মানুষের শরীরের মধ্যেই চুম্বকশক্তি উৎপন্ন হয়। ব্যারণ হারেৎস্কি নামক এক ধনীর গৃহে সমবেত রোগীদের মধ্যে এক স্নায়ুবিক দৌর্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তিকেও মেসমের নিরাময় করেন। মেসমেরকে ঐরূপ পাগলামি থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেন ভিয়েনার চিকিৎসক সংস্থার সভাপতি ব্যারণ ফন্ ষ্টোর্ক। অষ্ট্রীয় সম্রাজ্ঞী মারিয়া থেরেসিয়ার পরিচারিকা মাদ্মোয়াজেল্ পারাদীস্ নামক মহিলার চিকিৎসা ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে ভিয়েনা চিকিৎসক সংস্থার প্রত্যক্ষ সংঘাত শুরু হয়। মহিলাটি ছিলেন অন্ধ। অপরাপর চিকিৎসকগণ সাব্যস্ত করেন যে, পারাদীসের চক্ষুর স্নায়ু দুটি পক্ষাঘাতদুষ্ট হওয়ায় চিরতরে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎসায় মহিলার দৃষ্টিশক্তি আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়। মেসমের-এর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত চিকিৎসকগণ তাঁকে ভিয়েনা থেকে বহিষ্কৃত করলেন। ভাগ্যান্বেষী মেসমের প্যারীর অভিজাত পল্লী প্লাস ভেঁদোম-এ চিকিৎসা ব্যাসায় আরম্ভ করলেন। তাঁর চুম্বকীচিকিৎসায় বহু অভিজাত রমণীগণের কপট মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া) রোগ আরোগ্য হতে লাগল। মেসমেরকে তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসা ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেন প্যারীর চিকিৎসা বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি মঁসিয়ে লেরয়। বিপদগ্রস্ত মেসমের সম্রাজ্ঞী মারী আঁতোয়ানেতের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট ষোড়শ লুইএর অনুগ্রহে আরও কিছুকাল মেসমের-এর চুম্বক চিকিৎসা চলতে লাগল। অবস্থা আরও প্রতিকূল হওয়ায় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্যারী পরিত্যাগ করেন। আজও যাদুকরগণ যে হাত পা নেড়ে "মেসমেরিস্ম্"-এর খেলা দেখান, তা মেসমের এর নামের সাক্ষ্য বহন করে। মেসমের এর শিষ্য কাউন্ট দ্য পীসেগুর মেসমের এর ন্যায় চিকিৎসা করতেন। জেমস্ এস্ক্ডেইল নামক ইংরাজ চিকিৎসক ভারতে মেসমের-এর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন।

চিত্র—৬৩

এই শতকে ফরাসী দেশের অপর একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক ফিলিপ্পে পিনেল্। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পূর্বে তিনি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। ত্রিশ

চিত্র—৬৪, ৬৫

বৎসর বয়সে ধর্মচর্চা ত্যাগ করে মঁপেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপনান্তে তিনি প্যারীর বিউতর্ বন্দীশালার চিকিৎসক নিযুক্ত হন। বিউতর্ বন্দীশালায় সাধারণ অপরাধীগণের সঙ্গে

উন্মাদগণকেও বন্দী করে রাখা হত। দুই বৎসর পর তিনি সাল্পেত্রিয়ে বন্দীশালার কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর এক প্রিয় বন্ধু উন্মাদ অবস্থায় উক্ত বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে নৃশংসভাবে নেকড়ে বাঘ কর্তৃক নিহত হন। ঐ ঘটনায় মর্মাহত পিনেল উন্মাদের চিকিৎসায় জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্প নেন। ফরাসীদের বন্দীশালায় আবদ্ধ উন্মাদগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। পিনেল ঐরূপ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নিকট মর্মস্পর্শী ভাষায় বারম্বার করুণাভিক্ষা করেন। ফরাসী বিপ্লবের পর তিনি বিপ্লবী নেতা কুথঁর নিকট উন্মাদগণের নাগরিক অধিকার প্রত্যার্পণের দাবী করেন। কুথঁ প্রথমে তাঁর কথায় কর্ণপাত না করলেও স্বচক্ষে বন্দীদিগের করুণ অবস্থা পরিদর্শনের জন্য পিনেল-এর সঙ্গে সালপেত্রিয়ে বন্দীশালা পরিদর্শনে যান। সালপেত্রিয়ে বন্দীশালার নারকীয় অবস্থা দেখে নির্মম বিপ্লবী কুথঁ-এর কঠিন হৃদয় অভিভূত হয় এবং তিনি পিনেল-এর প্রধান সমর্থক হন। পিনেল উন্মাদের শৃঙ্খলমুক্ত করলেন। তাঁর সমবেদনশীল ব্যবহারে বহু উন্মাদ আবার সুস্থ মানুষে পরিণত হল। পিনেল বহুকাল ইহজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু তাঁর করুণাময় হৃদয়ের কথা আজও কেউ ভোলেনি।

চিত্র—৬৬

উনবিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

উনবিংশ শতকের জনসাধারণ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের প্রতি অধিকতর সচেতন হন। বৈজ্ঞানিকগণের সান্নিধ্যে এসে বিজ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হন তাঁরা। দেশে দেশে শুরু হয় শিল্পের জয়যাত্রা। বহু অভিনব আবিস্কারে চিকিৎসাশাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়। এই শতাব্দীর চিকিৎসকগণের মধ্যেই সর্বপ্রথম বিশেষজ্ঞগণের আবির্ভাব ঘটে। উনবিংশ শতকের চিকিৎসকগণ অনু-ধাবন করেন যে কেবলমাত্র ঔষধ দিয়ে রোগের চিকিৎসা হয় না, প্রয়োজন উপ-যুক্ত সেবা ও যত্নেরও। মধ্যযুগে কোনও কোনও খৃষ্টীয় ধর্মসংস্থার সন্ন্যাসিনীগণ রোগ সেবায় আত্মনিয়োগ করলেও উপযুক্ত জ্ঞান ও শৃঙ্খলার অভাবে সেই প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হত না। সেবিকারা সমাজে উচ্চস্থানের অধিকারিণী ছিলেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কাইজেরস্‌ভের্থ শহরে থেয়োডোর ফ্লিদনের নামক এক লুথারপন্থী যাজক ও তাঁর স্ত্রী ফ্রিদেরিকে তাঁদের গৃহে একটি রোগ সেবিকা শিক্ষালয় স্থাপনা করেন। শিক্ষালয়টিতে সন্ন্যাসিনীগণ শিক্ষা নিতেন। বিশ্ববিশ্রুত ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ও উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় রোগ জর্জরিত, আহত ও অর্ধভুক্ত ইংরাজ সৈন্যদের সেবা ও যত্ন করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন। ক্রিমিয়া যুদ্ধ সমাপ্তির পর তিনি লণ্ডনের সেন্ট টমাস্ হাসপাতালে একটি সেবিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

সংক্রামক রোগ সমস্যা

চিকিৎসা ঐতিহাসিকদের মতে জীবাণুজাত সংক্রামক রোগের বিষয় সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন ইতালীর টারেন্‌টিউস্ রুস্‌টিকুস্; মধ্যযুগে ফ্রাকাসটেরিউস নামক এক ব্যক্তি তাঁর "দে কণ্টাজিওনে" বা সংক্রমণ নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, মানবচক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু সংক্রামক রোগ সৃষ্টি করে। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর কিরসের নামক এক ব্যক্তি একটি আদিম অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক প্লেগ রোগীর রক্ত ও পুঁজের মধ্যে প্লেগ জীবাণু দেখতে পান বলে দাবী করেন। আধুনিক জীবাণু বিজ্ঞানের জনক ফরাসী বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুরের জন্ম এই যুগে (১৮২২-১৮৯৫)। প্রথম জীবনে তিনি একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও কেলাসন (ক্রিস্টালাইজেসন্) বিষয়ে গবেষণা করতেন। তাঁর এক প্রবন্ধ পাঠ করে ফরাসী বৈজ্ঞানিক সংস্থা তাঁকে লিলে, ষ্ট্রাসবুর্গ, ও সর্বশেষে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। লিলে শহরে অবস্থানকালে মদ্য ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য তিনি গাঁজন (ফারমেনটেশান্) প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা করতেন। পাস্তুর প্রমাণ করেছিলেন যে, কয়েক প্রকার অদৃশ্য জীবাণু দ্বারা দ্রাক্ষারসে গাঁজন হয়ে দ্রাক্ষাসব (এ্যালকোহল) উৎপন্ন হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর দুই সহকর্মী বিস্ফোটক রোগগ্রস্ত একটি গরুর রক্তের মধ্যে এক প্রকার বৃহদাকৃতি জীবাণু দেখতে পান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত জীবাণুকে "এ্যানথ্রাক্স" জীবাণু নামে অভিহিত করেন জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ রোবের্ট কোখ্। সংক্রামক রোগ জীবাণু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পাস্তুর জীবাণু সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্যও চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। এডওয়ার্ড জেনারের আবিষ্কৃত টিকা পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করে পাস্তুরের ধারণা হয় যে, সংক্রামক রোগ জীবাণু স্বল্প পরিমাণে মানব শরীরে প্রবিষ্ট করালেও হয়ত অনুরূপ প্রতিষেধক ক্ষমতা জন্মাবে। তিনি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কর্ষিত মুর্গীর উদরাময় জীবাণু জলে নিলম্বিত

চিত্র ৫৬—মুঘল যুগে এক রাজপুত রমণীর উদর ভেদন দ্বারা সন্তান প্রসব
(স্পেনীয় ডঃ ফের্নান্দো বুয়েনো মাতিনেজ-এর সৌজন্যে)

চিত্র ৫৭—
আঁদ্রিয়া
ভেসালিউস্
(ভেসাল্)

চিত্র ৫৮—
পারাসেল্‌সুস্‌

চিত্র ৫৯—
আঁব্রোয়া পারে

চিত্র ৬০—উইলিয়ম্ হার্ভে।

চিত্র ৬১—লেওপোল্ড আউয়েন্‌ব্রুগ্‌গের।

চিত্র ৬২—লেনেক্

চিত্র ৬৩—ফ্রানৎস্ আন্তোন মেস্‌মের

চিত্র ৬৪—য়ুরোপীয় ক্ষৌরকার শল্যচিকিৎসক কর্তৃক মস্তকে কপট-অস্ত্রপচার।

(সাস্‌পেন্‌সন্) করে মুর্গী শাবকের দেহে সূচীবিদ্ধ করেন। ফলে ভবিষ্যতে মুর্গীশাবকগুলি উদরাময় রোগ থেকে রক্ষা পায় এবং এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কৃত্রিম উপায়ে কর্ষিত (কালটিভেটেড্) হীনবলীকৃত (এ্যাটেনিউএটেড্) জীবাণুদ্বারা সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ক্ষমতা উৎপন্ন করা সম্ভব। কালক্রমে পাস্তুর ও তাঁর সহযোগী সামবেরলাঁ, রু ও থুলিয়ের এ্যানথ্রাকস, শূকরের বিস্ফোটক ও জলাতঙ্ক রোগের (রেবিস) প্রতিষেধক টিকা প্রস্তুতে সক্ষম হন। অনেকে হয় তো লক্ষ্য করেছেন যে, কুকুর বা শিয়ালে দংশন করলে কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালের "পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট"-এ গিয়ে প্রতিষেধক টিকা নিতে হয়। পৃথিবীতে অনুরূপ বহু পাস্তুর ইন্‌ষ্টিটিউট্ আজও পাস্তুরের স্মৃতি বহন করছে। পাস্তুরের শিষ্যদের মধ্যে রুশীয় এলি মেশ্‌নিকফ্ (নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত, ১৯০৮) ও ফরাসী এমিলে রু-এর নাম পৃথিবী বিখ্যাত।

চিত্র—৬৮

ফরাসী ও জার্মান পরস্পরের জাত শত্রু। পাস্তুরের পরবর্তীকালে তাঁর অনুগামীগণ যখন রোগ প্রতিষেধক আবিষ্কারের গবেষণায় রত, তখন প্রুসিয়ার এক গ্রাম্য চিকিৎসক জীবাণুর সন্ধানে অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন, তাঁর নাম রোবের্ট কোখ্। কোখের জন্ম ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার পর তিনি কিছুকাল জার্মানীর সামরিক বিভাগে চাকুরী করেন। তারপর এক গ্রাম্য চিকিৎসকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। সে সময়ে জার্মানীতে যক্ষারোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। কোখ্ যক্ষাজীবাণু অনুসন্ধানের জন্য যক্ষায় মৃত রোগীর দেহের বিভিন্ন তন্তু তন্তুরঞ্জক পদার্থ দ্বারা রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এক মৃত যক্ষারোগীর শ্বাসযন্ত্রের তন্তুর মধ্যে তিনি একপ্রকার জীবাণুর দর্শন পেলেন এবং পরবর্তী তিন বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত গবেষণার পর নির্ভুলভাবে প্রমাণ করলেন যে, উক্ত জীবাণুই যক্ষার কারণ এবং তা প্রধানতঃ রোগীর শ্লেষ্মার ও থুথুর মাধ্যমে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়ে যক্ষারোগ সৃষ্টি করে। তিনি জীবন্ত যক্ষাজীবাণু শর্করা থেকে প্রস্তুত এক প্রকার ক্বাথের মধ্যে কর্ষিত করে 'গিনিপিগের' দেহে সূচিকাবিদ্ধ করেন ও অবিকল মানব দেহের যক্ষার ন্যায় ক্ষত সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যক্ষার জীবাণু থেকে এক প্রকার নির্যাস প্রস্তুত করেন এবং তার সাহায্যে যক্ষারোগের চিকিৎসা করতে গিয়ে

ব্যর্থ হন। উক্ত নির্যাস সাহায্যে যক্ষ্মারোগ নিরূপণের পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন ভিয়েনাবাসী বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ ক্লেমেন্স ফ্রাইহের্ ফন্ পির্কে। ডঃ পির্কে পরবর্তীকালে অধুনা সর্বজনজ্ঞাত "এলার্জি" মতবাদের প্রবর্তন করেন। কলেরা রোগ জীবাণু ভয়াবহ "ভিব্রিও কোমা"-ও কোখ্-এর অনুসন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। উক্ত জীবাণুর সন্ধানে তিনি মিশর ও ভারত পরিভ্রমণ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও তিনি কিছুকাল গবেষণা করেন। সেই পরিদর্শনের স্মরণে স্থাপিত তাঁর আবক্ষ মর্মর মূর্তি আজও কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে বিদ্যমান। তিনি ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

চিত্র – ৬৯, ৭০

উনবিংশ শতকের নিদানতত্ত্ব

উনবিংশ শতকে নিদানতাত্ত্বিক চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জার্মানীর ভ্যুয়ের্তসবুর্গের নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক রুডলফ্ ফিয়েরকোভ্ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রচার করলেন যে, মানবদেহের প্রতিটি কোষ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিদানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে হলে উক্ত কোষসমূহ অণুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করা কর্তব্য। তিনি প্রমাণ করেন যে, মানবদেহে জীবাণু সংক্রমণ হলে শ্বেত রক্তকণিকা জীবাণু ধ্বংসের জন্য যোদ্ধার ন্যায় রোগকেন্দ্রে সমবেত হয়ে জীবাণু ভক্ষণ করে ফেলে। পূর্বোক্ত রুশীয় নিদানতাত্ত্বিক এলি মেশ্‌নিকফ্ উক্ত বিষয়ে আরও নতুন গবেষণা করে স্থির করেন যে শ্বেতকণিকাসমূহের কিয়দংশ জীবাণুর দেহ নিঃসৃত বিষ শোধন করে এবং অপরাংশ জীবাণু ভক্ষণ করে।

উপদংশ রোগের সূত্র-সন্ধান

প্রবাদ আছে যে, কলম্বাসের সঙ্গী আমেরিকা প্রত্যাগত নাবিকগণ ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশে উপদংশরোগ (সিফিলিস) ছড়ায়। নাবিকগণের মধ্যে উক্ত রোগ দেখতে পান রুই ডিয়াজ দে ইস্‌লা নামক চিকিৎসক। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে লাস কাসাস্ নামক ব্যক্তি উপদংশের কারণ অনুসন্ধানে হাইতি দ্বীপে গিয়েছিলেন। ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লসের রাজত্বকালে তাঁর সৈন্যবাহিনীর কতিপয় পেশাদারী স্পেনীয় সৈন্য উক্ত রোগ প্রথমে ফরাসীদেশ ও পরে ইতালীতে বিস্তৃত করে। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাকাসটোরিয়ুস নামক এক ভেরোনাবাসী পদ্যের ছন্দে 'সিফিলিস' নামক এক যুবক পশুচারকের

উপদংশ রোগ যন্ত্রণা বর্ণনা করেছিলেন। সেই সময় থেকেই উপদংশের নাম হল সিফিলিস্। সিফিলিস রোগ ইংলণ্ডে নিয়ে যায় সম্রাট চার্লসের অধীনস্থ ইংরাজ সৈন্যগণ। রাজা চতুর্থ জেম্‌স্ সিফিলিস্ রোগীদের এডিনবরা শহরের সন্নিকটস্থ লেইথ দ্বীপে নির্বাসিত করেছিলেন। আদেশ অমান্যকারী রোগীগণের গাত্রে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা হত। ইংল্যাণ্ডের ব্যভিচারী রাজা সপ্তম হেনরী নিজেই উপদংশ রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। প্যারীর সিফিলিস্ রোগীগণকে সাঁ জের্‌মেঁ পল্লীতে বাস করতে বাধ্য করা হত। স্কটল্যাণ্ডবাসীগণ সর্বপ্রথম বুঝতে পারেন যে, রোগটি যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রামিত হয় এবং সেইজন্য এবারডিন শহরের বারবণিতাগণের গণ্ডে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করে শহর থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে জ্যঁ আসক্রক্ নামক চিকিৎসক সর্বপ্রথম সন্দেহ করেন যে, উপদংশ এক জীবাণু সংক্রামিত ব্যাধি। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ ফ্রিৎস্ সাউডিন্ সিফিলিসের জীবাণু "স্পিরোকিটা প্যালিডা" আবিষ্কার করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কোখ্-এর শিষ্য ডঃ আউগুস্ত ফন্ হ্বাসারমান্ সিফিলিস নির্ণয়ের এক অভিনব বিধি রক্ত পরীক্ষার আবিষ্কার করেন। পরীক্ষাটি "হ্বাসারমান্ রিঅ্যাক্‌সন্" বা "ডব্লিউ আর" নামে এখন সর্বজন পরিচিত। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিখ সিফিলিসের সর্বপ্রথম ঔষধ "স্যালভারসান" আবিষ্কার করেন। এরলিখ্ ১৯০৮ খৃঃঅব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি বর্তমানে সুপরিচিত "কিমোথেরাপী" বা কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা জীবাণু নিরোধন পদ্ধতির জনক বলে আজও সম্মানিত হন। বিংশ শতাব্দীতে ফ্লেমিং কর্তৃক আবিষ্কৃত মহৌষধ "পেনিসিলিন"-এর সাহায্যে সিফিলিসকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় নির্মূল করা হয়েছে। ১৫ শতকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সিফিলিস রোগ নিয়ে আসে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার সঙ্গী নাবিকগণ।

চিত্র—৭১

ডিফ্‌থেরিয়া রোগ

অষ্টাদশ শতকের য়ুরোপে ডিফ্‌থেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী ছিল এবং বহু শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ফিয়েরকোভ্-এর সুযোগ্য শিষ্য ডঃ এডভিন্ ক্লেবস্ একটি ডিফ্‌থেরিয়া রোগীর লালার মধ্যে ডিফথেরিয়া রোগ জীবাণু দেখতে পান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কোখ্-এর অপর

এক ছাত্র ফ্রিদেরিখ্ ল্যোফলের্ পুষ্টিকর ক্বাথের মধ্যে উক্ত জীবাণু কর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ডিফ্‌থেরিয়ার প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ধনুষ্টঙ্কার রোগের টিকা আবিষ্কারক জার্মান বিজ্ঞানী এমিল ফন্ বেহ্‌রিং ও তাঁর জাপানী সহযোগী সিবাশাবুরো কিটাসাটো। কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কেবলমাত্র বেহরিংকে চিকিৎসা বিষয়ে প্রথম নোবেল পুরস্কারটি দেওয়া হয়!

শরীরের নালীবিহীন গ্রন্থির কার্যপ্রণালী

সপ্তদশ শতকে এক ইতালীয় শারীরস্থানবিদ্ সর্বপ্রথম মানবদেহের নালীবিহীন গ্রন্থিসমূহের (ডাকট্‌লেস্ গ্ল্যাণ্ডস) অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ হলেও চিকিৎসকগণ উক্ত গ্রন্থি সমূহের কার্যক্ষমতা হীনতাজনিত ব্যাধি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছিলেন সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী পরে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের গাইস্ হাসপাতালের চিকিৎসক টমাস এ্যাডিসন একটি রোগীর বৃক্কশীর্ষ গ্রন্থির (সুপ্রারেনাল গ্ল্যাণ্ডস্) ক্ষরণ ক্ষমতা হীনতাজনিত রোগ "এ্যাডিসনস্ ডিজিস্" নির্ণয় করেছিলেন। বিখ্যাত সুইজারল্যাণ্ডবাসী শল্যচিকিৎসক থেয়োডোর কোখের পরবর্তীকালে "ঢালগ্রন্থি" বা গলগ্রন্থির (থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড) কার্যকারিতা সম্বন্ধে গবেষণা করে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন ও তাঁর গবেষণা উৎকর্ষের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর অনুগামী মরিৎস্ সীফ্ প্রমাণ করেন যে, গলগণ্ড রোগগ্রস্তের ব্যাধিদুষ্ট গলগ্রন্থি সম্পূর্ণ অপসারিত করলে রোগীর মৃত্যু হয়। ল্যাংডন ব্রাউন নামক ইংরাজ চিকিৎসক সর্বপ্রথম পিটুইটারী গ্রন্থিকে "সর্দার গ্রন্থি" (মাষ্টার গ্ল্যাণ্ড) নামকরণ করেন। পরবর্তীকালে "সর্দার গ্রন্থি"-র (পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড) কার্যপ্রণালী সঠিকভাবে আবিষ্কার করেছিলেন হার্ভে কুশিং নামক বিখ্যাত মার্কিন স্নায়ু শল্যচিকিৎসক।

বিংশ শতাব্দীতে (১৯২১) কানাডীয় শারীরবৃত্তিক (ফিজিওলজিষ্ট) ফ্রেডেরিক ব্যানটিং জার্মান নিদানতাত্ত্বিক লান্‌গেরহান্স-এর গবেষণা পুনরায়-অনুসরণ করে অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) এর মধ্যস্থিত "কোষদ্বীপপুঞ্জ" (ইন্‌সুলা) হতে মানবশরীরের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় রস "ইন্‌সুলিন" আবিষ্কার করেন। উক্ত রসের অভাব ঘটলে ভয়াবহ মধুমেহ বা ডায়াবেটিস্ রোগ হয়। উক্ত আবিষ্কারের জন্য তিনি ও তাঁর গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ম্যাকলিয়ড ১৯২৩ খৃঃ অব্দে নোবেল পুরস্কার পান। ম্যাকলিয়ডকে বিনা কারণে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় ব্যানটিং অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং পুরস্কারের নিজ অংশের অর্ধেক তাঁর

চিত্র ৬৫—প্রাচীন য়ুরোপে বস্তির প্রস্তরাপসারণ।

চিত্র ৬৬—রেম্‌ব্রাণ্ট্‌ অঙ্কিত শব ব্যবচ্ছেদের এক তৈলচিত্র।

চিত্র ৬৭—অবসাদক আবিষ্কারের পুর্বকালের নৃশংস অঙ্গচ্ছেদের এক চিত্র।

চিত্র ৬৮—ল্যুই পাস্তুর

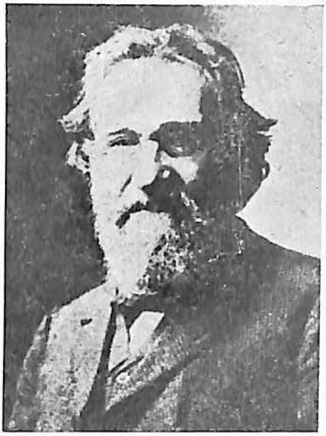

চিত্র ৬৯—এলি মেশ্‌নিকফ্‌।

চিত্র ৭০—রোবের্ট কোখ্‌।

চিত্র ৭১—এমিল্‌ ফন বেহ্‌রিং।

চিত্র ৭২—ফ্রেডেরিক্ ব্যান্‌টিং।

চিত্র ৭৩—স্যর রোণাল্ড রস্।

চিত্র ৭৪—লর্ড যোসেফ লিষ্টার।

গবেষণার সহকারী ছাত্র চার্লস বেষ্ট নামক এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। লজ্জিত ও বিব্রত ম্যাকলিয়ড নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্য তাঁর পুরস্কারের অর্ধেক ব্যানটিং-এর অপর এক সহকারী কলিপ্‌কে প্রদান করেন। নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে অনুরূপ হাস্যকর ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

চিত্র—৭২

অধুনা সর্বজনজ্ঞাত "কর্টিজোন্" নামক ঔষধ নালীবিহীন বৃক্কশীর্ষ গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। কর্টিজোন-এর অভাবজনিত বহু কষ্টকর রোগের গবেষণা করে অষ্ট্রীয়-কানাডীয় বিজ্ঞানী ডঃ হান্স সেইলী আজ পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন।

চেতনা-নাশকের সন্ধানে

চিকিৎসাশাস্ত্রের আদিকাল থেকে রোগী চিকিৎসককে আহ্বান করে আবেদন জানাত তার শরীরের বেদনা নিরসন করতে। প্রাচীন চিকিৎসক সেইজন্য বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত বেদনানাশক লতাগুল্মের অনুসন্ধানে। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাচীনতম অধ্যায়ে ধুতুরাজাতীয় মান্দ্রাগোরা (ম্যানড্রেক) ও গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় লিখিত আছে। প্রাচীন মিশরীয়গণও সেকথা জানতেন। মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ডে ব্যাপকভাবে মান্দ্রাগোরা ব্যবহৃত হত। খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে গ্রীক চিকিৎসক আমোস গঞ্জিকার অবসাদক গুণের বিষয় অবহিত হন। হেরোডোটুস বলেছেন যে, হাসিস্ বা গঞ্জিকার ধূম নিঃশ্বাসের সঙ্গে আঘ্রাণ করলে চেতনা লুপ্ত হয়। প্রাচীন চৈনিকগণ অহিফেনের চেতনানাশক গুণ আবিষ্কার করেন। ডিওস্কোরিডেস্ নামক গ্রীক মান্দ্রাগোরা (ধুতুরা জাতীয়) মূল দ্রাক্ষারসে সিক্ত করে প্রস্তুত নির্যাস দ্বারা রোগীকে অজ্ঞান করাতেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে অস্ত্রোপচারের পূর্বে অনেক সময় রোগীর গল-ধমনী (ক্যারটিড্ আরটারিস্) সাময়িকভাবে রুদ্ধ করে রোগীকে অজ্ঞান করা হত। বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎসক জন হাণ্টার ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গচ্ছেদের পূর্বে অঙ্গটি বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে অবচেতন করতেন (হাইপোথার্মিয়া)। অবচেতক ভেষজাদি প্রস্তুতের পূর্বকালে শল্য-চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচারে ছিলেন অতিশয় ক্ষিপ্র ও পারদর্শী। বিখ্যাত ইংরাজ শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম চেসেল্‌ডেন মাত্র একমিনিট কালের মধ্যে মূত্রাশয় থেকে পাথ্‌রী অপসারণ করতে পারতেন।

প্রকৃত অবচেতনা শাস্ত্রের (এ্যানেস্‌থেসিওলজি) জন্ম ইংরাজ রাসায়নিক

স্যার হাম্‌ফ্রী ডেভী কর্তৃক "হাস্যোদ্দীপক বাষ্প" (নাইট্রাস অক্সাইড) আবিষ্কারের পর থেকে। উক্ত বাষ্প সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেছিলেন ডঃ রিগস্ নামক এক দন্ত চিকিৎসক তাঁর এক বন্ধু ডঃ ওয়েলস্ এর উপর। ডঃ জ্যাকসন ও মর্টন নামক দুই মার্কিনী চিকিৎসক "ইথার" নামক এক জৈব রাসায়নিক দ্বারা অবচেতন প্রথার প্রবর্তক। ডঃ লিষ্টন নামক ইংরাজ অস্থি শল্যচিকিৎসক ইংল্যাণ্ডে "ইথার" দ্বারা অবচেতন করে অস্ত্রোপচার করতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবার শহরের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ সিম্পসন ক্লোরোফর্ম নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থের অবচেতনাকারক গুণের বিষয় নিরূপণ করেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ও তাঁর দুই সহকর্মী ডঃ কীথ ও ডঃ ডানকান্ নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের আঘ্রাণ নিতে নিতে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম আঘ্রাণ করে অজ্ঞান হয়ে যান।

ঘটনাটির পর ক্লোরোফর্মের ব্যবহার ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়। বর্তমানে ক্লোরোফর্মের স্থান নিয়েছে সাইক্লোপ্রোপেন, টেট্রাক্লোর এথিলিন ও ফ্লুয়োথেন প্রভৃতি বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক পদার্থ।

রোগীকে অজ্ঞান করে যেভাবে তার দেহে অস্ত্রোপচার করা যায় ঠিক সেই-ভাবেই রোগীর দেহের রোগদুষ্ট স্থানবিশেষ "স্থানীয় স্পর্শলোপকারী" (লোকাল এ্যানেস্থেটিক্) প্রয়োগ করে বেদনাশূন্যভাবেও অস্ত্রোপচার করা যায়। পেরুদেশীয় সুসভ্য ইন্‌কারা "কোকা" নামক বন্য বৃক্ষের পত্র চর্বণ করে শরীরের বেদনাগ্রস্ত স্থানে প্রলেপ দিত। বৈজ্ঞানিকগণ কোকা পত্রের রসে "কোকেন" নামক স্পর্শলোপকারী ভেষজের সন্ধান পান। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার চক্ষু চিকিৎসক ডঃ কার্ল কোলের সর্বপ্রথম উক্ত কোকেন প্রয়োগ করে একটি রোগীর চক্ষুর উপর অস্ত্রোপচার করেন। তাঁর বন্ধু বিশ্ববিশ্রুত মনোবিজ্ঞানী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড তাঁকে উক্ত ঔষধ প্রয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বর্তমানে কোকেনের বিকল্পে এ্যামিথোফেন, প্রোকেন, লিগনোকেন ও ন্যুপারকেন ইত্যাদি ঔষধের সাহায্যে স্পর্শলোপ করা হয়। অবচেতনা ও স্পর্শলোপের ক্রমোন্নতি শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রকে বিস্ময়কর পর্যায়ে উন্নত ও নিরাপদ করেছে। বর্তমানে "স্নায়ু অবসাদন" বা "নিউরোলেপসিস্" নামক এক নতুন পদ্ধতিতে রোগীর জ্ঞান বজায় রেখেও তার শরীরে অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে।

উনবিংশ শতকের মনোবিজ্ঞান

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র মোরাভিয় ইহুদীর ঘরে সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের জন্ম

হয়েছিল। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করে তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীর বিখ্যাত স্নায়ুতত্ত্ববিদ্ জ্যঁ মার্তিন সার্কো-এর অধীনে স্নাতোকত্তর চিকিৎসাবিদ্যা গ্রহণ করতে যান। সারকোর স্নায়ুতত্ত্বশাস্ত্রীয় জ্ঞানে বিমুগ্ধ ফ্রয়েড আজীবন স্নায়ুতত্ত্বশাস্ত্রাভ্যাস করতে মনস্থ করেন। ব্রেউয়ের নামক সারকোর এক ছাত্র মানসিক রোগ চিকিৎসায় সম্মোহন প্রয়োগের সম্ভাবনার বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। একটি পক্ষাঘাতগ্রস্তা রোগিণীকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করে ব্রেউয়ের তার সঙ্গে কথপোকথন শুরু করেন এবং ক্রমে ক্রমে রোগিণীর অব্যক্ত মনের বহু বাসনা প্রকাশ পায়। পূর্ণ চেতনা লাভের পর দেখা যায় যে, রোগিণী অত্যাশ্চর্যভাবে পক্ষাঘাত মুক্ত। উক্ত সাফল্যের পর ব্রেউয়ের ও ফ্রয়েড একযোগে বহু গবেষণা করে নির্ণয় করেন যে, মানুষের মনের অভ্যন্তরে বহু অব্যক্ত বাসনা ও চিন্তা লুক্কায়িত থাকে, ঐ সকল বাসনা বৈকল্যের জন্য মানুষ মানসিক রোগগ্রস্ত হয়। ফ্রয়েড বলতেন যে, সমীক্ষার দ্বারা অব্যক্ত বাসনা প্রকাশ করতে পারলে, মানসিক বৈকল্য দূর হয়। ভিয়েনা মানসিক হাসপাতালে তিনি তাঁর শিষ্যদ্বয় আদ্লের ও ইয়ুঙ্গ-এর সহযোগিতায় আরও গবেষণা চালান। হিটলার কর্তৃক ইহুদি বিতাড়নের আগে তিনি লণ্ডনে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং পরিণত বয়সে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ সমস্যার সমাধান

খৃষ্টজন্মের আনুমানিক ছয় শতাব্দী আগে সুশ্রুত বলেছিলেন যে, মশক দংশন করলে জর হয়। খৃষ্টীয় প্রথম দশকে কলুমেল্লা নামক ব্যক্তিও অনুরূপ সন্দেহ করতেন। প্রাচীন রোমে জর রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। রোমকগণ মনে করত যে, অপরিচ্ছন্ন জলাভূমি থেকে উত্থিত দূষিত বায়ু থেকেই উক্ত রোগের জন্ম। সেইজন্য তারা উক্ত জরের নামকরণ করেছিল "মালারিয়া" বা দূষিত বায়ু। কালের পরিবর্তনে "মালারিয়া" ম্যালেরিয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে। গ্রীক চিকিৎসক হিপ্পোক্রাতেসও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। ১৫ শতকের দক্ষিণ আমেরিকার য়ুরোপীয় অভিযাত্রীগণ লক্ষ্য করেন যে, ম্যালেরিয়ার ন্যায় জর নিরাময়ের জন্য পেরুদেশীয় আদিবাসীরা এক প্রকার বৃক্ষের বল্কল চূর্ণ করে ভক্ষণ করতেন। আনুমানিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে পেরুর স্পেনীয় শাসনকর্তা কাউন্ট্ সিন্কোনার পত্নীর সম্মানার্থে উক্ত বৃক্ষের নাম-

করণ করা হয় "সিন্‌কোনা"। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জঙ্গী চিকিৎসক আলফোঁস্ ল্যাভের়্‌ আলজিরিয়ায় অবস্থানকালে এক ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে সর্বপ্রথম একপ্রকার কীট দেখতে পান। তিনি পরবর্তীকালে উক্ত আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন। ১৮৯৫ থেকে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মধ্যবর্তীকালে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক জিওভান্নি বাতিস্তা গ্রাসস্‌সি ও ইংরাজ চিকিৎসক রোনাল্ড রস্ ম্যালেরিয়ার কীটবাহক এনোফিলিস্ মশক আবিষ্কার করেন। ডঃ রস্ কলিকাতার তদানীন্তন প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের (বর্তমান শেঠ্‌ সুখলাল কারনানি স্মৃতি হাসপাতাল) একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উক্ত যুগান্তকারী গবেষণা করেন। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত কক্ষটি আজও অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান। রোণাল্ড রস্ উত্তর প্রদেশের

চিত্র—৭৩

আলমোড়া শহরে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কারধারী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণগণ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করায় পৃথিবীতে সিন্‌কোনা বল্কলের অত্যন্ত অভাব ঘটে। তজ্জন্য বৈজ্ঞানিকগণ সিন্‌কোনা বল্কলজাত কুইনাইন অপেক্ষা শক্তিশালী বহু ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার করেন। ম্যূলের নামক সুইজারল্যাণ্ডবাসী বৈজ্ঞানিক "ডি-ডি-টি" নামক মশক ধ্বংসকারী ঔষধ প্রস্তুত করায় মশক ও ম্যালেরিয়া উভয়ই পৃথিবী হতে প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে। উক্ত আবিষ্কারের জন্য ম্যূলের নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। আফ্রিকা ও আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পীতজ্বর নামক একপ্রকার ভয়াবহ মশক বাহিত রোগ হয়। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ হিউজেস নামক চিকিৎসক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উক্ত রোগাক্রান্ত বহু রোগী দেখতে পান। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ঁ বোনাপার্ত কর্তৃক হাইতি অভিযানে প্রেরিত ৩০,০০০ সৈন্যের মধ্যে প্রায় ২৩,০০০ পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। আমেরিকার আলাবামাবাসী ডঃ যোসুয়া ক্লার্ক নট্ লক্ষ্য করেন যে, মশক প্রধান অঞ্চলে পীতজ্বর বেশী হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হাভানার কার্লোস ফিন্‌লে নামক এক চিকিৎসক প্রচার করেন যে, পীতজ্বর সংক্রমিত "এডিস্ এগিপ্টি" নামক মশকের দংশন থেকে হয়। জেসি লাজিয়ের নামক এক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় 'এডিস্ এগিপ্টি' মশক কর্তৃক দংশিত হন এবং পীতজ্বরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বিজ্ঞানীগণ

আরও লক্ষ্য করেন যে, কোনও স্থানে মানুষের মধ্যে পীতজ্বর মড়ক আরম্ভ হবার পূর্বে প্রথমে বানরেরা পীতজ্বরাক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করে। উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পীতজ্বর মূলতঃ বানরের রোগ এবং তার জীবাণু "এডিস্ এগিপ্তি" মশক কর্তৃক বানরের দেহ থেকে মানব শরীরে প্রবিষ্ট হয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জাপানী জীবাণুতত্ত্ববিদ্ হিদেও নোগুচি পীতজ্বরের জীবাণু নিয়ে গবেষণার সময় অসাবধানতাবশতঃ পীতজ্বরে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন এবং মাত্র স্বল্পকাল পরে তাঁর সহকর্মী ডঃ এড্রিয়ান ষ্টোক্স্ ও ডব্লিউ ইয়ঙ্গও পীতজ্বরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁরা আজও চিকিৎসা বিজ্ঞানের শহীদ বলে সম্মানিত হন। ডঃ মাকস্ থেইলের নামক বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, পীতজ্বর থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর রক্তমস্তু (সিরাম) মূষিকদের শরীরে সূচিকাবিদ্ধ করলে রোগনিরোধক ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। বহু বৎসর অক্লান্ত গবেষণার পর পীতজ্বর নিরোধক টীকা আবিষ্কৃত হওয়ায় ঐ রোগ প্রায় পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত। ডঃ থেইলের ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মশক বাহিত অপর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগ "গোদ" এর কারণ নির্ণয়ও হয় উনবিশ শতকে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্যার প্যাট্রিক ম্যান্সন নামক নিদানতাত্ত্বিক উক্ত রোগের সংক্রমণ পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, গোদ রোগের কৃমি মশক দংশন দ্বারা মানব শরীরে প্রবেশ করে। গোদ রোগীর রক্ত পরীক্ষার কালে তিনি দেখতে পান যে, গোদের সূত্রানুকৃমি (মাইক্রো ফাইলেরিয়া) সন্ধ্যার পর থেকে রোগীর রক্তের মধ্যে অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এক চৈনিক গোদ রোগী স্বেচ্ছায় ম্যানসনকে গবেষণায় সাহায্য করেন। ম্যানসন রোগীকে সন্ধ্যাবেলা একটি ঘরে আবদ্ধ করে সেই ঘরে কয়েকটি 'স্টিগোমাইয়া ফাটিগান্স' জাতীয় মশক ছেড়ে দেন। রোগীটিকে দংশন করবার পর মশকগুলির পাকস্থলীতে বহু সূত্রানুকৃমি পাওয়া যায়। সূত্রানুকৃমিনাশক বহু ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় ও "ডি-ডি-টি" দ্বারা স্টিগোমাইয়া মশক প্রায় বিলুপ্ত হওয়ায় গোদের প্রাদুর্ভাবও আজকাল হ্রাস পেয়েছে।

শল্যচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যায় জীবাণু বিজ্ঞানের প্রভাব

প্রাচীনকালে শল্যচিকিৎসার ক্ষত শুকাবার প্রধান অন্তরায় ছিল জীবাণু সংক্রমণ। বহু প্রকার জীবাণু ক্ষতের মধ্যে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি ও

প্রাণনাশ করত। জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য প্রাচীন শল্য-চিকিৎসকগণ অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অস্ত্রোপচার করতেন। এমন কি তাঁরা কার্যের পূর্বে হস্ত ও শল্য যন্ত্রাদি ধৌত করতেন না। ডঃ চার্লস বেল্ নামক এডিনবরাবাসী চিকিৎসক মনে করতেন যে নিশ্চয়ই বায়ু মধ্যস্থ কোনও অদৃশ্য বস্তু অস্ত্রোপচারের ক্ষত দূষিত করে। তিনি উক্ত অজ্ঞাত বস্তুর নাম করণ করেন "পূতিবাষ্প"। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যোসেফ্ লিষ্টার (১৮২৭-১৯১২) নামক এক চিকিৎসক গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ডঃ বেলের মতবাদের বিষয় সর্বদা চিন্তা করতেন।

চিত্র — ৭৪

গ্লাসগোর রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডঃ টমাস এণ্ডারসন-এর সঙ্গে লিষ্টারের পরিচয় হয়। লিষ্টারকে এণ্ডারসন লুই পাস্তুরের গবেষণার বিষয় অবহিত করেন। পাস্তুর বলতেন যে, উত্তাপ, পরিস্রাবণ ও উগ্র রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা জীবাণু ধ্বংস করা যায়। লিষ্টার সে সময়ে বহুল প্রচলিত জীবাণু নিরোধক কার্বলিক অম্লসিক্ত কাপড় দিয়ে অস্ত্রোপচারের ক্ষতস্থান বেঁধে রাখতেন, ফলে ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ অভাবনীয়রূপে হ্রাস পায়। শল্যগৃহের বায়ু জীবাণু-মুক্ত করবার জন্য বায়ুর মধ্যেও কার্বলিক-অম্ল ছিটান হত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লিষ্টার উদ্ভাবিত পদ্ধতি পূর্ণ সমর্থন করেন মিউনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শল্য-চিকিৎসার অধ্যাপক ডঃ ফন্ ন্যুস্‌বাউম্। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, সুশ্রুতের সময়ে শল্যচিকিৎসার পূর্বে শল্যকক্ষের অভ্যন্তর গন্ধক ও গুগ্‌গুল ধূম্র দ্বারা পরিশোধিত করা হত। শল্যচিকিৎসকরা স্নান করে রৌদ্র-স্নাত (ষ্টেরিলাইজড্) বস্ত্র পরিধান করতেন এবং হস্ত ধৌত করে অস্ত্রোপচার করতেন। তাঁদের যন্ত্রপাতি অগ্নিদগ্ধ করে পরিশোধন করা হত। সুতরাং লিষ্টারের যুগান্তকারী প্রচেষ্টার বহু পূর্বেই ভারতীয় শল্যচিকিৎসকেরা ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণ ও তার পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মেলনে লিষ্টার তাঁর প্রচেষ্টা ও ফলাফল ঘোষণা করেন। লিষ্টারের কৃতকার্যতায় মুগ্ধ হয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে প্রথমে নাইট, তারপর ব্যারণ ও সর্বশেষে লর্ড উপাধি প্রদান করেন। লিষ্টারই ইংল্যাণ্ডের সর্বপ্রথম "লর্ড" পদাভিষিক্ত চিকিৎসক। লিষ্টারের সমসাময়িক বের্লিনের বিখ্যাত শল্যচিকিৎসক ডঃ এরনস্ত ফন্ বের্গমান ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আবদ্ধ উচ্চচাপের বাষ্প সহযোগে জীবাণু নিধনের পন্থা উদ্ভাবন

করেছিলেন, যে পদ্ধতি "অটোক্লেভিং" নামে বর্তমানে বহুল প্রচলিত। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের শল্যচিকিৎসক উইলিয়ম হাল্‌ষ্টেড্ জীবাণুমুক্ত রবারের দস্তানা পরিধান করে অস্ত্রোপচারের রীতি প্রবর্তন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে প্যারীর সোরবোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে বৃদ্ধ পাস্তুর আনন্দবিহ্বল চিত্তে লিষ্টারকে চুম্বন করে অভিনন্দিত করেছিলেন। এক স্কটল্যাণ্ডবাসী ও অপর ফরাসীর আন্তরিক আলিঙ্গনের শুভক্ষণে সূচিত হয়েছিল আরও উন্নতশালী জীবাণুতত্ত্বের ভবিষ্যত।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইগনাৎস্ ফিলিপ জেমেল্‌ভাইস্ নামক এক হাঙ্গেরীয় যুবক ভিয়েনা জেনারেল হাসপাতালের ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে চাকুরীতে নিযুক্ত হন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, উক্ত চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ রোগিনীই সূতিকাজ্বরে প্রাণত্যাগ করে। কিছুদিন পরে তিনি আবার লক্ষ্য করলেন যে, প্রসূতিশালার প্রথম কামরার রোগিনীদের মধ্যেই সূতিকাজ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। হাসপাতালের প্রচলিত প্রথা অনুসরে পথিপার্শ্বের প্রথম কামরায় রোগীনীদের চিকিৎসা ও প্রসব করাত পুরুষ ছাত্রেরা এবং পশ্চাদ্‌বর্তী কামরায় প্রসব করাত ধাত্রীগণ। হাসপাতালের বিপরীতে অবস্থিত শবব্যবচ্ছেদাগারে শবব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রেরা প্রসবাগারের মধ্যে অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রসূতিগণের সান্নিধ্যে আসতেন। কিন্তু পিছনের কামরায় যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে কাজ করতেন ধাত্রীরা। জেমেল্‌ভাইস্ উক্ত জ্বরের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একান্ত চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ডঃ কোলেট্‌স্কা এক রোগিনীর শবব্যবচ্ছেদ করবার সময় আঙ্গুলে আহত হয়ে সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে রক্ত দুষ্ট হয়ে মারা যান। কোলেট্‌স্কার শবব্যবচ্ছেদের সময় জেমেল্‌ভাইস্ লক্ষ্য করেন যে, কোলেট্‌স্কার দেহের অভ্যন্তরে অবিকল সূতিকা রোগিনীর ন্যায় পরিবর্তন হয়েছে। উক্ত বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, নিশ্চয়ই শবব্যবচ্ছেদ-গৃহ হতে কোনও অদৃশ্য বিষাক্ত বস্তু শিক্ষার্থীগণের হস্ত

চিত্র—৭৫

দূষিত করে এবং তারা প্রসূতিগণের দেহে সেই দোষ সংক্রামিত করে। তিনি এক আদেশজারী করে শবব্যবচ্ছেদ-গৃহ প্রত্যাগত ছাত্রগণকে রোগিনীগণের সংস্পর্শে আসতে নিষেধ করেন। উক্ত আদেশের ফলে অতি সত্বর সূতিকাজ্বরে মৃত্যুর হার হ্রাস পেতে থাকে। এক প্রবন্ধে তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল প্রকাশের পর তাঁর সহকর্মীগণ রুষ্ট হয়ে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে

মানসিক রোগগ্রস্থ হয়ে ভিয়েনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধ হয়েছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে পদার্থবিদ্যার অবদান

জার্মান পদার্থবিদ্ হ্বিল্‌হেলম্ কন্‌রাড ফন্ রোন্টগেন কর্তৃক "রোন্টগেন রশ্মির" আবিষ্কারের পর চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি দ্রুততর হয়েছে। রোন্টগেন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন ও হল্যাণ্ডের য়ুট্রেখট্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি প্রথমে গীসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা রত হন এবং অতঃপর ভুয়ের্তস্‌বুর্গের অধ্যাপক কুন্দৎ এর অধীনে কার্য গ্রহণ করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে একটি ক্লার্ক কর্তৃক উদ্ভূত বায়ুশূন্য নলের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ে গবেষণা করবার সময় তিনি হঠাৎ এক অজ্ঞাত ও অদৃশ্য রশ্মি বা "এক্স-রে" এর সন্ধান পান। প্রথমতঃ রোন্টগেন্ চিকিৎসা ব্যবস্থায় উক্ত রশ্মি প্রয়োগের বিষয় চিন্তা করেন নি। কিন্তু কালক্রমে উন্নত ধরনের রশ্মি বিচ্ছুরণকারী যন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসাশাস্ত্রে রোন্টগেন রশ্মি অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীকালে অধিক শক্তিশালী ও গভীর প্রসারী এক্সরে বা রোন্টগেন রশ্মির সাহায্যে কর্কট রোগ বা ক্যানসার চিকিৎসার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে রোন্টগেন পদার্থবিদ্যায় প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পদার্থবিদ্ অঁরি বেকারেল্ কোন কোনও মৌলিক পদার্থের গামা রশ্মি বিচ্ছুরণকারী ক্ষমতার

চিত্র—৭৬, ৭৭, ৭৮

বিষয় অবগত হন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদাম মারী কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরী "গামা" রশ্মি বিচ্ছুরণকারী "রেডিয়াম" নামক এক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। কর্কট রোগের চিকিৎসায় রেডিয়াম গভীর প্রসারী রোন্টগেন রশ্মির অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বেকারেল ও কুরি দম্পতি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীকালে মার্কিন পদার্থবিদ্ আরনেষ্ট ওরলাণ্ডো লরেন্স কর্তৃক "সাইক্লোট্রোন" নামক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং উহা দ্বারা নতুন বিচ্ছুরক "সমঘর" (আইসোটোপ্) পদার্থ সৃষ্টি করে কর্কটরোগ চিকিৎসার ও রোগনির্ণয়ের প্রচুর সুবিধা হয়েছে। লরেন্স তাঁর আবিষ্কারের জন্য ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার ভূষিত হন।

চিত্র—৭৯

বিংশ শতকের চিকিৎসাশাস্ত্র

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী পল্ এরলিখ্ কর্তৃক উপদংশ জীবাণু বিধ্বংসী স্যালভারসান নামক রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতের পর থেকে পৃথিবীর রসায়ন শাস্ত্রজ্ঞগণ নতুন নতুন ঔষধ প্রস্তুতে সচেষ্ট হন। ডঃ এরলিখ্ নোবেল পুরস্কারে (১৯০৮) ভূষিত হন। ডঃ গেল্মো নামক এক অখ্যাত ভিয়েনাবাসী ফলিত রাসায়নিক প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোন অ্যামাইড নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত করেন। উক্ত পদার্থের অসাধারণ জীবাণু-বিধ্বংসী গুণের বিষয় তিনি বা অন্য কেউ জানতেন না। পদার্থটি পশমের বস্ত্রাদি রঞ্জিত করবার জন্য ব্যবহৃত হত। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নিদানতত্ত্ববিদ ডঃ গেরহার্ড ডোমাগ উপরোক্ত পদার্থের অনুরূপ "প্রণ্টসিল" নামক এক পদার্থের অসাধারণ জীবাণুনিধক ক্ষমতার বিষয়ও আবিষ্কার করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কয়েকজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য করেন যে "প্রণ্টসিল" মানব শরীরের আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা গেলমো কর্তৃক সৃষ্ট প্যারাএমাইনো-বেঞ্জিন-সালফোন অ্যামাইড-এ রূপান্তরিত হয়ে জীবাণু ধ্বংস করে। ঔষধটি নিয়ে বহু গবেষণার পর সালফাথিয়াজল, সালফাডায়াজিন, সালফামেজাথিন, সালফাগুয়ানিডিন প্রভৃতি উন্নত ধরণের জীবাণু বিধ্বংসী ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে "ট্রাইমেথোপ্রিম্" নামক আরও উন্নত সালফা গোষ্ঠীর ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যার সাহয্যে সংক্রামক রোগের চিকিৎসা আরও সহজ হয়েছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ডোমাগ্‌কে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলেও ইহুদী বিদ্বেষী হিটলার ইহুদী-বংশোদ্ভব আলফ্রেড নোবেল প্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণে ডোমাগ্‌কে বাধা দেন। পরবর্তীকালে ডোমাগ সুইডেনের নৃপতির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেছেন।

চিত্র—৮০

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, অনাবৃত পাঁউরুটির উপর এক-প্রকার সূক্ষ্ম ছত্রাক জন্মায়। বহু সহস্র বৎসর ধরে অনাবৃত খাদ্যের উপর উক্ত ছত্রাক দেখা সত্ত্বেও মানুষ তার জীবাণু জন্মনিরোধক (এ্যান্টিবায়োটিক) গুণের বিষয় কল্পনাও করতে পারেনি। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম "পেনিসেলিউম্ নোটাটুম"। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের সেণ্ট মেরীস্ হাসপাতালের জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ডঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং একদিন লক্ষ্য করলেন যে অসাবধানতাবশতঃ একটি কৃত্রিম জীবাণুকর্ষণ ক্ষেত্রের এক কোণে একটি পেনিসেলিউম ছত্রাকের বসতি হয়েছে। ক্ষেত্রটিতে ষ্টাফাইলোকক্কাস্ নামক এক প্রকার জীবাণু কর্ষিত করা

হয়েছিল। দুই তিন দিন পরে উক্ত স্থান পুনরায় পরীক্ষা করে তিনি দেখতে পান যে, ক্ষেত্রের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে ষ্টাফাইলোকক্কাস জন্মেছে কিন্তু কোনও এক

চিত্র—৮১

অজ্ঞাত কারণে পেনিসেলিউম্ ছত্রাকের বসতির পরিধি থেকে ষ্টাফাইলোকক্কাস অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। ফলে ফ্লেমিং-এর মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হল। তিনি পূর্ণোদ্যমে অন্যান্য জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে কয়েক প্রকার জীবাণু পেনিসেলিউম ছত্রাকের সান্নিধ্যে আসলে তাদের বংশ বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে লণ্ডনের অধ্যাপক রাইষ্ট্রিক উক্ত ছত্রাক কর্ষণের উপযোগী এক তরল ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। উক্ত তরল ক্ষেত্রে ছত্রাকটি কর্ষিত করবার পর ক্ষেত্রের জলীয় পদার্থের মধ্যে এক প্রকার শক্তিশালী জীবাণু জন্মনিরোধক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। পেনিসেলিউম ছত্রাকজাত পদার্থটির নামকরণ করা হল "পেনিসিলিন"। পেনিসিলিন সহজ লভ্য করবার জন্য বহু পরীক্ষা চলতে লাগল। অক্সফোর্ড-এর প্রফেসর হাওয়ার্ড ফ্লোরি ও তাঁর সহকারী ডঃ বরিস চেইন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেনিসিলিনের গাঢ় দ্রাবণ প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন ঔষধ ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন। উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের পুরস্কার স্বরূপ ফ্লেমিং ও ফ্লোরি "নাইট উপাধি ভূষিত হলেন, এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ডঃ চেইন সহ তাঁরা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

ফ্লেমিং এর সাফল্যে উৎসাহিত পৃথিবীর বহু ছত্রাক বিজ্ঞানী (মাইকোলজিষ্ট) নানাপ্রকার ছত্রাকের জীবাণু জন্মনিরোধ ক্ষমতা নিরুপণের জন্য গবেষণা শুরু করেন। রুশ-মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ সেল্‌মান ভাকস্‌মান "এ্যাকটিনোমাইকোসিস গ্রাইসিউস" নামক ছত্রাক থেকে যক্ষ্মা জীবাণু রোধক ঔষধ "স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন" প্রস্তুত করেন। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁকেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। পরবর্তী-কালে অরিওমাইসিন, টেরামাইসিন ওলিয়াণ্ডোমাইসিন, ভায়োমাইসিন প্রভৃতি আরও ছত্রাকজাত ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। অরিওমাইসিন উৎপাদন প্রচেষ্টায় আমেরিকাবাসী ভারতজাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডঃ ইয়াল্লাপ্রাগাডা সুব্বারাও এর অবদান সর্বজন বিদিত।

বিংশ শতকের মানসিক রোগ চিকিৎসা

মধুমেহ রোগের চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত ঔষধ ইনসুলিন ও মস্তকে

বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা আক্ষেপ উৎপাদিত করে মানসিক রোগের চিকিৎসা বিংশ শতাব্দীর দুই বিস্ময়কর অবদান। ডঃ মানফ্রেড্ ফন্ সাকল্ নামক এক ভিয়েনাবাসী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মানসিক রোগীদের দেহে ইন্সুলিন সূচীবিদ্ধ করে রোগীর শরীরে মৃগী রোগীর ন্যায় আক্ষেপ উৎপাদিত করেন এবং উক্ত প্রকারে দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্ব রোগ (স্কিৎসোফ্রেনিয়া)-এর চিকিৎসা করতেন। চিকিৎসাটি এখনও সুপ্রচলিত। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বুদাপেস্তবাসী ডঃ ফন্ মেডুনা "লেপ্টাজোল" নামক ঔষধ প্রয়োগেও অনুরূপ আক্ষেপ চিকিৎসার উদ্ভাবন করেন। বর্তমানকালে রোগীর মস্তকে শক্তিশালী বিদ্যুৎতরঙ্গ দিয়েও আক্ষেপ চিকিৎসা করা হয়। ইতালীর ডঃ চেরলেত্তি ও ডঃ বেন্নি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পর্তুগালবাসী চিকিৎসক ডঃ এগাজ্ মোনিজ ও তাঁহার সহকর্মী ডঃ আলমেইডা লিমা মানসিক রোগীর মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ অপরাংশ হতে অস্ত্রোপচার দ্বারা বিচ্ছিন্ন করে মানসিক রোগ চিকিৎসার নবতম পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। উক্ত অস্ত্রোপচারের বৈজ্ঞানিক নাম "প্রিফ্রণ্টাল লিউকোটমী।" ডঃ মোনিজ্‌কে উক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় (১৯৪৯)।

বিগত দশ বৎসর কালের মধ্যে মানসিক রোগ চিকিৎসার উপযোগী বহু নতুন নতুন রাসায়নিক ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় চিকিৎসা পূর্বাপেক্ষা আরও সহজতর হয়েছে। উক্ত ঔষধসমূহ দ্বারা আজকাল রোগীকে মানসিক আরোগ্যশালায় আবদ্ধ না রেখেও সাফল্যের সঙ্গে দুরুহ মানসিক রোগের চিকিৎসা করা যায়। তাই আজ নিপীড়িত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ মানসিক রোগী আর বিশেষ দেখতেই পাওয়া যায় না।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বিংশ শতকের অবদান

রোগ নির্ণয় শাস্ত্রে বিংশ শতকে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। কন্‌রাড্ রোণ্টগেন্ "রঞ্জনরশ্মি" আবিষ্কার করে যে বিরাট সম্ভাবনায় সৃষ্টি করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে উত্তোরোত্তর নির্ণয়শাস্ত্রের আরও উন্নতি হয়েছে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত পর্তুগীজ স্নায়ুতত্ত্ববিদ ডঃ এগাজ্ মোনিজ্ ভিয়েনাবাসী দুই তরুণ শারীরস্থানবিদ্ হাসেক্ ও লিণ্ডেনথাল্-এর এক প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণায় জীবন্ত মানুষের ধমনী ও শিরার রঞ্জন চিত্রণের এক আশ্চর্য পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। পদ্ধতিটি এখন "এ্যান্‌জিওগ্রাফী" বা "শিরাধমনী

চিত্রণ" নামে অতি পরিচিত ও সুপ্রচলিত। উক্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা মস্তিষ্কের অর্বুদের স্থান আকার ইত্যাদি নিরূপণ করা যায়।

বিংশ শতকের আর একটি আবিষ্কারও আজ বহুল প্রচলিত। ওলন্দাজ শরীর বিজ্ঞানী ভিলেম্ আইনথোভেন্ সর্বপ্রথম মানুষের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-

চিত্র—৮২

কলাপের বৈদ্যুতিক চিত্রণ করতে সমর্থ হন এবং তাঁর পদ্ধতি সারা পৃথিবীতে "ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফী" বা "হৃদবিদ্যুৎচিত্রণ" নামে সর্বজনবিদিত। ডঃ আইনথোভেন্ ১৯২৪ খৃঃ অব্দে তাঁর আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। ডঃ হানস্ বের্গের নামক এক জার্মান মনঃস্তত্ত্ববিদ আইনথোভেন প্রদর্শিত পথানুসরণ করে "মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ লেখন্" বা "ইলেকট্রো এন্‌সেফালোগ্রাফী" পদ্ধতি আবিষ্কার করে স্নায়ুতত্ত্বশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি করেছেন।

আমেরিকার মিশিগানবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বসুকুমার বাগচি উক্ত বিদ্যুৎলেখনের প্রভূত উন্নতি সাধন করে অমর হয়ে আছেন। তিনি প্রথম জীবনে সন্ন্যাসী ধীরানন্দরূপে আমেরিকা প্রবাসী হন। বিজ্ঞানের আকর্ষণে তিনি সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করে বিজ্ঞান শিক্ষা করেন ও মস্তিষ্ক বিদ্যুৎলেখন শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি গৌরবের বিষয়। তাঁর রচিত মস্তিষ্ক বিদ্যুৎলেখনের বহু পুস্তক ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী। ডঃ বাগচীর ছাত্র ডঃ উন ও ডঃ কুই উভয়েই এখন পৃথিবী বিখ্যাত। তিনি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে যোগসমাধি ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বিষয়ে গবেষণার জন্য ভারতে এসেছিলেন। তাঁর উক্ত গবেষণার উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতের মার্কিণ নভোচারীদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্তিষ্ক বিদ্যুৎ লেখন বিভাগ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তরকালে বিদ্যুৎ-লেখনের পদ্ধতি আরও উন্নত হয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে।

আইন্‌ষ্টাইন্, বোর, হাহন্ বোলৎস্‌মান্, মেইট্‌নের, ফের্‌মি প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ বিজ্ঞানীগণ পরমাণু ভঙ্গীকরণের পদ্ধতি আবিষ্কার করে একাধারে যেমন বিশ্ববিধ্বংসী পরমাণু বোমার সৃষ্টি করেছেন সেই সঙ্গে তাঁরা বহু "পরমাণু সমঘর" বা "আইসোটোপ" সৃষ্টি করে রোগ নিরূপণের এক নবতম অধ্যায় রচনা করেছেন।

আপনারা সবাই জানেন যে, "পরমাণু সমঘর" থেকে গামা রশ্মি নির্গত

চিত্র ৭৫—
ইগ্‌নাৎস্ ফিলিপ্ জেমেলভাইস্।

চিত্র ৭৬—
পিয়ের কুরী।

চিত্র ৭৭—মাদাম মারী কুরী স্ক্লদভ্‌স্কা।

চিত্র ৭৮—আঁরি বেকারেল্।

চিত্র ৭৯—আরনেষ্ট ওরলান্দো লরেন্স।

চিত্র ৮০—পাউল এরলিখ্।

চিত্র ৮১—স্যর আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং।

চিত্র ৮২—ভিলেম্ আইন্থোভেন্।

চিত্র ৮৩—অ্যালান্ করম্যাক্।

চিত্র ৮৪—স্যর গড্‌ফ্রে হাউন্সফিল্ড।

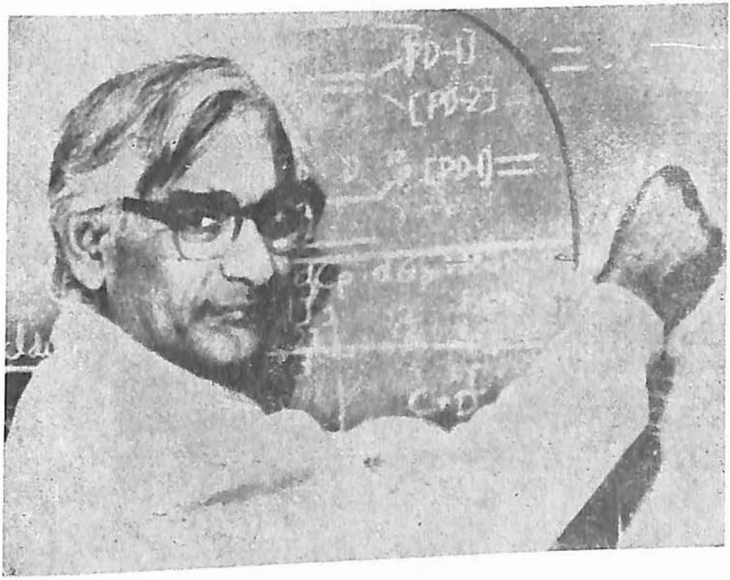

চিত্র ৮৫—হরগোবিন্দ খোরানা।

চিত্র ৮৬—নীলস্ বোহ্‌র।

চিত্র ৮৭—পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত।

হয়। কোন ব্যক্তির শরীরে কোন বিশেষ সমঘর সূচীবিদ্ধ করলে রোগগ্রস্থস্থানে তাহা রাশীকৃত হয় এবং গামারশ্মী বিকীরণ করতে থাকে। গামারশ্মী বিকীরণ নির্ণয়কারী যন্ত্রর দ্বারা উক্ত রোগগ্রস্থ স্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। উক্ত পদ্ধতির দ্বারা অর্বুদরোগ এবং কর্কটরোগ নিরূপণ করা অতি সহজসাধ্য হয়েছে। ইহা ব্যতীত কর্কটরোগের চিকিৎসায় বহু "সমঘর" ভেষজরূপেও ব্যবহৃত হয়। সমঘরের সাহায্যে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নতুন অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে। যাকে বলা হয় "নিউক্লিয়ার মেডিসিন" বা "পরমাণুকেন্দ্র চিকিৎসা"।

আমাদের সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাহিরেও শব্দতরঙ্গ আছে। যাকে বলা হয় "শ্রবণাতীত তরঙ্গ" বা "আল্ট্রাসনিক্ ওয়েভ্স্"। মানুষ সেই তরঙ্গ শুনতে পায় না। কিন্তু কুকুর বা অন্যান্য প্রাণী সেই তরঙ্গের স্বর শুনতে পায়। গোয়েন্দাগিরিতে সেই প্রকার শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টিকারী বাঁশির দ্বারা গোয়েন্দা-কুকুরকে অনুসন্ধান কার্যে সহায়তা করা হয়। মাদাম মারী কুরী কর্তৃক আবিষ্কৃত "পিয়েৎজো ইলেক্‌ট্রিক ক্রিষ্টাল" নামক বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক "কেলাস" দ্বারা ঐ "শব্দাতিতরঙ্গ" বা "আল্ট্রাসনিক্ ওয়েভ্স" নিরূপণ করা যায়। সাধারণ শব্দ তরঙ্গের মত শব্দাতিতরঙ্গেরও প্রতিধ্বনি হয়। উক্ত বৈজ্ঞানিক সূত্রের উপর ভিত্তি করে ভিয়েনাবাসী ডুসিক ভ্রাতৃদ্বয় সর্বপ্রথম মানুষের মস্তিষ্কের অর্বুদের স্থান নিরূপণ করতে সক্ষম হন। অতঃপর সুইডেন দেশীয় স্নায়ুশল্যচিকিৎসক লারস্ লেক্‌সেল্ উক্ত রোগ নির্ণয় যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন এবং বর্তমানে উক্ত যন্ত্র মস্তিষ্ক রোগ, হৃদরোগ, রক্তনালী রোগ, অন্ত্ররোগ এবং শরীরের অপর যন্ত্রাংশের রোগ এমন কি গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের আয়তন ও গঠন বৈকল্য নিরূপণেও প্রভূত ফলপ্রসূ। উক্ত শাস্ত্রের নামকরণ করা হয়েছে "একোগ্রাফী" বা "প্রতিধ্বনি লেখন"।

চিত্র ৮৩ ও ৮৪

ডঃ করম্যাক্ নামক এক দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী পদার্থবিদ্যাবিদ্ একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চিন্তার উদ্রেক্ হয়েছিল যে কি উপায়ে সাবেকী রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে শরীর পরীক্ষার আরও উন্নতি সাধন করা যায়। তিনি তাঁর জ্ঞানগর্ভ চিন্তাধারার উপরে এক প্রবন্ধ লিখে এক বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি অবহিত হলেন যে, ইংল্যাণ্ডের "হিস্ মাষ্টার্স ভয়েস্" বা ই. এম্. আই নামক বিখ্যাত সঙ্গীত ব্যবসায়ী সংস্থার হাউনস্‌ফিল্ড নামক এক প্রযুক্তিবিদ্ করম্যাকের

মতানুগ এক যন্ত্র নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছেন। করম্যাক্ সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র মারফৎ পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের জানিয়ে দিলেন যে হাউনস্ফিল্ডের বহু পূর্বেই তিনি উক্ত যন্ত্র উদ্ভাবনের বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনা এবং উপায় উদ্ভাবন করেছেন। কালক্রমে উক্ত যন্ত্র প্রকৃষ্টভাবে নির্মিত হল এবং বর্তমানে উহা "সিটি স্ক্যান" বা "কম্পূটারাইজড্ টমোগ্রাফী' নামে সর্বজন বিদিত। করম্যাক্ এবং হাউনস্ফিল্ড উভয়ে ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাবিদ্যায় নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত যন্ত্র দ্বারা শরীরের সকল প্রকার রোগাবস্থার চিত্রণ করা যায়। উক্ত চিত্রণ প্রথায় রোগীর শরীরে কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষত উৎপাদনের প্রয়োজন হয় না।

পরবর্তীকালে আরও বহুপ্রকার সমধর্মীয় যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তন্মধ্যে "নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক্ রেসোনেন্স্ টমোগ্রাফী", "প্রজিট্রন এমিশান্ ট্রান্সভারস টমোগ্রাফী", "ফোটন্ টমোগ্রাফী" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতের অন্তরালে আরও কত কি আবিষ্কার লুক্কায়িত আছে তাহা এখনও আমাদের ধারণাতীত।

বিংশ শতকের শল্য চিকিৎসা

অবচেতনা শাস্ত্রের উন্নতি ও জীবাণুনিরোধক ঔষধ আবিষ্কারের পরবর্তীকাল থেকে শল্যচিকিৎসাশাস্ত্রের আমূল পরিবর্তন ও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। এ যুগে শরীরের এমন কোন যন্ত্র বা অংশ নেই যার উপর সফলতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার করা যায় না। মস্তিষ্ক থেকে পদপ্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র নানাবিধ অস্ত্রোপচার করা যায়। কৃত্রিম রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র এবং শ্বাস প্রশ্বাস চালনের যন্ত্র (হার্টলাঙ্গ মেশিন) নির্মাণের পর থেকে সাময়িকভাবে হৃদ্পিণ্ডের কার্য স্থগিত রেখে তার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দুরূহ অস্ত্রোপচার করা হয়। এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী শল্যচিকিৎসক ডঃ ক্রিষ্টিয়ান্ বার্ণার্ড্ সদ্য মৃত মানুষের হৃদ্পিণ্ড রোগগ্রস্ত অন্য মানুষের শরীরে সংস্থাপিত করে বিংশ শতাব্দীর শল্যচিকিৎসা জগতে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। সম্প্রতি এক মার্কিণ হৃদ্‌রোগীর বক্ষে সম্পূর্ণ কৃত্রিম এক হৃদ্‌যন্ত্র সফলতার সহিত সংস্থাপিত হয়েছে। বিখ্যাত মার্কিণ বৈমানিক কর্ণেল চার্লস্ লিণ্ডবার্গ-এর কল্পনাপ্রসূত ও কল্‌ফ্ নামক ওলন্দাজ চিকিৎসক কর্তৃক সৃষ্ট "কৃত্রিম বৃক্ক" বা "আর্টিফিসিয়াল কিডনী" যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক মানুষের দেহ থেকে অন্যের দেহে সুস্থ বৃক্ক সংস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুনঃ সংযোজন শল্যচিকিৎসার একটি অতি সাধারণ কার্যক্রম। আধুনিক শল্যচিকিৎসায় চিকিৎসকের পরম সহায়ক হয়েছে "শল্যচিকিৎসার অনুবীক্ষণ যন্ত্র" বা "অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ"। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম স্নায়ু বা রক্তনালীর সম্মিলন, মধ্য কর্ণের সূক্ষ্ম স্নায়ুর সংযোজন, অক্ষিগোলকের অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার ইত্যাদি সাধারণ দৃষ্টিগোচর বহির্ভূত শল্যচিকিৎসা সম্ভাব্য হয়েছে।

ডঃ বোভী নামক এক মার্কিণ পদার্থবিদ্যাবিদ "ডায়াথার্মী" নামে এক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। উক্ত যন্ত্রের দ্বারা অতি সহজে অস্ত্রোপচার ঘটিত রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে দুই ভারতীয়ের অবদান অসামান্য। ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে কর্মরত ভারত-

চিত্র ৮৬

মার্কিনী বিজ্ঞানী ডঃ হরগোভিন্দ খোরানা সর্বপ্রথম কৃত্রিম "জীন্" সৃষ্টি করতে সক্ষম হন এবং সেই "জীন" একটি "ভিরোফাজ" জাতীয় জীবাণুর মধ্যে প্রবেশ করান। তিনি ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। উক্ত আবিষ্কার অত্যন্ত সম্ভাবনাময়, উহার সাহায্যে ভবিষ্যতে কর্কটরোগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে এবং হয়ত কৃত্রিম মানুষও সৃষ্টি করা যাবে। ডঃ আনন্দ চক্রবর্তী নামক অপর এক বাঙ্গালী ভারত-মার্কিণ বিজ্ঞানী তৈলভোজী একপ্রকার কৃত্রিম জীবাণু সৃষ্টি করেছেন। জীবাণু বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভবিষ্যত উক্ত আবিষ্কারের ফলে অতিশয় উজ্জল হয়েছে। ভবিষ্যতে কৃত্রিম জীবাণু দ্বারা রোগ সৃষ্টিকারী প্রাকৃতিক জীবাণু ধ্বংস করে মানুষের জীবন পরিক্রমা আরও বৃদ্ধি করা যাবে এই আশা নিতান্ত অমূলক নয়।

কর্কটরোগের চিকিৎসার বিবিধ রাসায়নিকজাত ভেষজ ও হরমোন জাতীয় ভেষজ প্রয়োগও বিংশ শতাব্দীর এক আশ্চর্য অবদান। উক্ত ভেষজাদি প্রয়োগে দুরারোগ্য কর্কট রোগগ্রস্থদের প্রাণে এক নতুন আশার আলোকপাত হয়েছে।

১৯৩৩ খৃঃ অব্দে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯২২) দিনেমার পদার্থবিদ্

চিত্র—৮৬

নীলস্ বোর সর্বপ্রথম "লেসার" নামক শক্তিশালী পরমাণুজাত রশ্মির কথা

উল্লেখ করেন। আইন্‌ষ্টাইন্‌, টাউনস্‌, ব্যাসভ এবং প্রোখোরোভ্‌ও উক্ত পরমাণুজাত রশ্মির বিষয় গবেষণা করেন। ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে মার্কিন পদার্থবিদ মাইমান চুনীমণিকার সাহায্যে "রুবিলেসার" রশ্মি উৎপাদন করতে সক্ষম হন। বর্তমানে শল্যচিকিৎসার ক্ষেত্রে "লেসার" রশ্মি অতি উপযোগী। উহার সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে অতি স্বল্প রক্তপাতে শল্যচিকিৎসা করা যায়। চর্মের কর্কট রোগগ্রস্থ অংশ লেসার রশ্মির সাহায্যে দাহন করলে রোগারোগ্য হয়। স্নায়ু ও অক্ষি শল্যচিকিৎসায় এখন "লেসার" রশ্মি বহুল ব্যবহৃত। "লেসার" রশ্মি প্রয়োগে কঠিন শল্যচিকিৎসা সহজসাধ্য হয়েছে। "অতিশৈত্য" প্রয়োগ করেও বহু দুরূহ অস্ত্রোপচার সহজ হয়েছে। উক্ত শৈত্য প্রয়োগ প্রণালীকে "ক্রাইয়ো সার্জারী" বা "অতিশৈত্য শল্যতন্ত্র" বলা হয়।

ভারতে য়ুরোপীয় চিকিৎসার প্রবর্তন

পঞ্চদশ শতকে তৎকালীন পর্তুগীজ সম্রাট প্রাচ্যের ধনরাশি আহরণের জন্য পর্তুগাল-এর সমুদ্রচারী নাবিকগণের উপর চাপ দেন। বার্থোলামিউ ডায়াজ নামক নাবিক ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণতম অন্তরীপ (উত্তমাশা) ঘুরে সমুদ্র পরিক্রমা করেন। ভাস্কো-ডা-গামা নামক অপর নাবিক ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনটি ক্ষুদ্র জাহাজ নিয়ে কেরালার কালিকট্‌ বন্দরে অবতীর্ণ হন। তৎকালে কেরালায় "জামোরিন" নামক রাজা রাজত্ব করতেন। ভাস্কো-ডা-গামা-র আগমনের বহু আগে থেকে কেরালায় "মোপ্‌লা" নামধেয় আরবী ব্যবসায়ীরা ব্যবসার উদ্দেশে বসতি স্থাপন করে। জামোরিন-এর কয়েকটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল যাদের তিনি আরবী বণিকদের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। মলয়ালী ভাষায় "মো পিল্লাই" শব্দের অর্থ জামাতা। সেই থেকে "মোপ্‌লা" শব্দের উৎপত্তি এবং বর্তমানে মলয়ালী মুসলমানদের 'মোপ্‌লা' বলা হয়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে পর্তুগাল-এর রাজা, পেড্রো আল্‌ভারেজ্‌ কাব্রাল্‌-এর নেতৃত্বে এক বিপুল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে বহু মোপ্‌লাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আফন্‌সো দে আলবুকার্ক বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া অধিকার করেন। গোয়া নগরীতে তৎকালে বৈদ্য নামধেয় আয়ুর্বেদজ্ঞরা চিকিৎসা করতেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পরিব্রাজক চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বের্নিয়ে গোয়া পরিদর্শন করে বলেছিলেন যে, দেশীয় চিকিৎসকেরা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র পুস্তক অনুসারে চিকিৎসা করতেন। তাঁরা

চিত্র ৮৮—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর।

চিত্র ৮৯—ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় ছাত্রচতুষ্টয়
(বাম হইতে দক্ষিণে ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল,
দ্বারকানাথ বসু ও সূর্যকুমার চক্রবর্তী)।

চিত্র ৯০—স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

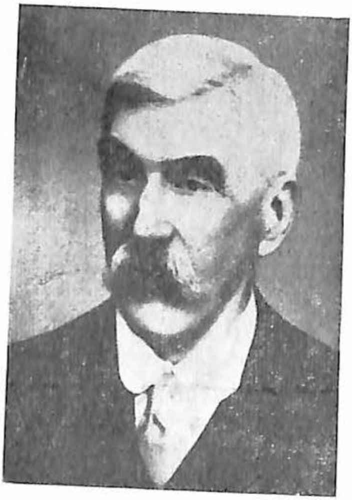

চিত্র ৯১—ডঃ লেওনার্ড রজার্স।

বিখ্যাত আরবী চিকিৎসক আল্ জাহ্‌রাভী বা আজ্ জাহ্‌রাভী লিখিত শল্যচিকিৎসা পুস্তক "কিতাব আল্ তস্‌রিফ্"-এর তিনটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি ও উহার সরল বাংলা ব্যাখ্যা।

على هذه الصورة

ثم يلقط بمقص لطيف تلك العروق بلطف وتمسح الدم حينا
بعد حين حتى ترى العين قد ذهبت منها آثار العروق واخراج
الدم ونحوه طرف سنا القرانات يوخذ بها باطراف المقص وليكن
عملك نصف النهار بازاء الشمس وليكن في عملك منتبه
جدا لئلا تقطع غير تلك العروق فعند فراغك فقطر
في العين الاسبياف الاحمر او الاخضر ليأكل حديه ما بقي من
السبل فان لم يمكنك لقط كله في تلك الساعة
فضمد العين بما يسكن المادة واتركها اياما حتى
يسكن المها وتامن الورم واعد العمل على
الصفة نفسها حتى يبرا ان شاء الله تعالى
وهذه صورة المقص

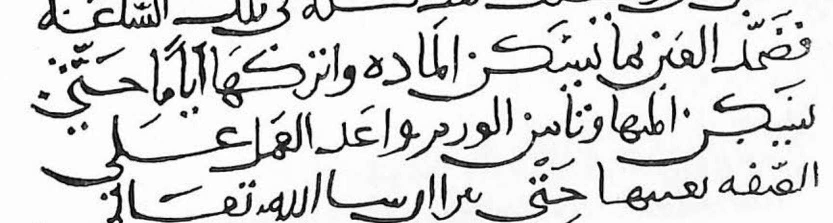

চিত্র ৯২

চিত্র ৯২—বাংলা ব্যাখ্যা ঃ

……তারপর তুমি উহাদের উপর কাঁচি প্রয়োগ কর কিন্তু অতিশয় হাল্কাভাবে এবং অতি সন্তর্পণে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত মুছতে থাক যেন রক্তের উৎস দেখা যায়। কাঁচি এমনভাবে ব্যবহার করবে যেন রোগীর বেশী কষ্ট না হয়। এই অস্ত্রোপচার ঠিক রৌদ্রালোকিত মধ্যাহ্নে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ কাজে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করতে হবে যাতে অভিষ্ট শিরাটি ছাড়া অন্য কোনও তন্ত্রী কাটা না পড়ে। অতঃপর চোখে "আশয়ার-আস্‌মার" ও "আখয়ার" ফোঁটা ফোঁটা দিতে হবে ফলে দূষিত রস শোষিত হবে কেননা শুধুমাত্র অস্ত্রপ্রয়োগ করে দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করা যায় না। তারপর চোখটি বন্ধনী দিয়ে বেঁধে দাও এবং কয়েকদিন বন্ধনী খুলো না। ব্যথা প্রশমিত হবে এবং ফোঁড়াটিও সেরে যাবে, যদি না হয় তবে পুনরায় অস্ত্রোপচার করতে হবে।

ইন্‌শাল্লাহ্‌

وهذه صورة المبضع

فان كانت الرطوبة ازيد والورم اعظم فاجعلها شقين
متقاطعين على هذه الصورة

فان كانت الرطوبة التي ذكرنا تحت
العظم وعلامته ان ترى خياطات الراس مفتوحة من كل
جهة والما ينفر اذا عصرته بيدك الى داخل وليس
يخفى عليك ذلك فينبغي ان تشق في وسط الراس
ثلث شقوق على ∴ الصورة
وبعد الشق تخرج الرطوبة كلها
ثم تشد الشقوق بالخرق والرفائد ثم تنطله من فوق
بالشراب والزيت الى اليوم الخامس ثم تحل الرباط وتعالج
الجرح بالفتل والمراهم ولا تترك شد الراس باعتدال
وتغذي العليل بكل غذاء جاف قليل الرطوبة الى ان
يقوى العضو ويبرا ان شاء الله

চিত্র ৯৩

চিত্র ৯৩—বাংলা ব্যাখ্যা ঃ

……কিন্তু যদি তরল দূষিত পদার্থের পরিমাণ বেশী হয় এবং ফোঁড়া আবার বড় হয় তাহলে তাকে দুই অংশে খণ্ডিত কর……

যদি দূষিত পদার্থ পরিমাণে বেশী ও হাড়স্পর্শী হয় এবং তার লক্ষণ এই যে মস্তিষ্কের সমস্ত তন্ত্রীগুলি চারদিক থেকে শিথিল হয়ে গিয়েছে। তুমি সেই ক্ষতের মধ্যে আঙ্গুল দিলে উত্তাপ অনুভব করবে।

অস্ত্রোপচার করবার পর সমস্ত দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করে দাও এবং ক্ষতটি "হুরুক" এবং "ফায়েদ্" দিয়ে জোরে বেঁধে দাও। পাঁচদিন পর সেই বন্ধনীগুলিকে আল্ কোহল্ কিংবা তেল দিয়ে ভিজিয়ে খুলে দাও এবং মলহম্ পটি দিয়ে ক্রমান্বয়ে চিকিৎসা চালাও।

রোগীকে শুষ্ক এবং অপেক্ষাকৃত নীরস খাদ্য খেতে নির্দেশ দেবে। ইন্শাল্লাহ্ রোগীর দেহে শক্তি ফিরে আসবে এবং রোগ নিরাময় হবে।

ان كان قد كوى الكية الواحدة التي وصفنا فلم ينفعه شيء من
ذلك فانظر فان كان بدن العليل قوي البنية لا يستبع ولم يكن
ضعيفا وكان يجد بردا شديدا فاكوه كية اخرى فوق
تلك قليلا ثم اكويه على كل قرن من راسه كية تبلغ حد الجلد
وتكشف من العظم الذي وصفنا او اكوه كية في موخر راسه
في الموضع الذي يعرف بالناس وخفف يدك في ميزه ولا
تكشف العظم فان العليل يجد لها الما شديدا خلاف الم سائر
كيات الراس كلها وساذكر هذه الكية في موضعها
ان شا الله وينبغي ان تكون المكواة التي تكوي بها قرنا الراس
وموخره الطف من المكواة التي تكوي بها وسط الراس
وهذه صورتها

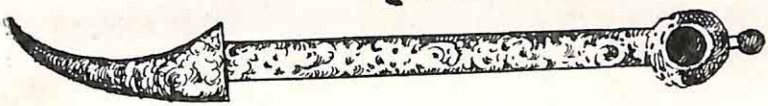

الفصل الثالث
في الشقيقة غير المزمنة

চিত্র ২৪

চিত্র ৯৪—বাংলা ব্যাখ্যা ঃ

······যদি একবার "দাগা" দেবার পর তা ফলপ্রসূ না হয় তাহলে দেখা দরকার যে রোগী স্বাভাবিকভাবে অতি শক্তিশালী বা অতি দুর্বল কিনা। যদি সে শীত অনুভব করে তবে তার মাথার সম্মুখের দুই অংশে আবার "দাগা" দিতে হ'বে। "দাগা" কিন্তু কদাচ হাড় পর্যন্ত প্রসারী হবে না, কেননা তাতে রোগী ভীষণ কষ্ট পাবে। "মেক্ওয়া" মাথার চতুষ্পার্শ্বে হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি ঠিক সেইরূপ।

নীচের ছবিটি "দাগা' যন্ত্রের।

শারীরস্থান বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিলেন এবং শবব্যবচ্ছেদ-এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বের্নিয়ে ফরাসী দেশের বিখ্যাত মঁপেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৬৫৮ বা ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সুরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন এবং মুঘল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ্-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক দারা শিকোহ্ নিহত হবার পর তিনি অপর এক ফরাসী ভারত পরিব্রাজক তাভেরনিয়ে-এর সঙ্গে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এসেছিলেন। দারা শিকোহ্-এর অন্যতমা এক পত্নীর মুখাবয়বে এক দুষ্ট স্ফোটকের চিকিৎসা করে বের্নিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

চার্লস ডেলোঁ নামক অপর এক ফরাসী পরিব্রাজক বলেছেন যে, পণ্ডিত নামধেয় পৌত্তলিক ভারতীয় চিকিৎসকগণ চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞান ব্যতীতই চিকিৎসা ব্যবসায় করতেন। তাদের কাছে বংশানুক্রমিক সূত্রে প্রাপ্ত কিছু ভেষজাদি ও চিকিৎসা কল্প বিধি ছিল। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে গার্সিয়া দে অর্তা নামক বিখ্যাত ইহুদি বংশজাত পর্তুগীজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন এবং রাজ্যপালের ব্যক্তিগত চিকিৎসক পদে নিযুক্ত হন। তিনিই গোয়াতে পাশ্চাত্য মতে চিকিৎসা শিক্ষার প্রবর্তন করেন। মেসত্রে ইয়োহান নামক এক জার্মান শল্যচিকিৎসক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে গোয়াতে এসেছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ ভারতে আগমনকারী প্রথম য়ুরোপীয় শল্য চিকিৎসক। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে গন্‌সালো ফেরনান্দেজ্ নামক অপর এক পর্তুগীজ চিকিৎসক গোয়াতে আসেন ও স্বল্পকাল বাস করেন, তাঁর সময়ে গোয়ার ভেষজ ব্যবসায়ী ছিলেন গ্যাস্‌পার পিরেজ ও টমে পরেজ। পরবর্তী কালে গ্যাসপার পিরেজ নিজামের রাজসভায় পর্তুগাল এর রাজদূত নিযুক্ত হন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এক তথ্য থেকে জানা যায় যে গোয়া অঞ্চলের বায়ু অত্যন্ত বিষাক্ত ছিল। কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসরের মধ্যে সেখানকার জন সংখ্যা ৪০০,০০০ থেকে মাত্র ৪০,০০০ এ নেমে আসে। ১০ জন পর্তুগীজ রাজ্যপাল গোয়াতেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তৎকালে সেখানে "মর্দেখিন্" নামক এক ভয়াবহ জর ব্যাধির প্রকোপ ছিল। "মর্দেখিন" জরে আক্রান্ত হলে মৃত্যুই ছিল একমাত্র পরিণতি। আপাতদৃষ্টিতে মর্দেখিন বর্তমানের ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে সন্ত ফ্রানন্সিস জাভিয়ের এর মরদেহ সুদূর চীনদেশের সান্‌চিয়াম্ থেকে গোয়াতে আনীত হয়েছিল। গোয়ার নারী চিকিৎসকদের মধ্যে দোনা হুলিয়ানা-এর নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে তিনি তিনি মুঘল

সম্রাট আকবরের হারেমের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ার পর্তুগীজ সরকার ভারতীয় চিকিৎসকদের চিকিৎসা ব্যবসায় বাতিল করে দেন। খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের উক্ত চিকিৎসকদের নিকট চিকিৎসা না করার জন্য এক নিষেধনামা প্রচার করা হয়।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে নিকোলাউ মানুচ্চি নামক এক ভেনীসিয় যুবক লর্ড বেলামণ্ট নামক ইংরাজের সঙ্গে সুরাট বন্দরে অবতীর্ণ হন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি দারা শিকোহ্-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি দুইবার গোয়া পরিদর্শনে যান ও কিছুকাল চিকিৎসা ব্যবসায় করেছিলেন। দারা শিকোহ্ নিহত হবার পর তিনি আগ্রা সহরে বেশ জাঁকিয়ে চিকিৎসা ব্যবসা করতে সুরু করেন। তাঁর চিকিৎসা বিদ্যার কোনও জ্ঞান ছিল না। কিন্তু তিনি সপ্রতিভতা ও বাক্‌চাতুরীর সাহায্যে রোগক্লিষ্টদের মনে আশার সঞ্চার করতে পারতেন। ১৬৭১-১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি লাহোরবাসী ছিলেন এবং ১৬৭৮-১৬৮২ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের অধীনের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ সহরে পৌর চিকিৎসক নিযুক্ত হন। "ষ্টোরিয়া দো মোগর" বা মুঘল কাহিনী নামক পুস্তক রচনা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি ঐ পুস্তকে লিখেছেন যে, শিকান্দর বেগ্ নামক এক আর্মানী দারার পুত্র সুলেমান শিকোহ্-এর চিকিৎসক ছিলেন এবং বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহান-এর চিকিৎসক ছিলেন মুকার্‌রাম খান্ নামক এক পারসিক। এছাড়া দিনেমার ইয়াকব্ মিন্থস ও গেল্‌মের ফোরবুর্গ, ফরাসী লুই বেইসো, ডুস্ত্রেম ও কাতেন্ এবং ভেনিসীয় আঞ্জেলো লেগ্রেঞ্জি প্রভৃতি য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ খণ্ডিত ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সভা চিকিৎসক ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে মঃ ফাঁসোয়া দ্য লা পালিস্ মুঘল দরবারে এবং মঃ ক্লডিয়ুস্ মালে এলাহাবাদের শাসকের চিকিৎসক ছিলেন। ১৭১৫-১৭১৬ পর্যন্ত মুঘল সম্রাট ফারুখ শিয়ার-এর চিকিৎসক ছিলেন মঃ মার্তিন। পরবর্তীকালে তিনি বাহাদুর শাহ ও মহম্মদ শাহ্-এর অধীনেও চাকুরী করেছিলেন। মহীশূর-এর নবাব হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের চিকিৎসক ছিলেন জঁ্য মার্তিন নামক ফরাসী।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসী পরিব্রাজক জঁ্য বাপ্তিস্তে তাভেরনিয়ে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তাঁর পিতা গাব্রিয়েল তাভেরনিয়ে ভূগোল-বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতার উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় জঁ্য বাপ্তিস্তে ছয়বার প্রাচ্য পরিক্রমা করেছিলেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইস্পাহান হয়ে তিনি

ভারতে আসেন এবং সুরাট, আগ্রা, গোয়া, গোলকুণ্ডা ও ঢাকা প্রভৃতি নগর পরিদর্শন করেন। ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পূর্বতন বাংলার লোহার ডাগা সহরে এসেছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "সুভেল্লে রেলাসিওঁ দু সেরেইল দু গ্রঁ াদ্ সিনিয়র" নামক গ্রন্থে তাঁর অভিজ্ঞতার মনোরম বিবরণ রেখে গেছেন। ইংরাজীতে ভাষান্তরিত গ্রন্থটির নাম "তাভেরনিয়েরস্ ট্রাভেল্স ইন ইণ্ডিয়া"। তিনি উক্ত গ্রন্থে লিখেছেন যে, তৎকালীন বিজাপুর ও গোলকুণ্ডায় রাজকীয় চিকিৎসক ছিল কিন্তু জনসাধারণ চিকিৎসার অভাবে মারা যেত। গৃহস্থবধুরা বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে টোটকা বনৌষধি সংগ্রহ করতেন ও গৃহ চিকিৎসায় প্রয়োগ করতেন। বড় বড় গ্রামে ও গঞ্জে ভেষজ ব্যবসায়ীরা লতাগুল্ম বিক্রী করত এবং অনুপানের ব্যবস্থাপত্র দিত। পিটার্ ডেলান্ নামক এক ওলন্দাজ গোলকুণ্ডায় সভা চিকিৎসক ছিল। তাভেরনিয়ে-এর পরবর্তীকালে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন ফ্রঁসোয়া বেনিয়ে, লে জঁ্য থেভেনো, জন্ চারদিন্, কারে, জন ফ্রেয়ার ও মানুচ্চি। জন্ ফ্রেয়ার ছিলেন ইংরাজ, তিনি ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। তৎকালীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা উচ্চ ছিল না।

ভারতে স্থায়ী রাজ্য স্থাপনা করতে পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ও ফরাসীরা বিশেষ সফলতা লাভ করে নি। কিন্তু বিচক্ষণ ও কুটবুদ্ধি ইংরাজরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের ছদ্মবেশে ক্রমে ক্রমে ভারতের মাটিতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ জেমিসন্, ডঃ ব্রিটন ও ডাঃ ট্রেলার নামক তিনজন ব্রিটিশ চিকিৎসক ভারতীয়গণকে য়ুরোপীয় চিকিৎসাশিক্ষাদানের বিষয় উদ্যোগী হন। প্রথমতঃ হিন্দু ছাত্রদের কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে ও মুসলিম ছাত্রগণকে কলিকাতা মাদ্রাসায় পারসীক ভাষায় মাধ্যমে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। ইতিপূর্বে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের নিকটবর্তী ডুলানদহ গ্রামে একটি বৃহৎ য়ুরোপীয় আরোগ্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। উক্ত স্থানে ফাদার কিরনান্দার নামক এক সুইডেন দেশীয় ধর্মযাজকের আশ্রম ছিল। আরোগ্যশালাটি প্রথমে জেনারেল হাসপাতাল ও পরে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতাল এবং বর্তমানে শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল নামে পরিচিত। উক্ত হাসপাতালে ম্যালেরিয়া রোগ বহনকারী মশক সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করে ভারতজাত ইংরাজ চিকিৎসক রোণাল্ড রস্ ১৯০২

খৃষ্টাব্দে চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার বিজয়ী হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ চার বৎসর পাঠের পর ব্যবসায়ের অনুমতি দেওয়া

চিত্র—৮৭

হত। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত নামক বাঙ্গালী তথা ভারতীয় ছাত্র সর্বপ্রথম মানুষের শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে তোপধ্বনি করা হয়েছিল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজকীয় শল্যচিকিৎসক সংস্থা ও রাজকীয় ভেষজ ব্যবসায়ী সমিতির পাঠ্যক্রমের অনুকরণে শিক্ষার কাল বর্ধিত করে পাঁচ বছর করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর নামক বাঙ্গালী চিকিৎসক কলিকাতায় ভারতের সর্বপ্রথম বেসরকারী চিকিৎসা

চিত্র—৮৮

মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বৃটিশ রাজত্বকালে বিদ্যালয়টি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আর-জি-কর মেডিকেল কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

চিত্র—৮৯

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ভোলানাথ বসু, ডাঃ গোপাল চন্দ্র শীল, ডাঃ দ্বারকানাথ বসু ও ডাঃ সূর্যকুমার চক্রবর্তী নামক বাঙ্গালী ছাত্র চতুষ্টয় উচ্চমানের চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। বাঙ্গালী ধনী ও বিদ্যোৎসাহী প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও মুর্শিদাবাদ এর নবাব সাহেব উক্ত ছাত্রদের শিক্ষা ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। প্রথমোক্ত তিন জন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন এবং শেষোক্ত জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভেষজশাস্ত্রে প্রথম এম ডি হন ডঃ চন্দ্রকুমার দে, শল্য-চিকিৎসায় প্রথম এম এস্ হন মিঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধাত্রীবিদ্যার প্রথম এম্ ও হন ডাঃ সতীনাথ বাগচী। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত নিদানতাত্ত্বিক ডঃ লিওয়ার্ড রজার্স, কলিকাতায় স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন স্থাপনা করেন।

চিত্র—৯০

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মার্কিন ধনবীর রকিফেলার-এর বদান্যতায় কলিকাতায় ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ হাইজিন্ এণ্ড পাব্‌লিক হেলথ স্থাপিত হয়।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনার অব্যবহিত কাল পরে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও অনুরূপ কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভারতের সর্বপ্রথম স্নাতকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত হয়। বাঙ্গলার সুসন্তান ও দেশবরেণ্য ভারতরত্ন চিকিৎসক ডঃ বিধানচন্দ্র রায় উক্ত প্রচেষ্টায় প্রধান উদ্যোক্তা।

ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ও স্যর কেদারনাথ দাশ প্রভৃতির নাম বিশ্ববিখ্যাত। স্যর উপেন্দ্রনাথ ভয়াবহ কালাজ্বর

চিত্র—৯১

রোগের ঔষধ "য়ুরিয়া ষ্টিবামিন" আবিষ্কার করে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন।

য়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্রমোন্নতি ও অবহেলাজনিত ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্রমাবনতির জন্য কালক্রমে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র আজ প্রায় ঐতিহাসিক ঘটনার পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। কেবলমাত্র ভবিষ্যতদ্রষ্টারাই বলতে পারেন যে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার উৎকর্ষ কবে আবার প্রাচীন গৌরব ফিরে পাবে।

পরিশিষ্ট

সরল বাংলা ব্যাখ্যা সহ কতিপয় প্রামাণ্য শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি

আয়ুর্বর্ণো বলং স্বাস্থ্যমুৎসাহোপচয়ৌ প্রভা।
ওজস্তেজোঽগ্নয়ঃ প্রাণাশ্চোক্তা দেহাগ্নিহেতুকাঃ॥ ১
যান্তেঽগ্নৌ ম্রিয়তে যুক্তে চিরং জীবত্যনাময়ঃ।
রোগীস্যাদ্বিকৃতে মূলমগ্নিস্তস্মান্নিরূপ্যতে॥ ২

(চরক চিকিৎসা ১৫। ১-২)

ব্যাখ্যা ঃ দেহের অগ্নিজনিত ফল হ'ল—আয়ু, গাত্রবর্ণ, শক্তি, স্বাস্থ্য, আনন্দ, স্থূলতা (উপচয়), উজ্জ্বলতা, ব্যাধি প্রতিরোধকারী ক্ষমতা (ওজঃ), প্রাণপ্রাচুর্য (তেজ) ও খাদ্যবস্তু জীর্ণ করার দাহিকাশক্তি (অগ্নি)। ১

শরীরগত অগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লে রোগীর মৃত্যু হয়। শরীরে যদি এই অগ্নি যুক্ত থাকে, তবে মানুষ চিরজীবি ও নীরোগ হয়। বিকৃতি প্রাপ্ত হ'লে, মূল অগ্নির উপসর্গ কি কি হয়, তাহা নিরূপণ করা হচ্ছে॥ ২

আমাশয়গতঃ আহারঃ পাকং প্রাপ্য পক্তুমারব্ধঃসন্ পশ্চাৎ
পচ্যমানানায়ে কেবলং কৃৎস্নং পরিসমাপ্তং পাকং প্রাপ্যপশ্চাৎ
পাকঃ কিট্টমূত্রপুরীষয়োঃ পৃথগ্‌ভাবেন পক্বাশয়ে গমনাৎ
পৃথগ্‌ভূত্বা সারভুতো রসাখ্যো দ্রবরূপঃ সন্ রসাদিবাহিনীভি ঃ
ধমনীভিঃ স্রোতোভিঃ পশ্চাৎ সর্ব্বাশয়ং রসরক্তাদিধাত্বাযায়ং প্রপদ্যতে॥

(চরক বিমান ২। ২৪)

ব্যাখ্যা ঃ পাকস্থলীতে খাদ্য বস্তু গেলে পাকক্রিয়া দ্বারা পক্ক অর্থাৎ হজম হ'তে সুরু করে। পরে পাকাশয়ের সেই সমস্ত বস্তু কিট্ট অর্থাৎ মলমূত্র থেকে পৃথক্ হ'য়ে সারবস্তুতে পরিণত হয়। সারবস্তু রস নামে পরিচিত। রস আবার দ্রবীভূত হ'য়ে রসবাহিকা ধমণী-স্রোতের মধ্য দিয়ে রস, রক্ত, ধাতু ইত্যাদি রূপে শরীরের সর্বস্থানে পরিচালিত হয়।

অগ্ন্যধিষধনেমন্নস্য গ্রহণাদ্ গ্রহণীমতা।
নাভেরুপরি সা হ্যগ্নিবলোপস্তম্ভবৃংহিতা॥
অপক্কং ধারয়ত্যন্নং পক্কং সৃজতি চাপধ্যঃ
দুর্ব্বলাগ্নিবলাদ্দুষ্টাদামমেব বিমুঞ্চতি॥

(চরক চিকিৎসা ১৫। ৫৩-৫৪)

ব্যাখ্যা ঃ নাভির উপরে অগ্নির স্থান। অগ্নির এই স্থানকে গ্রহণী বলা হয় কেননা ইহা খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। গ্রহণীকে অগ্নি ধরে আছে। অপরিপক্ক খাদ্যবস্তুকে পরিপক্ক ক'রে নিম্নদেশে নামিয়ে দেয়। ভক্ষিতদ্রব্য দুর্বল অগ্নিদ্বারা দূষিত হ'লে মলরূপে গ্রহণী তাকে ত্যাগ করে।

ত্বক্‌পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোহয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈব বর্ণ্যতেহঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মানিসংশয়ং জ্ঞানং চ শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যগ্‌দ্রষ্টব্যোঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং শস্ত্রদৃষ্টঞ্চ যদ্‌ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়ো জ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥ (সুশ্রুত-শারীরস্থান ৫।৪৯)

ব্যাখ্যা ঃ শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনকি ত্বকের সম্পূর্ণ জ্ঞান শল্যবিদ্যা ছাড়া বর্ণনা করা যায় না। তাই শল্যবিদ্যার জ্ঞান নিঃসন্দেহে বাঞ্ছনীয়। মৃতদেহ শোধনের পর শল্য প্রয়োগ করে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা উচিত। এভাবে প্রত্যক্ষ দর্শন ও শাস্ত্রবিদ্যা উভয়ে মিলিত হ'য়ে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

এবমাদিষু মেধাবী যোগ্যার্হেষু যথাবিধি।
দ্রব্যেষু যোগ্যাং কুর্ব্বাণো ন প্রমুহ্যতি কর্মসু॥
তস্মাৎ কৌশলমন্বিচ্ছনং শাস্ত্রক্ষারাগ্নি কর্মসু।
যস্য যত্রেহ সাধর্ম্মং তত্র যোগ্যং সমাচয়েৎ॥
(সুশ্রুত-শারীরস্থান ৯।৪-৫)

ব্যাখ্যা ঃ এভাবে মেধাবী চিকিৎসক উপযুক্ত প্রাথমিক দ্রব্যগুলির উপর এ বিদ্যা (শল্যবিদ্যা) নিয়মিত প্রয়োগ করে কখনও মোহগ্রস্ত হ'ন না। তাই যিনি শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নিকর্মের কৌশল যেখানে আরও আয়ত্ব করিতে ইচ্ছুক, তিনি সেখানে নিজের ধর্ম অর্থাৎ বিদ্যার প্রয়োগ করবেন।

তস্মাৎ সমস্ত্রগাত্রমধিধোপহতম্ দীর্ঘব্যাধিপীড়িতম্ কর্ষশতিকং
নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং পঞ্জরস্থং
মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীমন্যত মেনাবেষ্টিতাঙ্গমপকাশো দেশো কোথয়েৎ।
সম্যক্ প্রকুয়িতঞ্চোদ্ধৃত্য ততো দেহং সপ্তরাত্রা—
ভূশীরবালবেণুবল্কল কুঞ্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈঃ
অবঘর্ষয়নং ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গ—
প্রত্যঙ্গবিশেষন্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষা। (সুশ্রুত শারীরস্থান—৫।৫০)

ব্যাখ্যা : তাই এমন একটি লোকের শব নিতে হ'বে যে দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করেনি, যাকে হত্যা করা হয়নি অথবা যে শতায়ু নহে। তারপর অন্ত্র থেকে সমস্ত মল বের করে দিয়ে সেই দেহটি একটি পিঞ্জরের মধ্যে রেখে, মুঞ্জ, কুশ, শণ ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দিতে হ'বে। তারপর দেহটি বদ্ধ জলাশয়ে ডুবিয়ে রাখতে হবে। সাতদিন পরে দেহটি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেলে, জল থেকে দেহটি তুলে উশীর, বাঁশ অথবা চুলের তৈরী তুলিকা দিয়ে ত্বক ইত্যাদি ধীরে ধীরে ঘষে তুলে ফেলতে হ'বে। তারপর দেহটির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহির ও ভিতর নিজের চোখে দেখতে হ'বে।

অধিগত সর্বশাস্ত্রার্থমপি শিষ্যং যোগ্যং কারয়েৎ।
স্নেহাদিষু ছেদাদিষু চ কর্মপথমুপদিশেৎ।
সুবহুশ্রুতপ্যাকৃতযোগ্যঃ কর্মস্বযোগ্যো ভবতি।
তত্র পুষ্পফলালাব কালিন্দকত্রযুসৈর্বাযক কর্কাটক—
প্রভৃতিষু চ্ছেদ্যবিশেষন্ দর্শয়েচ্ছন্
কর্ত্তনপরিকর্ত্তানানি চোপদিশেৎ। দৃতিবস্তিপ্রসেবক—
প্রভৃতিষুদক পঙ্ক পূর্ণেষুমেদ্যযোগ্যাম্ সরোম্নি চর্মণ্যাততে
লেখ্যস্য মৃতপশুশিরাসুত্‌পলনালেষু চ বেধ্যস্য
ঘুণোপহতকাষ্ঠবেনুমলনালোশুষ্কালাবুমুখেস্বস্য
পনসবিম্বোবিল্বফলমজ্জমৃতপশুদন্তেষাহার্যস্য
মধুচ্ছিষ্টোপলিপ্তে শাল্মলীফলকে বিস্রাব্যস্য
সূক্ষ্মঘনবস্ত্রান্তয়োর্মহুচর্মান্তয়োশ্চ সৌব্যস্য,
পুস্তময়পুরুষাঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষেষু বন্ধযোগ্যাং
মৃদুমশাংপেষীষু উৎপলানেষু কর্ণসন্ধিবন্ধযোগ্যাম্
মৃদুযুমাংসখণ্ডেষগ্নিরক্ষারযোগ্যাম্ উদকপূর্ণঘট—
পার্শ্বস্রোতসি অলাবুমুখাদিষু চ নেত্র প্রণিধান—
বস্তিব্রণবস্তি পীড়ণ যোগ্যামিতি॥ (সুশ্রুত সংহিতা ৯/২-৩)

ব্যাখ্যা : সমস্ত শাস্ত্র ভাল করে আয়ত্ব করার পরে ছাত্রকে (শল্য) চিকিৎসায় পারদর্শী করান উচিত। দেহে তরল পদার্থের সূচিপ্রয়োগ ও অস্ত্রোপচার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ দেখতে ইচ্ছুক ছাত্রকে প্রথমে পুষ্পফল, অলাবু (লাউ), তরমুজ, শশা, কাঁকুড় ইত্যাদি ফল কেটে-কেটে শেখাতে হবে। শরীরের গভীর অভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার করতে হ'লে জলভরা

চামড়ার থলি, পশুর মূত্রাশয় অথবা অন্য কোনও থলিতে জল পূর্ণ করে ভেদন করতে হ'বে। লোমশ চামড়াতে ঘর্ষণ প্রয়োগ, পদ্মনালের সাহায্যে মৃত পশুর শিরায় রক্তমোক্ষণ, শলাকা দিয়ে পরীক্ষা ও ক্ষতস্থান পূর্ণ করার জন্য ঘুণধরা কাঠ, বাঁশ অথবা শুকনো লাউয়ের মুখের ব্যবহার, বিম্বী, বেল, কাঁঠালবীজ মৃতপশুর দন্তে উৎপাটন প্রণালীর প্রয়োগ, সিমুল কাঠের তক্তার উপর মোম মাখিয়ে ক্ষরণ বা শূণ্যীকরণ, সূক্ষ্ম বা ঘনবস্ত্র বা পাতলা চামড়া দিয়ে ক্ষত জোড়া লাগানো, পুতুলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর ক্ষত বন্ধনের চর্চা। নরম মাংস-পেশীতে পদ্মনালের সাহায্যে কর্ণসন্ধি শিক্ষা, নরম মাংসখণ্ডে অস্ত্রচিকিৎসার তপ্তলোহ অথবা ক্ষারের প্রয়োগ আর জলপূর্ণ ঘটের সঙ্কীর্ণ ফাটলে ক্ষত দূরীকরণ বা সূচিপ্রয়োগের শিক্ষণ করা উচিত।

গ্রীক

"হিরোফিলোস্ দে এন্ তো দিয়াইএটিকো কাই সোফিয়েন ফেসিন আনেপিদেইকেতন কাই তেখেন কাই ইস্খুন আন্তোগেনিস্তন কাই প্লুতোন আখেরেইওন কাই লোগন আড়ুনাতন আপোউসেস্।"

ব্যাখ্যা: স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কলা, বিজ্ঞান, বাগ্মিতা, বিত্ত ও শৌর্য সবই অর্থহীন।

হিরোফিলোস

লাতিন

"মর্ত্তুই ভিভোস দোসেন্ত্"

মরগান্নি

ব্যাখ্যা: মৃত্যুই জীবনকে শিক্ষা দেয় অর্থাৎ এক রোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ অন্য ব্যক্তির দীর্ঘজীবন লাভের পথপ্রদর্শক।

জিওভান্নি বাতিস্তা মরগান্নি

Quotes from "The CANON OF MEDICINE OF AVICENNA (*QUANOON EL FIT TIBBI)* O. Cameron Gruner, Augustus M. Kelley, New York, 1970.

228. "Some diseases turn into new ones, and so themselves disappear. This is very satisfactory. *One disease becomes the medicament for curing other.* Thus, quartan malaria often cures epilepsy (cf. GPI) also podagra, varices and arthralgias ...."

Ibn Sina

ব্যাখ্যা ঃ "কোনও কোনও রোগের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয় এবং সেই রোগগুলিকে আর চেনা যায় না। ঘটনাটি মঙ্গলপ্রদ। এক রোগকে অন্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়। যেমন, ম্যালেরিয়া জ্বর দ্বারা মূর্চ্ছারোগ (উপদংশ জনিত), পদবেদনা, শিরাস্ফীতি এবং অস্থিগ্রন্থি বেদনা প্রভৃতি রোগের উপশম ঘটানো যায়।" অভিসেন্না

20. "Natural philosophy of four elements and no more. The physician must accept this. Two are light, and two are heavy. The lighter elements are fire and air ; the heavier are earth and water." Ibn Sina

ব্যাখ্যা ঃ "প্রাকৃত দর্শনশাস্ত্রে চারটি মৌলিক পদার্থের উল্লেখ আছে। প্রতি চিকিৎসকের কথাটি জানা উচিত। ঐ পদার্থগুলির মধ্যে দুটি ভারী ও দুটি হাল্‌কা। অগ্নি ও বায়ু হাল্‌কা এবং মৃত্তিকা ও জল ভারী।"

অভিসেন্না

803. "Wine does not readily inebriate a person of vigorous brain, for the brain is not susceptible to ascending harmful gaseaus products nor does it take up heat from the wine to a degree beyond what is expedient. Therefore it renders his mental power clearer that before ; other talents are not affected in such an advantageous manner. The effect is different on persons who are not of this calibre.

A person who is weak in the chest, to the extent that the wintertime is trying to the breathing, cannot (wisely) take much wine." Ibn Sina

ব্যাখ্যা ঃ "শক্তিশালী মস্তিষ্ক যে ব্যক্তির আছে, সে সুরাপান করলে মাতাল হয় না। উপরন্তু সুরা তার মনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তার কোনও প্রতিভাই সুরা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। কিন্তু তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উক্তিটি প্রযোজ্য নয়।

যে ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্র দুর্বল তাদের পক্ষে শীতকালে সুরাপান ক্ষতিকারক।"

অভিসেন্না

তথ্যের সূত্র

Ābul Fazl. : Āyn-e Ākbari, translated into English by Blockmann et al, Munshi Rām Monohar Lāl, Delhi.

Ālvi, M. A. and A. Rahmān. : Jahangir as a Naturalist, National Institute of Science of India, New Delhi, 1968.

Ārya, P. : Atharvavedeeya Chikitsāshātra, Sarvadeshik Ārya Pratinidhi Sabhā, Delhi—1941.

Aschoff, L and Diepger, P. : Kurze Uebersichtstablle zur Geschichte der Medizin, Verlag von J. F. Bergmann, Muenchen, 1936.

Ashtāngahṛdaya Samhitā of Vāgbhatta. : A compendium of the Hindu System of Medicine, composed by Vagbhatta, with the commentary of Arundatta, Revised and colleted by Anna M. Kunte, 2 vols. Bombay, 1880.

Āstāngāhṛdayasamhitā, Vāgbhatta. : Ein altindisches Lehrbuch der Heilkunde, aus dem Sanskrit ins Deutsche uebertragen, mit Einleitung, Anmerkungen und Indices von Luise Hilgenberg und Willibald Kirfel, Leiden, 1937-1940.

Ashtānga Sangraha of Vāgbhatta. : (In Sanskrit), with the commentary by Indu, edited by T. Rudraprasava, 3 vols., Trichur, 1913-24.

Atharva Veda. : Translated in English by Ralph T. H. Griffith, 3 vols. E. K. Lazarus and Co. Benares, 1916.

Bāgchī, A. K. : Yug hate Yugāntare Chikitsā Shāstra (Medicine through the ages), Serialised in Amṛta, Calcutta, 1963.

Bāgchī, A. K. : Susruta—A man of History and Science. *Internat Surg*. 50, 403, 1968.

Bāgchī, A. K. : The Emergence of Surgery in India, *Phronesis* (Spain), 12, 476, 1974.

Bāgchi, A. K. : Indian influences on Arabic and Moorish medicine—*Phronesis* (Spain), 37, 3, 1978.

Bāgchī, A. K. : Sanskrit and modern medical vocabulary. A comparative study, Riddhi, Calcutta, 1978.

Bailey, Hamilton and Bishop, W. J. : Notable names in Medicine and Surgery, H. K. Lewis, London, 1946.

Banerjee, D. N. : Āyurveda Shārira, vol. 1 Industry Publishers. Calcutta, 1951.

Bhela Samhitā. : Published by the University of Calcutta, 1921.

Bose, D. M., Sen S. N., Subbarāyāppa B. N. (Editors) : A Concise History of Science in India. Indian National Academy, New Delhi, 1971.

Brendt, Catherine, H and Brendt, Ronald M. : The Barbarians, C. A. Watts, London, 1971.

Beal Samuel. : Chinese Accounts of India, Translated from the Chinese of Hiuen Tsiang, 4 vols. Susil Gupta, Calcutta, 1957-58.

Bhāva Prakāsha of Sri Bhāva Mishra. : (In Hindi) Edited by Bhishagratna Pandit Shree Brahma Shankara Mishra, Chowkhāmbā Sanskrit Series office, Vārānasi, 1961.

Bhela Samhitā. : (In Sanskrit) Edited by Ashutosh Mookerjee, Calcutta University, *Jour of Dept. of Letters Calcutta*, vol. 6, 1921.

Bjornstjern, Count M. : The Theogony of the Hindoos. London. John Murray, 1844.

Bower Manuscript, The. : Facsimile leaves, Nāgari Transcript, Romanised Transliteration and English Translation with Notes, Edited by A. F. R. Hoernle, Part 1, 2, Archaeological Survey of India, New Imperial Series, vol. 22, Calcutta, 1893-1912.

Chakravorty, C. : An Interpretation of Ancient Hindu Medicine, Vijay Krishna Bros., Calcutta, 1923.

Celsus. : De Medicina, trans. by W. G. Spencer, Cambridge University Press Harvard, 3V., 1935-38.

Charaka Samhitā, The. : With the commentary of Chakrapānidatta, edited by Vaidya Bhushan Vāman Kesheo Dātār, 1st edition, Nirnaya Sāgar Press, Bombay, 1922.

Charka Samhitā. : (In Sanskrit). with the commentary by Chakrapānidatta and Jajjāta, edited by Haridatta Shāstri, 2 vols, 2nd Ed., Motilal Bānārsidāss, Lahore, 1940.

Charaka Samhitā, The. : Edited and published by Shree Gulābkunverba Āyurvedic Society 6 vols, with translations in Hindi, Gujarati and English, Jamnagar. 1949.

Charaka Samhitā. : (A Scientific Synopsis). P. Ray and H. N. Gupta, published by the National Institute of Sciences of India, New Delhi, 1965.

Devi, A. K. : The Vedic Age, Vijay Krishna Bros. Calcutta, 1931.

Dioscorides, The Greek Herbal of. : Edited and translated by Robert T. Gunther, Hafner publishing Co., New York, 1959.

Dwarakanāth, C. : Introduction to Kāya Chikitsā Popular Book Depot., Bombay, 1959.

Elgood, C. : A Medical History of Persia and Eastern Caliphate, Cambridge, 1951.

Filliozat, J. : The Classical Doctrine of Indian Medicine, translated by D. R. Chānānā, Munshi Rām Manohar Lāl, Delhi, 1964.

Goetze, A. : Persische Weisheit in Griechischen Gewande in *Zeit. fuer Ind. und. Ir.*, II, 1923.

Gordon, B. L. : Medicine throughout Antiquity, F. A. Davis Company, Philadelphia, 1949.

Gruner, O. C. : A Treatise on the Canon of Medicine of Avicenna, Luzac and Co, London, 1930.

Gupta, A. : Sushruta Samhitā—Motilāl Bānarsidāss, Benāres, 1950.

Haddad, Farid Sami. : History of Medicine. Arab contribution to Medicine, *Le Jonrnal Medical Libanais*, 26, 331, 1973.

Hoernle, A. F. R. : Indien und die Deutschen, by Leifer, W., Erdmann, Tuebingen, 1969.

Johnston Saint, P. : Quoted by The Pioneer, Allahabad (India) May, 31 and June 1, 1929.

Jolly, J. : Indian Medicine, C. G. Kāshikār, Poona, 1951.

Kausika Sutra. : The Kausika Sutra of the Atharvaveda, Edited by Maurice Bloomfield, *Journal of the American Oriental Society*, Vol., XIV, New Haven, 1890.

Keswāni, N. H. : "Evolution of Surgery". *The Medicine and Surgery*, 1, 8, 1961.

Keswāni, N. H. : "Anaesthesia and Analgesia among the Ancients. Part II (The Egyptians and Mesopotamians)" *Indian Journal of Anaesthesia*, 1, 55, 1962.

Keswāni, N. H. : "Foreword" Sushruta Samhitā, English Translation by K. L. Bhishagratna, 2nd Edition, Chowkhāmbā Sanskrit Series, Vārānasi, 1963.

Keswāni, N. H. : "Ancient Hindu Orthopaedic Surgery", *Indian Journal of Orthopedics*, 1, 76, 1967.

Keswāni, N. H. : "Medical Education in India since Ancient Times", in "The History of Medical Education", edited by C. D. O. Malley, University of California Press, pp. 329-366, 1970.

Khān, M. S. : An Arabic source for the history of Ancient Indian Medicine, Studies in History of Medicine, pp. 1-12, 1979.

Kinjbadedkar, R. S. : Ashtāngasangraha Tasya Shārirasthānam, Chitrashāla Mudranālaya, Poone, 1936.

Kutumbiah, P. : Ancient Indian Medicine, Orient Longmans, 1962.

Lash, Abraham. F. : History of Gynecology from Prehistoric to Modern Times, *J. Intern*, 32, 1959.

Lassen, Ch. : Indische Altertumskunde, 4 vols, Leipzig, 1843-72.

Mādhava Nidāna of Mādhava Kāra. : (In Hindi) Edited by Bhishagratna Pandit Shree Brahma Shankar Shāstri, Chowkhāmbā Sānskrit Series Office, Bānāres, 1954.

Mahāvagga. : In Vinaya Texts, Translated by T. W. Rhys Davids and Hermann Oldenberg, in the Sacred Books of the East Series, Vol. XIII and XVII Edited by Max Mueller, Clarendon Press, Oxford, 1881.

Mahāvamso. : In Roman Characters, with the translation subjoined and with Introductory essay by George Turnour, Church Mission Press, Cotta, Ceylon, 1837.

Majno, Guido. : The Healing Hand, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1975.

Manu Smriti. : The Laws of Manu, Translated by G. Buehler, in the Sacred Books of the East Series, vol. XXV. Edited by Max Mueller, Clarendon Press Oxford; 1886.

Manucci, Niccolao. : Storia De Mogor (or Mughal India), Translated into English by William Irvine, vol. I-IV, John Murray, London, 1907-08.

Max Mueller, F. : The Upanisads (Translation), Dover Publications Inc. New York, 1962.

Mettler, C. C. and Mettler F. A. : History of Medicine, the Blakiston Company, Philadelphia, 1947.

Meunier, L. : Histoire de le Medecine Librairie E. Le Francois, Paris, 1924.

Pāthak, R. : Marma Vijnān, Jaykrishnadās Haridās Gupta, Benāres, Samvat 2006.

Pāndya, S. K. : Medicine in Goa, Sānjgiri foundation, Goa, 1980.

Pococke, E. : India in Greece, Glasgow University Library, 1852.

Rāy, D. N. : The Principles of Tridosha in Āyurveda, Calcutta, 1937.

Rig Veda Samhltā. : Edited and published by Manmatha Nātha Dutt (Shāstri) Society for the Resuscitation of Indian Literature, Calcutta, 1906.

Rig Veda Samhitā. : Translated by H. H. Wilson, 6 vols., Ashtekar and Co., Poona, 1925-28.

Said, H. M. : Ours in Trust only, *Hemisphere*, 22,206,1979.

Sāma Veda, The Hymns of the. : Translated by R. T. H. Griffith, E. J. Lazarus and Co. Benāres, 1926.

Sarton, G. : Introduction to the History of Science, Carnegie Institution of Washington publication 376, 3 vols. in 5 pts. Williams and Wilkins, Baltimore. 1927-28.

Schinz, Hans R. : 60-Jahre Medizinische Radiologie, George Thieme, Stuttgart, 1959.

Sen, G. N. : Hindu Medicine—An Address on Āyurveda delivered at the foundation ceremony of Benāres Hindu University in 1916.

Shāh, M. H. : The General Principles of Avicenna's Canon of Medicine, Karachi, Pakistan, 1966.

Siddiqui, M. Z. : Studies in Arabic and Persian Medical Literature, Calcutta University, 1959.

Siegerist, Henry, E. : The Great Doctors, Dover Publications, New York, 1971.

Singer, Charles. : Greek Biology & Greek Medicine, Oxford, 1922.

Stoddart, Anna M. : The life of Paracelsus, William Rider & Son, London 1915.

Sushruta Samhitā, The. : Translated and Edited by Kavirāj Kunjalāl Bhishagratna, 3 vols, 2nd Ed., Chowkhāmbā Sanskrit Series Office, Vārānasi, 1963.

Takakusu, I. T. : I-tsing—A Record of the Buddhist Religion As Practised in India and Malay Archipelago (671-695 A. D.) English Translation, Clarendon Press, Oxford, 1896.

Tavernier, Jean Baptiste : Travels in India, Calcutta, 1905.

Thorwald Juergen. : The Century of the surgeon, Thames and Hudson, London, 1957.

Uenver, Sueheyl : Hospital of the Sultan--750 years of Turkish Medicine., *Abbottempo Interview*, Abbott Universal Ltd., 1970, pp 72-77.

Verma, R. L. ; The Growth of Greco-Arabian Medicine in Mediaval India. *Ind. J. Hist. Sci.* 5,348, 1970.

Vidyalankār, J. : Charakasamhitā, Motilāl Banarsidāss, Benāres, 1947.

Wilson, Leonard G. : Erasistratus, Galen, and the Pneuma, *Bull. Hist. Medicine*, July-Aug., 1959,

Yajur Veda, (Krishna). : The Veda of the Black Yajus School, Translated by A. B. Keith, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1914.

Yajur Veda, (The Texts of White) : Translated by R. T. H. Griffith, E. J. Lazarus and Co., Benāres, 1957.

Zysk, Ken. : In wider fields, *Hemisphere*, 23, 200 1979.

—o—

S.C.E.R.T., West Bengal
Calcutta
25/3, B. C. Road